প্রকাশ : ডিসেম্বর, ১৯৬০

প্রকাশক : মানুশ্রী ভট্টাচার্য
পোঃ বালি-দুর্গাপুর
জিলা : হাওড়া

মুদ্রক : বাসু ফটোকম্পোজিং সেন্টার
২০এ, আশুতোষ শীল লেন
কলকাতা-৯

মন এক মন্তর

সাবারুনীল-কে

দাদুন

মন-এর কথা

কাজের ধর্মযুদ্ধ-জীবন যখন প্রায় শেষ তখনই ভাবনার সমস্ত নবরূপ ধীর গতি প্রকাশের সুযোগ পায়। অনেকটাই যেন নিরুদ্দেশে অপেক্ষারত নির্ভার হালকা সাদা মেঘেদের নীল আকাশের প্রশস্ত আঙিনায় ইতস্তত পদচারণার মতো — শান্ত শারদ আকাশ-আঙিনায়। অথবা পূর্ণকূল ধীর-প্রবাহ নদী-বক্ষে টুকরো-টুকরো ভাসমান গতি-প্রত্যাশাহীন পানাদের মতো — তরঙ্গভঙ্গের তরল প্রবাহিনীর আঁচলের প্রসারে।

সেই সব ভাবনাদের — অনুভাবনাদের — সাজিয়ে গুছিয়ে একত্র করে এই মন এক নম্বর এরা তাই কাজের শেষে বসে অকাজের, আবার কর্মহীন জীবনারম্ভের শুরুতে বসে বাজে কথার আলাপনাও বটে। অকাজের বলে এরা বিরক্ত করলেও বিদ্ধ করতে পারবে না, বাজে বলে এমন বাতিল করে দিতেও বাধা থাকবে না। বাকি রইলো আলাপনা-অংশে। টক-মিষ্টি-অংশে নুন হলেও কল্প-অনুভব অংশে যদি মনের আকাশ পায় তাহলে কৃতকৃতার্থ বোধ করব।

আলাদা করে কারো কাছে কৃতজ্ঞতা জানালাম না ; কৃতজ্ঞ আমি সকলের কাছে — জীবনের কাছে, প্রত্যেক আপনজনের কাছে, সমস্ত অনাপনদের কাছে। আমার অতীতকে যারা গড়ে দিয়েছে, বর্তমানকে প্রভাবিত করেছে আর ভবিষ্যতকে নির্দেশ করে চলেছে। তখনও, এখনও।

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য

॥ ভূমিকা ॥

অর্ধেন্দু ভট্টাচার্য এক বছরের মাথায় আর একবার সাহিত্যের আসরে উপস্থিত একগুচ্ছ পুস্তকের সম্ভার সাজিয়ে, 'মন এক মন্থর' প্রভৃতি ওর মধ্যে একটি। এটি একটি রমণীয় রচনার সংকলন।

গ্রন্থটিতে সর্বমোট তেত্রিশটি রচনা স্থান পেয়েছে। সবকটি রচনাই মধ্যবিত্ত জীবনের আশা-নিরাশা সুখ-দুঃখ বাস্তব-কল্পনা এবং স্ব-বিরোধকে স্পর্শ ক'রে ক'রে পল্লবিত। শত তুচ্ছতা ও উপেক্ষার মধ্যে যে অজস্র ঘটনা ও ভাবনা আমাদের সম্মুখে অনবরত প্রবাহিত, লেখকের রসিক কল্পনা তাদের এক একটিকে অবলম্বন করে রূপলাবণ্যে স্নিগ্ধ এক একটি প্রতিমার সৃষ্টি করেছেন। বিষয়বস্তু ও লেখনভঙ্গি অনুসারে লেখাগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করা যেতে পারে। এক, রমণীয় বর্ণনা-প্রধান [টুনিমাসী (দোকান ও মঠ)], দুই, প্রত্যক্ষ কিছু রাষ্ট্রিক সামাজিক বিষয়ের স্বরূপ বিশ্লেষণ [শিক্ষার জগাই ও অশিক্ষার মাধাই, মন মুখ মুখোস ইত্যাদি], তিন, অনুভব জগতের গভীর কিছু কথা কৌতুকের সহজ রশ্মি ফেলে পর্যবেক্ষণ [হারানোর ছক, আমার আমি, আমি তুমি ও সে, মন এক মন্থর ইত্যাদি]। বাকি কিছু রচনা আবার উপরে বর্ণিত একাধিক বিভাগ মিলিয়ে মিশিয়ে। কখনও লঘু কৌতুক, কখনও তীক্ষ্ণ-তির্যক কটাক্ষ, কখনও সরাসরি প্রত্যক্ষ নির্দেশ লেখকের ভাষা সর্বক্ষেত্রেই স্থির-লক্ষ্য, উজ্জ্বল ও প্রাণবন্ত।

পেশায় দর্শনের অধ্যাপক শ্রীভট্টাচার্য রচনাগুলির চয়নে দার্শনিক চিন্তা-চেতনার স্বাক্ষর যে রাখবেন এটা প্রত্যাশিতই। কিন্তু লেখাগুলি পড়তে পড়তে সব কিছু ছাড়িয়ে শেষ পর্যন্ত পাঠকের উত্তরণ ঘটে এক মহত্তর অনুভাবনায় যা এ-যুগের সর্বগ্রাসী অবক্ষয়ের অন্ধকারকে চিরে চিরে যেন নিয়ে যায়, কোনও ইতিবাচক তাৎপর্যের দিকে, আশান্বিত পাঠকের তখন মনে হতে পারে — সম্ভবতঃ এ-পথেই মিলে যেতে পারে তার জিজ্ঞাসার উত্তর, ঘটে যেতে পারে তার আর্তির উপশম।

এ-যুগে সব কিছুই পণ্যের আসরে ক্রীত হবার প্রতিযোগিতায় সামিল। অবিসংবাদিত ক্ষমতার অধিকারী প্রচার-মাধ্যমের কাণ্ডারীদের তাই বিরামহীন ব্যস্ততা। এই সুযোগে তাদের দাক্ষিণ্যের সিংহভাগ জুড়ে নানা সেইসবের ওপর লেখাগুলি তাৎক্ষণিক উল্লাসের হাউইবাজির মত সহজেই বিকোয়। সংখ্যাগরিষ্ঠের নিরিখে তুলনামূলকভাবে সংকুচিত হয়ে আসা শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতির নান্দনিক আসরে আর একটি নতুন সংযোজন পাঠকদের আনন্দ-বর্ধনে সক্ষম হবে আশা রাখি…।

সুনীল আচার্য

সূচীপত্র

আমার আমি ঃ

ইদানিং একটা বিষম ভাবনায় পড়েছি। ভাবনাটা আমার 'আমি'-কে নিয়ে। জানি যে এই ভাবনাটা আমার একার ব্যাপার নয়, সকলের ব্যাপার। সমস্যা বলে দেখলে এ একটা বিরাট সমস্যা। আর সমস্যা মনে না করলে কোন সমস্যাই নেই। বাতাস থাকাটা কোনও সমস্যা নয়, নিয়ত নিশ্চিত শ্বাস গ্রহণ স্বাভাবিক নিয়মেই অব্যাহত। কিন্তু ওটা বন্ধ হবার উপক্রম হলেই সমস্যাকে আর ঠেকিয়ে রাখা যায় না -- ধড়ফড় করে ঘাড়ে এসে পড়ে, বুকের বাঁ দিকে হাত চলে যায়। আর তখনই দৌড় পড়ে অক্সিজেন সিলিণ্ডারের সন্ধানে। 'আমি'-টাও অনেকটা তেমনি। ওটা স্বাভাবিক ভাবেই, প্রাকৃতিক নিয়মেই, এতো পর্যাপ্ত এতো গভীর যে ওই 'আমির' মধ্যে আমরা প্রতিনিয়ত হাবুডুবু খাই, 'ওর' থাকাটা কোন সমস্যাই তৈরি করে না। কিন্তু সেই 'আমি'-টি যখন মার খেতে থাকে, শীর্ণ-ক্ষুণ্ণ হতে থাকে, অস্বীকারের প্রহারে জর্জরিত হয়, তখনই বুকের বাঁ দিকে হাত চলে যায়। আমি-টা যখন কমে আসে বা একেবারেই নেই হয়ে যায় তখন টের পাই যে ওই [illegible] পান করে করেই পুষ্ট হয়েছি এতোদিন।

'আমি' তো কিন্তু কোনও রবিনসন ক্রুসোর সমস্যা নয়। সমাজ-সংসার থেকে দূরে দ্বীপের একাকিত্বে বসে সে আমির তাপ ও চাপ থেকে মুক্ত। সেখানে গাছ-পালা পাথর-পাহাড় নদী-ঝরনা আছে। কিন্তু তার আশেপাশে কোনও 'আমি' নেই বলে তার নিজের আমি-টা ডাল-পালা ছড়াতে পারছে না। আমরা সকলেই তো আমি-র জঙ্গলে বাস করি। আমি'র বৃক্ষের আড়ালে সমাজ পরিবারের আমি-জঙ্গলটি আমরা দেখতে পাই না। আমার আমি, ছেলের আমি, মেয়ের আমি, স্বামীর আমি, স্ত্রীর আমি,-এই এত সব আমির শক্ত কাণ্ড আর সজীব পত্র-পল্লবের আড়ালে অন্য আমি হঠাৎ হারিয়ে যাওয়াটা প্রায় স্বাভাবিকই। হারিয়ে যাওয়াটা কোন আমিই পছন্দ করে না। রাজনৈতিক নেতাদের ঘাড়ে এই দোষটা আমরা অনায়াসে চাপিয়ে দিতে চাই বটে কিন্তু আসলে আমরা সকলেই তো সেই গুরুভার বয়ে চলি সারাজীবন, অন্তত চেষ্টার ত্রুটি করি না।

আর এই সদাসতর্ক চেষ্টার বাঁকের মধ্যেই গৃহ-ভূমিকম্পের অঙ্কুরটি প্রয়োজনীয় তাপ, আর্দ্রতা, আর জীবন-অক্সিজেন পেয়ে যায়। সংসারের নানা সমস্যায় তাদের শাখাটি কাণ্ডের ধ্বনি বেড়ে বাড়তে থাকে আর্দ্রতা প্রায়শই কান্নার রেখা আর চোখের জলে রূপ পায় এবং সব শেষে আমির মাত্রাতিরিক্ত পুষ্টতাড়নায় নাজেহাল পিতা-পুত্র মাতা-কন্যা একান্ত কোণে ফোঁস্ ফোঁস্ করে পরিবেশে অক্সিজেনের ঘাটতি আর কারণ তাই অশান্তির বাড়-বাড়ন্ত ঘটায়। আমি'র তাড়না তাই বড় তাড়না।

অফিসে-দপ্তরে, কল-কারখানায়, জমিতে-খামারে এবং ঘরে-বাইরে, সর্বত্রই এই আমি-র তাড়নায় জীবন পর্যুদস্ত! বড়-আমি ছোট-আমি করে এই আমির জঙ্গলে পথ পাওয়া যাবে না। কারণ আপেক্ষিকতার নীতি এখানেও সমান প্রযোজ্য। সব আমিই তাই এক-একটি নিঃসঙ্গ আমি। আর সমাজ-সংসারের বৃহৎ বিলিয়ার্ড বোর্ডে এই আমির বল-গুলো ঘুরপাক খায় আর নিজ-নিজ-দেহে ঘষিয়ে ঘষিয়ে পালিশ লাগায়, চক্ চক্ করে তোলে।

যত পালিশ লাগে তত দামী চেয়ার খোঁজে এই আমি-গুলো। চেয়ার তো ক্ষমতার প্রতীক। মান চাই, অধিকার চাই। গৃহ-সংসারে, মন্দির-মসজিদে, অফিসে-দপ্তরে, বিদ্যালয়ে-কলেজে,

মাঠে-ময়দানে, পার্টিতে-কমিটিতে, সমাজে-রাষ্ট্রে। আমি মানেই তোমার, তোমার মানেই আমির সর্বস্ব।

কোনো কারণে যখন এই আমি মোটিয়ে পড়ে, অনেক কারণেই তা হতে পারে, তখনই বাধে মহা গণ্ডগোল। সুখ-স্বাচ্ছন্দিক আমি নিয়ে সহজে ঘর করা যায়, কিন্তু আহত-আমি, ক্ষত-বিক্ষত-আমি, সব সময়েই ভয়াবহ থাবা-তোলা বাঘের মত ক্রুদ্ধ। শরীরের ব্যাধিকে ফোঁড়া ইনজেকশন দিয়ে দমিত বা নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব, মনের আহত-আমির-ব্যাধিকে কোন্ ওষুধে নির্বিষ করা যাবে?

আমরা আহত-আমি নিয়ে সারাজীবনই ওষুধের সন্ধান করেছি। পেয়েছি যে সে কথা বলতে পারি না। এখন মোটিয়ে পড়া বুড়ো আমি নিয়ে হয়েছে আমার বড় সমস্যা। সমস্যা থাকলে তার সমাধান একদিন না একদিন দেখা দেবেই—এই আশায় দিন গুণে চলেছি। সব রোগের ওষুধ আবিষ্কার হচ্ছে, আমি রোগের ওষুধ হবে না?

The General Rules the Army :

পৃথিবীর জলস্থলের পরিমাণগত পরিসরকে তিন ভাগ জল এক ভাগ স্থল বলে জানা গেছে। আমাদের জ্ঞানের জগতে অনুমান-প্রত্যক্ষের পরিমাণগত বিভাজনটি কিন্তু অত সহজে প্রকাশ করা যায় নি। নানা মুনির নানা মত আসর গরম করেই রেখেছে, রাখছে। কিন্তু দৈনন্দিন জীবনে দেখে-শুনে ঠেকে-ঠুকে এটা সাব্যস্ত করা যায় যে সেখানেও তিন ভাগ অনুমান, একভাগ মাত্র প্রত্যক্ষ। অবশ্য নির্ভেজাল প্রত্যক্ষ বলে কিছু আদৌ আছে কিনা সে এক সন্দেহের বিষয়। সব প্রত্যক্ষের সঙ্গেই তো, গোয়ালার দুধের মতো, কিঞ্চিদধিক অনুমান-জ্ঞান-অপ্রত্যক্ষজ্ঞানের-মিশ্রণ থেকেই যায়। থেকে যে যায় তার সবথেকে বড় প্রমাণই লুকিয়ে থাকে 'ভুল করেছি'-র অনুশোচনা হয়ে ভবিষ্যতের 'প্রত্যক্ষ' বা উপলব্ধির ক্ষেত্রে। দেখে-শুনেই তো যা করার তা করে থাকি, কিন্তু তবুও 'কি ভুলই তখন করেছি' বলে আক্ষেপ করি কেন? চোখের ক্যামেরায় যা দেখেছি বা কানের 'ককলিয়ায়' যা শুনেছি তার তো কোনও ইতর বিশেষ হবার কথা নয়! [একমাত্র ব্যতিক্রম 'কানেদেখা'-র বেলায়।] তবে সেই দেখা-শোনায় কোন্ অংশের জন্যে বিলম্বিত-অনুতাপ? অনুমান অংশের জন্যে নয় কি?

স্মৃতি শাস্ত্র বা ন্যায় শাস্ত্রে বহুবিধ দোষের খতিয়ান সবিস্তারে দেওয়া আছে। অনুমান করতে বসে এই সব দোষ আমাদের আক্রমণ করে। তাদের স্বতন্ত্র নামকরণও সেই সেই শাস্ত্র উল্লেখ করে দিয়ে থাকে। আমরা, যারা সাধারণজন, তাদের অত নামে কোনও দরকার পড়ে না। সর্বনিয়ন্তার ভুল চুকা হিসেবকে আমরা ওঁদের মতো মাথাধার তেল কি তেমাথার পায় পর্যন্ত গড়াতে দিতে রাজি নই, যদিও কখনও-সখনও সত্য-মিথ্যার চেনা-বোঝাটিকে 'সন্দেহজনক'-এর ডাইমেনশন দিতে রাজি হতেও পারি। কিন্তু সন্দেহ বস্তুটা জীবনের চলার পথে বাঁধার মতো ঠেকে বলে আমরা দৈনন্দিন জীবনে তাকে দুহাতে সরিয়ে দিয়ে সত্য-মিথ্যার কেট-ফুটিতেই বিচরণ করতে পছন্দ করি। [যদিচ মুক্তিশাস্ত্রে, দার্শনিকজন সেই সন্দেহ-কেই দুহাতে যথাসম্ভব আঁকড়ে থাকার প্রবণতা সর্বাধিক, ওখানেই ওঁদের জীবন-কাঠি-মরণ-কাঠি।]

তাই the General rules the Army ইত্যাদি অনুমানে নৈয়ায়িক তর্কণী উত্থাপন করে দোষকে নির্ণয় করে বলেছেন। কিন্তু আমরা সবিস্তারে এবং শত শত উদাহরণে প্রত্যক্ষ জানি যে

the wife rules the General কতো অকাট্য সত্য! এবং সেই অনুমানের সিদ্ধান্তটি therefore the wife rules the Army প্রায় ব্যতিক্রমহীন বাস্তব সত্য। ঐ general-এর গৃহ-বিষয়ক জ্ঞান সংগ্রহ হয় গৃহে অনুপস্থিত কালে আর হার্ডনিডে দিয়ে তার প্রতিক্রিয়ার অধিকাংশই পরিচালিত হয় গৃহের চাপ-তাপ-অনুভবে প্রভাবিত হয়ে। গৃহে তিনি রাজার মতো দেখেন-শোনেন-জানেন, গৃহিনীর নয়ন-কর্ণন-চক্ষুসা; গৃহে তিনি গৃহিনীর projector-এ passive দর্শক। আমরা সকলেই এক একজন General. Army আমাদের গৃহ-পরিবার-পরিজন। আমাদের পোশাকে-আশাকে মেডেল-রিবনের ঝকঝকে তকমা-আঁটা। পুরুষ শাসিত সমাজের শিরোপা-আঁটা পাগড়ি-মাথায় আমরা এক এক জন গৃহ-দারোয়ান মাত্র! সারাদিন মাঠে ফসলের আরাধনা করে বাড়ি ফিরে দিনান্তে অনুপস্থিতি-সময়ের যাবতীয় গার্হস্থ্য-জ্ঞান আমরা wife-এর কাছে সংগ্রহ করি, স্কুলকলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় সেরে ওহিও-অক্সফোর্ড থেকে Degree সংগ্রহ করে, সর্বভারতীয় পরীক্ষার বেড়াজাল পার হয়ে দপ্তরের তকমা ছাতিতে টান টান ঝুলিয়ে আমরা যখন দিনান্তে গৃহ-মধ্যে প্রবেশ করি তখন আসলে আমরা গৃহ-দ্বারে পাহারায় বসি মাত্র।

বসি এবং সিদ্ধান্ত টানি! Computer-এ যেমন তথ্য feed করানো হয়, আমাদের মনেও তেমনি তথ্য feed করানো হয়। গৃহে আমরা অনিবার্য ভাবেই আট-দশ-বারো ঘন্টা অনুপস্থিত থাকি। সেই সময়ের 'Army'-বিষয়ক যাবতীয় তথ্য গৃহিনীর প্রত্যক্ষে থাকে। আমরা 'প্রকৃতির' স্বভাব-সিদ্ধ 'মিছরী-পানা'-র সহযোগে সেই প্রত্যক্ষ-সমূহকে 'না-চিবিয়েই' নাড়াচাড়া করে নিজ-নিজ saliva ছাড়াই গলাধঃ করি, পুরুষ computer-এ ভাবে নেই এবং ঘোঁকে-মোচড় দিয়ে সিদ্ধান্ত টানি! অন্য কেউই নয় আমরা নিজে নিজেই যেন এক একটি robot বনে যাই। তাহলে? The wife rules the Army-সিদ্ধান্তে দোষ কোথায়?

দু-একজন তার্কিক বলে বসবেন: যে সব গৃহিনীরাও আট-দশ ঘন্টা স্কুল-কলেজে অফিস-কাছারিতে কাটান তাদের ক্ষেত্রে feeding-bottle টি কোথায়? তাঁরাও তো অনুপস্থিত থাকেন? দুটি কথায় শেষ হবে মনে হয়। এক, পুরুষদের পক্ষেই কোথাও 'আয়াহারী' দোষ মানে কী? গৃহিনীদের অবশ্যই দোষ থাকে। তারা হাত চালায় দ্রুত, চোখ ঘোরায় চতুর্দিকের চোখে। মার্লকিন এলে মুখ খোলে! দুই, আমার অনুচ্ছেদের ' ' চিহ্নগুলো তবে কেন দিয়েছি! সাংখ্য দর্শনে যেমন জীবন-দর্শনেও তেমনি পুরুষ নিষ্ক্রিয়, দ্রষ্টা মাত্র; প্রকৃতিই সক্রিয়, ছলা কলায় পারঙ্গম, সত্ত্ব-রজঃ-তমঃ ত্রিগুণাত্মক এবং Freud অনাবিষ্কারেন!

সংসারের stage-এ পুতুলের নড়াচড়াই প্রত্যক্ষ, দৃশ্যমান। সুতোর খবর প্রকাশ্য নয়। প্রকাশ যোগ্যই নয় কারণ সে ক্ষেত্রে 'পাঁচালি' অশুদ্ধ হয়ে যাবার সমূহ ভয় থাকে যে! তাই প্রত্যক্ষও প্রত্যক্ষ, অনুমানও প্রত্যক্ষ হয়ে দেখা দেয়, প্রকাশ পায়।

General তথা Army ruled হবে wife-সুতোয় — এই তো পুরুষ শাসিত সমাজে পুরুষের বিধিলিপি। যে সেই সুতোয় 'নড়ে না' তাকে, গল্পের সেই একজনের মতো, নেড়ে দেখুন। প্রাণ আছে কি?

—

অভাব যখন আলো দেয়ঃ

জীবনে দুটি সত্য চিরন্তন। জন্ম আর মৃত্যু। প্রথমটির সঙ্গে দ্বিতীয়টি অনিবার্য জড়িত।

সময়ের ব্যবধান ব্যক্তি নির্ভর, বংশগতির গুণ-লক্ষণ-বাহী ডি. এন. এ নির্ভর, জীবন-যাপন প্রক্রিয়া-পদ্ধতি নির্ভর হলেও সকল জীবনই একটা সময়ের অন্তে যেতে বাধ্য। প্রাণ বা আত্মা, নিজের স্বল্প-বা-দীর্ঘ দিনের নিত্য সঙ্গী, প্রাণের চাইতে প্রিয় দেহখানিকে জীর্ণ-বসনের মতো অকালে বা সকালে পরিত্যাগ করে কোথায় কোন নিরুদ্দেশ যাত্রায় ফেলে রেখে যায়। চির বিদায়।

মৃত্যু কি এবং কেন, মৃত্যুর পরে কি আছে বা মৃত্যু কি শেষের না আবার না উত্তরণেরই-এই সব জটিল বৈজ্ঞানিক-দার্শনিক বিষয় আমার বুদ্ধির অগম্য, আমার কল্পনাতেও অসম্ভব। অতি সাধারণ দৈনন্দিন চেতনায় যা আমরা সকলেই বুঝি তা এই যে মৃত্যু একটা অভাব সৃষ্টি করে। একটা চির-অভাব। এবং এও বুঝি যে এই অভাবটা কোনও নেতিবাচক শূন্যতা নয়, অস্তিত্ব দ্যোতক অভাব-উপস্থিতি। এই অনুভবের সত্যটুকু, এই যে চলে গিয়েও থেকে যাওয়ার ব্যক্তিগত তাৎপর্য-টি এবং, সামাজিকভাবে, মৃত্যুর উপস্থিতিটুকু ছড়িয়ে ছিটিয়ে উপস্থিত থাকে, তাকে নিয়েই আমার ভাবনা, আমার বিচার।

আমরা যারা বেঁচে থাকি তারা তো প্রতিদিনের শত কাজে তার সহস্র প্রকাশের মধ্যে থেকেই থাকি। প্রতিদিনই থেকে যাচ্ছি। এবং আমাদের দৈনন্দিনতা প্রায়ই এই থেকে-যাওয়াটাকে প্রমাণ করি 'নেই' হয়ে যাওয়াটাকে অস্বীকার করে। আমরা যে আছি তার একটিই কারণ। আমরা প্রশাসনিক মতে মৃত বলে ঘোষিত হয়ে যাই নি। অন্য ভাবেও এই সত্য, এই বেঁচে থাকার সত্যটি-প্রমাণিত হয়। আমরা অনেকেই পরিবারের, সমাজের, ও স্বজন পরিজনের কাছে মূর্তিমান উপদ্রবের মতো, সাক্ষাৎ বিরক্তির মতো, সাধনা-সাধ্যাতীত দুশ্চিন্তার মতো প্রতিভাত। অনেকের কাছেই আমরা অনেকেই 'কেন মরণ হয় না' গোছের একটা বিস্ময় হয়ে বেঁচে থাকি। আর সেখানেই আমাদের 'বেঁচে আছি'-র প্রমাণটিও সোচ্চারে ঘোষিত। আর অনেকের কাছেই বা বলি কেন? আমরা অনেকেই নিজের কাছেই তো অনেক সময় এই 'কেন মরণ হয় না?'-র জীবন বাঁচি!

এই যে বেঁচে মরে থাকা এর না আছে কোনও বয়স না আছে সময় অসময়। আবার এই জীবন্মৃতের গড্ডালিকা প্রবাহে সম্পর্কও কোন নিয়ামক নয়—মাতা-কন্যা, পিতা-পুত্র,স্বামী-স্ত্রী। দিন যাপনের গ্লানি, প্রাণ ধারণের কায়-ক্লেশ নখদন্ত সংগ্রাম, প্রতিযোগিতা-প্রতিহিংসা, অভাব-অনটন, অনাহার-মার, চাকরি, ছাঁটাই-লক-আউট-ক্লোজার, এবং হাজারো সামাজিক-অসামাজিক পীড়ন, ঈর্ষা-দ্বেষ ইত্যাদির সঙ্গে ধরা আমাদের দৈনন্দিন 'আছি'-টাকেই 'কে-আর-আছি!' করে দেয়।

এ-সব ক্ষেত্রে আমরা থেকেও 'নেই' হয়ে যাই। কিন্তু এর উল্টোটা যখন ঘটে তখন অভাবটুকুই জীবন্ত উপস্থিতি বলে মনে হয়: 'সে যদি থাকত!', 'অমুক থাকলে এমনটি হত না', 'আজ বার বার তাঁর কথা মনে পড়ছে'-ইত্যাদি স্মরণ তো যাঁরা নেই তাঁদের অভাবটাকেই জাগ্রত উপস্থিতিতে টেনে আনা, সঞ্চারিত করা। যাঁরা চলে গিয়েও সরে যান না, বার বার মনের দ্বারে হাজিরা দেন, তাঁরা 'নেই' হয়ে গিয়েও তো 'থেকে' যান। মৃত্যুতেও অমৃতের স্বাদটুকু রেখে যান। এঁরা আমাদের পরম আপনজনের দলে পড়েন। এই অমৃত-পথিকদের বেলাতেও সম্পর্ক কোনও নিয়ামক নয় — মাতা-পিতা, পুত্র-কন্যা, নেতা-ভ্রাতা, কবি-সাহিত্যিক, গুরু-পুরোহিত। আমাদের

মন্ত্রণাকাতর অনুভবে এঁরা আশার বাণী বয়ে আনেন, বিধ্বস্ত বর্তমানকে ভবিষ্যৎ-মুখী করে তোলেন, অবশ মনে বল সঞ্চার করেন। দূরে চলে গিয়েও এঁরা কাছের হয়ে বেঁচে থাকেন, মৃত্যুর অন্ধকারে হারিয়ে গিয়েও এঁরা আলোর রোশনাইটুকু ধরে রাখেন। এঁদের অভাববোধটুকুই যেন বেশি করে এঁদের উপস্থিতিকে সজীব করে তোলে।

বর্তমানের বাঁচাগুলোকে তো আমরা সকলেই অতীত করে চলেছি। সেই অতীত যদি সামনের জন্যে কাঙ্ক্ষিত হয়ে ওঠে, ভবিষ্যৎ হয়ে হাজির হতে পারে, তাহলেই বাঁচাটুকু সত্যি হয়। এটা মানুষের অধিকারের মধ্যেই পড়ে, জনম-মরণের জান্তব জীবনের এলাকায় পড়ে না।

ব্যক্তি-সম্পর্কে, পরিবার বৃত্তে, সমাজের পটভূমিতে যাঁরা পদচিহ্ন রেখে যেতে পারেন তাঁরাই তাঁদের অভাববোধটুকুকে অভাবের হাত থেকে মুক্তি দিতে পারেন। অন্যথা মৃত্যুতেই নির্বংশ হলেন চিরস্থায়ী।

আশার বিস্ফোরণ :

কবি আশাকে কুহকিনী বলেছেন। খুবই সত্যিকথা বলেছেন। কিন্তু সম্পূর্ণ কথাটি বলেন নি। কারণ বোধহয় এই যে কবিদের 'সত্য ভাষণের' দায় থাকে না, অনুভবের সুন্দরকে মনোমুগ্ধকর ছন্দ-বদ্ধ প্রকাশের প্রেরণা থাকে মাত্র। সেই সুন্দর বেদনার রসে আপ্লুত অথবা বিষাদের সুরে ঝংকৃত হতে পারে, একার উপলব্ধিকে বহুজনের করে ধরাতে পারে অথবা বহুজনের অনুভবকে সর্বজনের করে চিরায়ত করতেও পারে। সেই কাব্যের সুন্দর, বেদনার বা বিষাদের সুন্দর, বাস্তব জীবনের সুন্দর থেকে একেবারেই আলাদা।

বাস্তব জীবনের নির্দিষ্ট বসন-বয়নে সুন্দর কতটো স্থান জুড়ে থাকে আর অসুন্দরের বস্তুতান্ত্রিক মোটাদাগের সুতোর টানাপোড়েন কতটা ক্ষেত্র অধিকার করে থাকে তা যাঁরা প্রতিনিয়ত নিজেরাই মাকু হয়ে বুনে চলেছেন তাঁরাই জানেন। আমাদের প্রত্যেকের জীবনই এক একটি আশা-মুখ মাকু। আমরা পেটের অন্দরে বস্তুজগতের খিদে নিয়ে আশার সুতোটি মুখের সামনে তীর-চিহ্ন করে আগু-পিছু ছোটা ছুটি করি। সারা জীবনই করি। আশা আমাদের সঞ্জীবনী মন্ত্র, কৃষ্ণের মুরলী-ধ্বনি, ভবিষ্যতের কুহু-ডাক। এ-বিষয় কবির সঙ্গে আমরা একমত। এটা সত্যও বটে সুন্দরও বটে।

কবি কিন্তু আশাদের কথাটা বলেন নি, বলেন নি বিষয়ীর মনের ভারসাম্যহীন অবস্থার কথা। "অতি-আশা সর্বনাশা"। এই আতিশয্যকতা শুধু পরিমাণগতই নয় গুণগত ভাবেও বুঝতে হবে। অতি-আশা অনায়াসেই আমাদের অনেককেই phantasy-র জগতে ঘুরপাক খাওয়াতে পারে, চাই কি, ফেরার রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে 'রাচীর' রাস্তা প্রশস্ত করে তুলতে পারে, তুলেও থাকে। তখন সর্বনাশের আর বাকি থাকে কি? সেই অবস্থার একমাত্র redeeming feature এই যে সর্বনাশকে নাশক বলে মনে করার মতো অবস্থাও থাকে না, আবার নতুন কোনও সচেতন আশারও কুঁড়ি ফোটে না। সবই মিটে যায়।

সেই অনির্বচনীয় 'সুখ' সকলের 'ভাগ্যে' জোটে না তাই আশা নিয়ে আশৈশব সকলেরই দুঃখের আর শেষ নেই, শেষ থাকে না। দৈহিক পীড়ন-বেদনা, জরা-মরণ-ইত্যাদি নিয়ে ঘর করা

অনিবার্য, এবং তার জন্যে, সে সবের জন্যে, বহুবিধ উপচারের ব্যবস্থাও আছে, যা অনায়াসে প্রাপ্য। আশার পীড়ন সর্বাবস্থায় মারক এবং তার কোন উপচার অনায়াসে প্রাপ্য নয়। তাই বিরহও আশা ভিত পর্যন্ত নাড়িয়ে দেয়। সে বিরহই করে না, বিপদও করে তোলে। আশা কেবলমাত্র সামনের দিকেই তার তীরচিহ্নটি নির্দিষ্ট করে রাখে না, সে ভিতরের দিকেও তার আঘাত-মুখটিকে ঘুরিয়ে ধরে। আঘাত বিস্ফোরণের মাত্রা পেয়ে মৃত্যুযন্ত্রণার কারণ হয়ে উঠতে পারে, অনেকের জীবনে উঠেও থাকে। তাই আশা সম্মুখ-দৃষ্টিও বটে, পশ্চাৎ-আঘাতও বটে।

আশায় বাঁচে চাষা। তবে চাষা মরে কিসে? আর কেবলমাত্র 'চাষা'-ই কেন? শিশু তার মায়ের আশায় বাঁচে না? যুবক চাকরির আশায়, ছাত্র result-এর আশায়, ব্যবসায়ী মুনাফার আশায়, মা-বাবা সুসন্তানের আশায়, 'বড়বাবু' উন্নতির আশায় আর বৃদ্ধ দীর্ঘজীবনের আশায়? ক্যাসিনোর চক্র-ব্যূহে অথবা লটারির কাউন্টার-কয়েন বুকে নিয়ে আকাশ-কুসুম-দৃষ্টি আমাদের ভিড় কি দিন দিন বেড়েই চলেছে না? ঘোড়ার খুরের ছুটে ধাবমান শব্দ কি আমাদের অনেকের হৃদয়ে স্পন্দন ওঠা-পড়ার কারণ ঘটায় না? আমরা শান্ত হই সর্বস্বান্ত হয়ে, ধসে গিয়ে দুঃখ-জীবন যাপন করি, অদৃষ্টে করাঘাত করে দুঃখ-কারাগারে দেহবন্দিশালায় নিজেদের বন্দি করে রাখি, আশাকে কবরে পাঠাই।

আশার সঙ্গে প্রত্যাশা ওতপ্রোত জড়িত। পুত্র-কন্যা মায়ের কাছে আশা করে, মা প্রত্যাশা করেন। স্বামী স্ত্রীর কাছে এবং স্ত্রী স্বামীর কাছে কিছু-থেকে-অনেক-কিছু আশা করেন, প্রত্যাশাও করেন। তেমনি বন্ধুর কাছে বন্ধু, ভাই-এর কাছে ভাই, প্রতিবেশীর কাছে প্রতিবেশী। এমন কি ট্রেনে-ট্রামে-বাসে, পথে-ঘাটে, হাটে-বাজারে, মাঠে-ঘাটে, আশা-প্রত্যাশার চাপ সৃষ্টিকারী বৃদ্ধ-থেকে-নবজাতক মানুষের শিখাগুলি এক মন থেকে অন্য মনে অহরহই ছুটো ছুটি করে চাপকে উত্তাপে, উত্তাপকে অগ্নিকাণ্ড এবং অগ্নিকাণ্ডকে বিস্ফোরণের দিকে নিয়ে চলেছে। আর তাই আশার সুতো-মুখ মাকুর চলনে বাস্তব জীবনের বস্ত্র বয়নে যে আচ্ছাদন তৈরি হচ্ছে তাতে সভ্যতার আবরণটি পর্যুদস্ত হয়েই দেখা দিচ্ছে। প্রত্যয় না হয় ঘর থেকে দুই পা ফেলে একবার দেখুনই না কি দৃশ্য ধরা পড়ে — বাজারে, ট্রেনে, শিয়ালদহ-হাওড়া স্টেশনে আর কলকাতার যাবতীয় চলার পথের পথে-পথে।

এখানেই বিষয়-বিষয়ী-কথার তাৎপর্য। মনের মধ্যে শত-শত আশার বীজ স্বতঃই অঙ্কুরিত হয়ে চলে। যার যার আশা তো সম্পূর্ণই তার তার একেবারেই নিজের ব্যাপার, একেবারে Private এবং Subjective. কিন্তু বিষয়ীর মনের একান্ত গভীরে উৎসারিত হয়েও প্রত্যাশার কেন্দ্রটিকে কিন্তু আমরা অন্যের ঘাড়ে চাপিয়ে বসি। গোল বাধে সেখানেই এবং তৎক্ষণাৎ। অন্যের মনের গভীরে যে আশার অঙ্কুর, যে প্রত্যাশার দৈর্ঘ্য-প্রস্থ-বেধ-পরিসর, তার দিকে দৃষ্টি দেবার মতো চোখ কোথায় আমাদের? নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত আমরা অপরের আশা-প্রত্যাশায় একেবারেই ভাবিত নই। তাই বিষয়ী-বিষয়ে আশার অনিবার্য পীড়নে অগ্ন্যুৎপাত-বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিজেদেরও বিপন্ন করি অপরকেও তো সেই আগুনে পুড়িয়ে মারি।

Extinguisher কোথায় পাবো? আশার বীজের অন্তরে যে DNA RNA আছে তাদের যদি শীতলতার আর উদারতার Cylinder এ সুরক্ষিত রাখা যায়?

অ-প্রীতি-উপহার ঃ

প্রীতির সঙ্গে অপরকে কোনও কিছু দেওয়াকে উপহার বলা হয়। প্রীতি একটি অনুভবযোগ্য মানসিক বিষয়, উপহার বা দ্রব্যসামগ্রী অবশ্যই দৃশ্যমান। প্রীতিপূর্বক দান কর্মকাণ্ডে প্রীতি অবশ্যই দানের prefix, কোনও উপসর্গ নয়, প্রাক্-প্রেরণা মাত্র, উত্তরাত্র শব্দার্থকে অন্যত্র নিয়ে যাবার জন্যে নয়। কিন্তু 'উপহার' ব্যাপারটি সামাজিকতার ক্রম-অভিব্যক্তির ধারায় কেমন ধীরে ধীরে নিশ্চিত 'উপসর্গ' হয়ে দেখা দিল তার ইতিহাস আমাদের সঠিক জানা নেই। তবে এ-কথা অবশ্যই জানি যে উপঢৌকন থেকে ধাপে ধাপে 'সওগাত', 'ভেট' হয়ে একদিন প্রীতি-উপহারের সোনা-জল ছাপ থেকে মুক্ত হয়ে 'উপহার' আমাদের বর্তমান বেসমাল জীবনে একটি উপসর্গ হয়েই দেখা দিয়েছে। উচ্চবিত্ত সমাজে যা ছিল উপঢৌকন তা সর্বপ্রবাহিত হয়ে লাল জল্লুয়া-মসলিনের আড়ালকে চোখ-ঝলসানো করে, নতমস্তক দানকারী থেকে উষ্ণীষ-উন্নত উপহৃতের দ্বারে পৌঁছোতো। সে ছিল রাজা-রাজড়াদের ব্যাপার, সম্রাট-বাদশাদের অধিকার। সেই পর্যায়ে দাতা-গ্রহীতার নিম্ন-উচ্চ শির-সম্পর্কই দ্রব্যসম্ভারের গুণ-পরিমাণ নির্ধারণ করে দিত।

বিশেষ কৃষ্টির বাতাবরণে সওগাতের চলন ছিল স্বাভাবিক। এটা তা-বড় তা-বড় সমাজ-প্রধান থেকে শুরু করে উচ্চবিত্ত-নিম্নবিত্ত প্রকরণে সমান সচল ছিল। ভেট-এর রীতিটি বহু-প্রাচীন হওয়া সত্ত্বেও আমাদের সমাজে ইংরেজদের কৃষ্টির আওতায় যেন ভেট-কে প্রায় সর্বজনীন করে তুলেছিল। বিশেষ বিশেষ দিনে বা অনুষ্ঠানে ভেট-প্রদান যেন শ্বাসপ্রশ্বাসের মতোই সহজ-স্বাভাবিক হয়ে উঠেছিল।

আমরা যে উপহারের বিষয়ে ভাবিত তা নিরেট মধ্যবিত্ত সমাজের দান। মধ্যবিত্ত সমাজ সব সমাজেরই মূল ধারা, মূল ভাবের ধারক, এবং মূল ধারণার ভক্তি-বাহক। তাই দেখতে পাই উপঢৌকনের মোড়ক, সওগাতের সহবত, ভেট-পর্বের বারোমাসে-তেরো-পার্বণ-মানসিকতার সবই কেমন এক স্রোতে এসে উপহারের মোহনাতে মিলে মিশে একাকার হয়ে গেছে। উপঢৌকনের নত-গ্রীব ভঙ্গিটি বাদ গেছে, সওগাতের অন্তরঙ্গ-অনুভবটুকু ছাঁটাই হয়ে গেছে আর ভেট-পর্বের জো-হুজুর নাজুক-নাজুক ভাবটাও বেমালুম উবে গেছে। যোগ-বিয়োগ করে, কাট-ছাঁট করে, অভিব্যক্তির মধ্যবিত্ত উত্তরণটি প্রীতি-উপহার হয়ে জন্মদিনে-উপনয়নে, বিবাহে-বৌভাতে এবং বছরের 'সাল-গিরা'-য় সহাস্য হাজিরা দিচ্ছে।

সহাস্য বটেই, তবে সেই হাসিটি ঘন কালো মেঘের পাশের আলোর কারিকুরি কিনা তা সঠিক বুঝে ওঠা ভার। কোনও মাসে একাধিক উপহারের সমন বয়ে envelope গুলো যখন একে একে মাসান্ত ঘড়ায়-তোলা-জলের সীমিত আয়ের ভঙ্গুর দেহখানিকে আঘাত করতে থাকে তখন মুখে হাসিটি অনেক মূল্যে আটকে রাখতে হয়। এই অনেক মূল্যের মধ্যেও আবার প্রধান হয়ে দেখা দেয় যদি envelope বাহিত সমনটি তাঁর সম্পর্কের দিক-নির্দেশ করে। অর্ধাঙ্গিনীর প্রীতিভাজনের জন্যে উপহারের মূল্য ও মর্যাদা নিরপেক্ষ বা আয়-অপেক্ষ থাকে না, ব্যক্তি-সাপেক্ষ হয়ে দেখা দেয়। উপসর্গ আর কাকে বলে তাহলে?

সাধারণভাবে বলা যায় যে মধ্যবিত্ত সমাজে উপহারের প্রীতি অংশ অনেক দিন হল উঠে গেছে, এখন তাই সকলেই 'উপহার' ক্রয় করেন, বহন করেন এবং প্রদান করেন। দ্বিতীয়ত, উপহার এখন

এমন একটি অস্ত্র হয়ে মধ্যবিত্ত জীবনের সমাজদেহে চলাচল করছে যা দ্বি-ধার — যেতেও কাটে আসতেও কাটে — শাঁখের করাত। একে উপড়ে ফেলতে চাইলেও ওপড়ানো যায় না, গিলতে গেলে রক্তক্ষরণ ঘটে। কেন? তাই তবে বলি।

প্রীতি-উপহারের প্রীতি-স্নেহে মনের আনন্দের দিকটি, অন্তরের অভিব্যক্তির প্রকাশটি ছেঁটে দিয়ে ব্যবসায়িক investment-বোধটি জায়গা জুড়ে বসে আছে। এখন উপহার-দ্রব্য ক্রয় করার সময় আমরা আমাদের নিজ নিজ আনন্দের কথা ভাবিনা, প্রাপকের ঠিকানা — মান-সম্মান-অর্থকৌলিন্য বিচার করি। দাতার মনোবাঞ্ছার চাইতে গ্রহীতার মূল্য-মূল্যায়ন প্রভাব বিস্তার করে। তা ছাড়া, আমার বাড়িতে-পরিবারে যখন অনুরূপ অনুষ্ঠান হবে তখন আজকের গ্রহীতা হয়ে দাঁড়াবেন দাতা। তাই ভবিষ্যতের speculation অনিবার্য ছায়া ফেলে। তৃতীয়ত, আমরা অনেকেই তো নিমন্ত্রিত তালিকা লিপিবদ্ধ করার সময়ে, সাধারণভাবে মনে মনে, কিন্তু একান্তে স্বামী-স্ত্রীতে নিরিবিলিতে প্রাপ্য তালিকার একটা কাল্পনিক হিসেব নিকেশ করে ফেলি! রক্তহীন মধ্যবিত্ত পরিবার-দেহ থেকে যতখানি রক্ত অনুষ্ঠান-সমাপনে ঝরে যাবে তার সঙ্গে প্রতিতুলনা করি কতখানি 'ফেনো'-রক্ত ঘরে ঢুকবে তার।

এই যে প্রতিতুলনার প্রতিবর্ত হিসেব নিকেশ এ-থেকে মুক্তির পথ আমাদের নেই। কারণ মাঝপথে উপহারের স্রোতধারাটি যদি নীতিগত সিদ্ধান্ত করে বন্ধ করে দেওয়া হয় তাহলে একটা মুদিখানাকে হঠাৎই বন্ধ করে দিয়ে বাজারে ছড়ানো ধার-দেনা হাতছাড়া করার মতো সর্বনেশে ব্যাপার হবে না? কতো জনকেই তো কতো উপহার invest করা হয়ে আছে, এখন যদি দোকান বন্ধ করে দিয়ে বলি 'আর না' 'অনুষ্ঠান ঘরোয়া করবো','উপহার নেবো না' — তাহলে লোকসানের একশেষ হবে না? তাই উপহার চলছে, চলবে। দোকান চললেই একদিন বাজারের ধার উঠে আসবে, আসবেই।

কিন্তু ততদিনে যে আরও ধার পড়ে যাবে? Investment বেড়ে যাবে? উপহারের debit-credit হিসেবে আমরা কোনো পণ্ডিত ব্যক্তি হতে চাই না—অর্ধেক ত্যাগ করা আমাদের দ্বারা হয়ে উঠবে না। আর জীবন কোন দার্শনিক বিষয় নয়, নাম-দামে বেঁচে থাকা সংগ্রামের নাম। তাই নীতি বা আদর্শ, ঔচিত্য বা যোগ্যতাযোগ্যতা মুনি-ঋষি-গুরুদের বিচারের বিষয় হতে পারে, জীবন-যৌবন-ধন-মান নিয়ে যে অবস্থান সেখানে নৈব নৈব চ।

আত্মনেপদী-পরস্মৈপদী :

আমরা সারাজীবনই নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। অহম্-এর মধ্যে আমাদের কেন্দ্রীয় অবস্থান বিন্দু। মাঝে-মধ্যে আমরা সকলেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে বাইরে বিচরণ করি কিন্তু কখনই সেই মূল আত্ম-বিন্দুটির মহাকর্ষকে ভুলি না। আমাদের শৈশব তাই কখনই প্রায় কাটতে চায় না। শিশুর যেমন মায়ের আঁচলটুকু সব পাওয়ার শেষ পাওয়া, সকল প্রাপ্তির শেষ প্রাপ্তি, আমাদেরও তেমনি ওই অহম্-বিন্দুটি, আত্ম-কেন্দ্র-টি।

শিশু তার সুদীর্ঘ জীবনে তিনবার আঁচল পাল্টায়। 'আঁচল' এই জন্যে যে প্রত্যেকবারই একটি নারীকে কেন্দ্র করে সে নিজেকে খোঁজে। শৈশবে মা, যৌবনে স্ত্রী এবং বার্ধক্যে বধূমাতা বা কন্যা।

না, পুরুষ-শাবকদের দোষ দেওয়া ঠিক হবে না; কন্যারত্ন-রা শৈশবে মা, যৌবনে স্ত্রী-থেকে-মা-হয়ে এবং বার্ধক্যে পরিবারের কেন্দ্র-আকর্ষণী হয়ে নিজ-নিজ অস্তিত্বের কেন্দ্রমূলটিকে সজীব সেচন দেয় আর আঁচলটি করে কাছে টানে, পুত্রকে-কন্যাকে, স্বামীকে-শ্বশুরকে। পুরুষরা বাইরে যায় আর ফিরে ফিরে আসে গৃহকোণের স্বস্তিতে। সেই স্থানেই সে তার অহম্‌-এর তৃপ্তি খুঁজে নেয় নিজের মতো করে। নারীদের জগৎ সেই গৃহকোণটিকে আত্মসাৎ করে, আত্মতৃপ্তিতে। একজন অপরের আঁচলে নিজেকে খোঁজে, অন্যজন নিজের আঁচলেই অহম্‌-কে খুঁজে পায়।

আমরা জীবনের ঊষাকাল থেকেই শুরু করি সংগ্রহ করতে। পুতুল-মার্বেল দিয়ে যে সংগ্রহ-যাত্রার শুরু তা শেষ পর্যন্ত গাড়ি-বাড়িতে দিবা-দ্বিপ্রহরের আলো পায়। স্তূপাকৃতি সেই সংগ্রহশালার কেন্দ্র বিন্দুটিতে থেকেই আমরা পরিধি পরিমাপ করতে তখনও ব্যস্ত থাকি। এখানে নারী-পুরুষের ভেদাভেদ নেই। অহম্‌-এর বেলুনটির ঘেরাটোপে নিজ-নিজ সম্পদ-সংগ্রহের বর্ণসুষমা দেখতে দেখতে আত্মতৃপ্তির ঢেকুর তুলি আর অপরের সংগ্রহের প্রতি-তুলনায় সেই বেলুনে চাপ-শক্তির যোগানটি অব্যাহত রাখি। আত্মনেপদী অবস্থানের এটাই শেষ ঘাঁটি কারণ এর পরেই শুরু হয় পরস্মৈপদী যাত্রা। সারা জীবনের স্তূপাকৃতি সংগ্রহের সামনে দাঁড়িয়ে হঠাৎ একদিন মনে হবে কি করা যায় এই স্তূপকে নিয়ে? এ-এক বিষম দ্বন্দ্ব। কূল-কিনারাহীন। সংগ্রহের স্তূপের পাশাপাশি তখন শূন্যতার গহ্বর দেখা দিতে থাকে যে।

সর্বহারা গোলাপী তার সারাজীবনের সংগ্রহকে একটি ছিন্ন-মলিন কাপড়ের বোচকা করে সর্বক্ষণ আগলে বেড়াল। তার পর একদিন সে তার 'সকল' আগলা ফেলে রেখে চোখ বন্ধ করল। অথবা, শহরের পথপ্রান্তে আকাশ-ছাদ আজীবন-গৃহে (!) ভিক্ষাবৃত্তির সমস্ত সম্বল সযত্নে রক্ষা করে, লক্ষ টাকার স্তূপে মাথাটি রেখে, ভিখারীটি যখন মুষ্টি আলগা করে পড়ে রইল, তখন তার শীর্ণ দেহ কোটরাগত চোখ, তার সম্পদতায় ধিক্কার ধ্বনিটি হলেই দেখা দেয় না কি? নরেনবাবু উদয়াস্ত পরিশ্রম করে দেহের প্রতিবিন্দু রক্ত-ঘাম আর মনের সকল আশা-আকাঙ্ক্ষার উত্থান-পতনকে একাগ্র করে ইট-কাঠ-সিমেন্টের ভাষায় রূপান্তর করালেন। হেলে-পড়া বেলায় প্রাসাদোপম বাসস্থানটির মধ্যে অহম্‌-এর পূর্ণ-অনুভবে সমৃদ্ধ হয়ে হঠাৎই একদিন দেখলেন ছেলে-মেয়েরা যে-যার অহম্‌-এর তাড়নায় নরেনবাবুর মতোই স্বতন্ত্র সংগ্রহের বেদিমূলে নিবেদিত-প্রাণ। তখন তিনিও, গোলাপী-ভিখারীর মতো, শূন্য কক্ষ থেকে শূন্য কক্ষে খাঁখাঁকে অন্ধের মতো হাতড়িয়ে ফিরছেন। বাসস্থান নির্জন শূন্যস্থান; ঘরের বাতাস তখন আর অক্সিজেনের যোগান না দিয়ে হাহাকারের দীর্ঘশ্বাস ছড়াচ্ছে। তাহলে?

আত্মনেপদী জীবনের তিন চতুর্থাংশ সময় তাহলে হঠাৎই একদিন অর্থহীন সংগ্রহ মত্ততায় কেটে গেল বলে মনে হবে না কি? পরস্মৈপদী হবার মতো সময় আর কতটুকু অবশিষ্ট থাকবে তখন? আর তখন তড়িঘড়ি করতে গিয়ে, ভুলের পর ভুল করে সেই ভুলের স্তূপের আড়ালে হারিয়ে যাবো না তো? তখন নিজ নিজ অহম্‌-এর বদলে স্ব-স্ব অদৃষ্টকে খুঁজে নেবো করাঘাত করার জন্যে, ঈশ্বরের সন্ধানে মঠে-মন্দিরে অন্বেষণ চালাব কৃতকর্মের দায়ভার স্থাপন করার মতো স্কন্ধের সন্ধানে, অথবা পুত্র-কন্যাদের স্বার্থান্ধ অহম্‌-কেন্দ্রিক মানসিকতাকে দোষ দেবো গৃহের শূন্যতাকে ব্যাখ্যা করার জন্য।

চোখ বন্ধ করার আগে, মুষ্টিকে চির-আলগা করে দেবার আগে, আর সংগ্রহ-কক্ষের শূন্যতায়

হাহাকার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বেই অহম্‌-এর কবল থেকে নিজ নিজ চিত্তটিকে সচেতন করে তুললে কেমন হয়? জীবনের আজীবন সংগ্রহকে বস্তুকেন্দ্রিক স্তূপাকার চেহারা না দিয়ে, সবকিছুকেই আত্মকেন্দ্রী না করে, চিত্তকেন্দ্রিক সম্পদতা দিয়ে, পরমেশ্বরমুখী করে তুললে কেমন হয়? অন্যলোকে হাত দিয়ে চোখের পাতা টেনে বন্ধ করে দেবার আগেই সেই অন্ধ-দৃষ্টি হতে পারলে বালিসের তলায় শ্মশান-সংগ্রাম ঘটিবে না মনে হয়।

কানকথা ও পরিবেশ দূষণ :

পরিবেশ দূষণ নিয়ে এখন বিশ্বময় হৈ চৈ চলছে। আবহাওয়া অদূর ভবিষ্যতে গরম হয়ে যাবার ভয়ে এখন সর্বত্র পরিবেশ নিয়ে আবহাওয়াকে গরম করে রাখা হচ্ছে। একেবারে যাকে বলে গরমগরম অবস্থা। ক্ষুধার অন্ন জোটাতে সকালে উনুনে 'আঁচ' দিলেন তো পাশের বাড়িতে একাধিক জানালায় খড়খড়িগুলো খটাখট্ শব্দ করে বন্ধ হতে লাগল, একাধিক কণ্ঠে বিরূপ-ধ্বনি ঝংকৃত হয়ে গেল! gulf এলাকায় সেই ধোঁয়াই আকাশ-মাথা হয়ে বিশ্বের দুশ্চিন্তাগ্রস্ত মস্তিষ্কগুলোকে একঠাঁই করে ফেলল। উৎস আলাদা, তাই সেই দূষণ জলে-স্থলে-অন্তরীক্ষে ঘনকৃষ্ণ দুশ্চিন্তা হয়ে হৃদ্দারক চেহারায় প্রকট হল। চরাচরে 'গেল-গেল' রব উঠল।

আধুনিক সভ্যতা তো কলে কারখানায় দানবকে বাহন করে ধেয়ে আসছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগে সবাই ছিল স্ব স্ব ক্ষেত্রে প্রকৃতি নির্দেশিত এলাকায় সীমাবদ্ধ। সার্বিক সংহতিতে, সামঞ্জস্যে, টোকাটি পড়ার উপায় ছিল না। এখন প্রকৃতি নয়, সভ্য-সভ্যতর-সভ্যতম মানুষই, খোদার উপর না হলেও, প্রকৃতির উপর খোদকারি করতে উঠে-পড়ে লেগে গেছে। ভোগের হাঁ বোজাতে গ্রামের আর পাহাড়-প্রান্তরের সবুজ 'দেশ' ছাড়া হয়ে শহরের দিকে পড়ি মরি ছুটে যাচ্ছে; শহরগুলো ক্রমশই দড়কচ্ছে, প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যে বেড়ে চলেছে আর সেই ফাঁকে শ্বাসরুদ্ধ হয়ে হাঁপানিতে ভুগতে শুরু করেছে। কলকারখানার অবিশুদ্ধ-অ-পরিশুদ্ধ মল-মূত্র-ধূত্র পৃথিবীর বুকে জমা হয়ে হয়ে খাদ্য-পানীয়-পুষ্টিতে টান ধরাচ্ছে আর সেই সব দানবের দূষিত ধোঁয়া-ধুলো-নিশ্বাসে পৃথিবীর আকাশে আলো আর অক্সিজেনের অভাব দেখা দিচ্ছে।

গ্রীন হাউস থেকে শুরু করে green effect পর্যন্ত সবকিছুই বাইরের পরিবেশকে নিয়ে ব্যস্ত, ক্ষেতরক্ষী যে মানুষের দূষণের মার খেয়ে খেয়ে কবেই মরে গেছে, বা মৃতপ্রায় অবস্থায় কায়ক্লেশে, কোনমতে, বেঁচে আছে, তার কথা কেউতো কৈ তেমন করে বলছে না! অভ্যাস হয়ে গেছে বলে? জৈব বাঁচাটাকে প্রত্যক্ষ বুঝি কিন্তু মানসিক বাঁচাটা তেমন করে বোঝার দরকার হয় না বলে? চিত্তের ঐশ্বর্য আর হৃদয়ের গভীরতা ব্যাপার গুলো অত্যন্ত abstract বলে? অথবা অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থানের মতো সত্য-শিব-সুন্দর খোঁচা মারে না বলে? স্ব-চেতনা আর বিবেকবোধকে তবে সোনার অলঙ্কারের মতো Locker-জাত করা হয়ে গেছে অনেকদিনই? এবং অলংকরণের জন্যে immitation এর দর্শনধারি জিনিকেই চিত্তের মনোহরণের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে? তাই বোধহয় দৈহিক Pollution টের পাই বলেই আমরা সোচ্চার, ইন্দ্রিয়গণ revolt করে। মানসিক Pollution টের পাবার মতো মনটাই অবশিষ্ট নেই, তাই প্রতিবাদও নেই।

মনকে দূষিত করে কে এবং কারা, কি এবং কিভাবে? সব প্রশ্নের সারাংশের উত্তর

'কানকথা'। ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ-সংঘাত, মারামারি-কাটাকাটি এ সব বড় বড় ঘটনা-দুর্ঘটনা থেকে শুরু করে চিমটি-কাটা, চুল-টানা, কান কামড়ে দেওয়া অথবা পিঠে-কিল-দিয়ে পালানো পর্যন্ত ব্যাপার-স্যাপার সবই সামনা সামনি ঘটে। রক্তের চাপ, হৃদয়ের তাপ আর মুষ্টি-বদ্ধ-হাতে দৃঢ়তা সবই এক সময়ে, এবং সম্ভবত খুবই দ্রুত, কমে যায়। পরস্পরের জীবন যাপন পরিবেশটি যথেষ্ট রকমের দূষিত হতে পারে না বা দূষিত অবস্থায় দীর্ঘদিন পরস্পরের শ্বাসকার্যের এবং প্রাণধারণের পক্ষে মৃত্যুর কারণ হতে পারে না। সামনা-সামনি বলেই Pollution-এর Scope থাকে না, গড়ে ওঠারই সুযোগ পায় না। মিল হয়ে গেলে ঝগড়া-বিবাদ অতীত হয়ে যায়, মিথ্যা হয়ে যায়। মিল না হলে বুঝতে হবে মিলের প্রয়োজনটাই অস্বীকৃত, এবং তাই সেক্ষেত্রেও অতীত হয়ে যায় এবং একদিন দ্বন্দ্বের তীব্রতা হারিয়ে বেমালুম হারিয়ে যায়।

কিন্তু কানকথা? সে-যে back-stab, শুধু পেছনে আঘাতই নয় অজ্ঞাত-উৎস-আঘাত। ছোরা-বন্দুক হাতে back-stab থেকে কানকথার এখানে এক মারাত্মক প্রভেদ। ক বলে খ-এর কানে গোপনে, খ উত্তেজিত হয়, ক সেই উত্তেজনায় সদাসর্বদা, কখনও শুষ্ক কখনও ভিজে কাঠের ইন্ধন জোগাতে থাকে, মার খায় গ বা ঘ। টের পাবার জো নেই, পদ্ধতি নেই। সুতো কোথায় কে জানে, কে সেই সুতোয় নতুন সংযোজন করে তা থাকে অন্ধকারে, কিন্তু খ-এর আঘাত সপাটে মাথা থেঁতো করে দেয় গ বা ঘ এর। তার পরেও আছে gangrene-এর সম্ভাবনা। কানকথা, স্ব সত্যার্থেই বিষ-কথা। ভালো কথা মাত্রেই কানেকথা, মন্দ কথাই সর্বদা কানকথা!

কানকথা দূষিত করে একে-ওকে-তাকে এবং বহুজনের গৃহ-পরিবার পরিজনকে। কান কথার বিষ উৎসটি থাকে ক-এর motive এ, intention-এ আর কানকথার উর্বর ক্ষেত্রটি থাকে শ্রোতার নেশাগ্রস্ত মনের গভীরে, চারপাশে এবং কখনও কখনও একেবারে মনের সদা-উপরিতলে। কানকথা তাই বীজের ধর্ম নিয়ে রোপিত হয়, বনস্পতির স্বভাব নিয়ে বেড়ে ওঠে আর সংসারে অরণ্যের সৃজনকে ত্বরান্বিত করে: বলার লোকের চাইতে শ্রোতা এই গৃহ-সংসারের মানস-পরিবেশকে বেশি দূষিত করে। কারণ যে বলে সে একার কেরামতিতে প্রয়োজনীয় পরিবেশ-দূষণ সম্ভব করে তুলতে পারবে না ভেবেই অপরের কানকে খোঁজে। এবং খোঁজার সময় নিশ্চিত হয়েই বিষবাষ্প উদ্গিরণ করে যেন শ্রোতা যে কোনও ভাবে-বা-কারণেই হোক কুমারী-জমির মতোই উর্বরা এবং সুফলপ্রসূ থাকে! প্রাণিজগতে শিকারকে যেমন হত্যের injection-দ্বারা মৃতপ্রায় করে তারপরে টেনে নিয়ে যাওয়া চর গবেষো, মানুষের মধ্যে কানকথা-বক্তারাও তেমনি শ্রোতা-শিকারকে প্রয়োজনীয় ছলাকলা ব্যবহারে বধ্যভূমিতে স্থাপন করে নেয়। এবং এই কানা-কানি কানকথার ফলে সম্পর্ক ভাঙে, সংসার বিশৃঙ্খল হয়; পরিবারে ধ্বস নামে। এর ফলে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে দ্বন্দ্ব অনিবার্য হয়, শ্রেণী সংগ্রামে আগুনের ফুলকি ছোটে, জাতিতে জাতিতে ধ্বংসের দামামা বেজে ওঠে। এর ফলে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয়ে যায়, পিতা-পুত্র বাক্যালাপ হয় না, মাতা-কন্যা উত্তর-দক্ষিণ গোলার্ধে পরিণত হয়। ভাইয়ের সঙ্গে ভাই-এর শত্রুতা রক্তারক্তিতে পৌঁছোয়, প্রতিবেশীর সঙ্গে প্রতিবেশীর কাজিয়া লেগে যায়, এ-পাড়ার ও-পাড়ার রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হয় এবং দাঙ্গা-অগ্নিকাণ্ড-বোমা-পাইপগান জনজীবন অক্টোপাস অধিকার করে শ্বাসপ্রশ্বাস বন্ধ করে দেয়। পরিবেশ দূষণ নয়?

কানকথা, চামচেবাজি, লাগানে-ভাঙানো, কান-ভাঙানো, কানে তোলা—এ-সব একই শ্রেণীর মধ্যে পড়ে কারণ উদ্দেশ্যের মোড়কে ব্যক্তি-স্বার্থটিই থাকে গড়তে গড়তে একঠাঁই। তস্করবৃত্তি,

intelligence, spying ইত্যাদি অন্য বর্গের ব্যাপার, কারণ সেখানে ছোট-বড় সামরিক স্বার্থ-থাকে এবং, দ্বিতীয়ত, সেখানে খবর সংগ্রহটাই মূল। কানকথায় অপরের মনকে দূষিত করা, বিভ্রান্ত করা, এক দিকে (অবশ্যই ক-এর স্বার্থের পূরণের দিকে) হেলিয়ে দেবার বাসনাটি মুখ্য।

কান না পাতলে কান কথার কুঁড়িটি ফুল হয়ে ফোটে না। কানপাতলা না হলে কান কথার জন্মই হত না। তাই দেখবেন শিল্পী রাঁধুনীর দিকে, পাত্রী কিনের দিকে, পিতা-ভ্রাতা-জেঠা-খুড়োর ছেলেদের চাকরীটির দিকে কেমন একমনে ঘাড়টি হেলিয়ে দিয়ে কানকে পাতলা করে রাখছেন। নেতারা চামচের দিকে, চাপকারণী মোল্লা-পুরুত-ফাদাররা আলখাল্লা-নামাবলি-জোব্বায় নিচে কনুইয়ের ভর দিয়ে ঝুঁকে আহ্বান করজোড় সামনে বসা আশ্রিত-বৃন্দের মুখ চেয়ে শ্রবণ-যন্ত্রটিকে নিঃশব্দে সমর্পণ করে। মহাত্মা-মহাপুরুষ-স্বামীজীরাও বাদ যাবেন না তো অন্যের কথায় কি আছে?

হিরোশিমা-নাগাসাকিতে আগুন ঝলসে উঠেছিল, ধোঁয়া কুণ্ডলীকৃত হয়ে আকাশ থেকে বিষ-বৃষ্টিকে টেনে এনেছিল, radiation ক'এক পুরুষকে পঙ্গু দান করেছিল। মধ্য এশিয়ার এই সেদিন প্রায় অনুরূপ মহানাশযজ্ঞের অনুষ্ঠান ঘটে গেল। এ-সবই তো রাজনীতি-রণনীতি-ব্যবসা বাজার-প্রীতির দান। সভ্যতার জয়যাত্রায় অমৃতের সন্ধানে ওইটুকু গরল তো কারো-না-কারো কণ্ঠে স্থান পাবেই! তবুও তাই নিয়ে এতো হৈ-চৈ। কিন্তু গৃহ-বিশ্ব-জীবন থেকে শুরু করে সমাজের সর্বস্তরে যে সর্বনাশা মানসিক দূষণ অনবরত চলছে, ব্যক্তি-চিত্ত থেকে জাতির অন্তর পর্যন্ত যে দূষণ জরা-ব্যাধি-পঙ্গু-মনের প্রবাহ টেনে আনছে তার কি হবে? কান কথার দোষ কি কানে, না কথায়, না কান-পাতলা কানে? কোথায় অস্ত্রোপচার সঠিক হবে?

সুপ্ত শিশু :

শিশুর মাঝে ঘুমিয়ে আছে সব শিশুদের পিতা। প্রকৃতপক্ষে এই কবি ঘোষণায় শুধু যে পিতাই লুকিয়ে থাকে শিশুর অন্তরে তা নয়, সমাজ-সভ্যতা এবং যা কিছুই মানুষের মহান অধিকার সে সবই সুপ্ত থাকে শিশুর অন্তরে। এটা সত্যের একদিক। অন্যদিকে, সকল পিতার অন্তরেও একটি করে শিশু লুকিয়ে থাকে, সব বয়সের সব ব্যক্তির মনের কোথাও না কোথাও একটি শিশু-মন সুপ্ত থেকে যায়। থেকে যায় সারা জীবনই। কর্কশ-কঠিন জীবনের পথে-পথে সেই শিশুচেতনা সুযোগ পেলেই প্রকাশের জন্যে উতলা হয়ে ওঠে। কিন্তু তাকে বারে বারেই গলা টিপে হত্যা করার চেষ্টা চলে। এই চেষ্টার সফলতাই জীবনে 'সাফল্য' এনে দেয়, কারণ জীবনের দায় জল্লাদের মতো ঘোলা ঘোলা রক্তাক্ত-দৃষ্টি, আর দায়িত্ববোধ নাকে-চশমা-পক্ককেশ-তির্যক-দৃষ্টি পেয়াদার মতো নিষ্করুণ। সেখানে জাগতিক সাফল্য পেতে হলে অন্তরের নিভৃতকোঠায় অপেক্ষারত শিশু-মনটিকে একেবারেই পগারপার করে দিতে হয়।

কিন্তু সাফল্যের মতো সফলতা ক'জনে পায়? আমরা, যারা শত-সহস্র সাধারণের দলে, সফলতাকে যারা সাফল্যের সঙ্গে ধাতস্থ করে কখনই পাই না, তারা যে তা পাই না তার কারণও সেই শিশুটির সদা-উপস্থিতি। সরলতা শিশুর সাধারণ গুণ, অবুঝ তার মন, অভিজ্ঞতার পলি পড়ে পড়ে তার মনটি পার্থিব সম্পদের ফসল ফলানোর মতো উর্বর নয়। বিশ্বাসের অনাবিল বৃত্তিতে ভূতপ্রেত দৈত্য-দানোর পাশাপাশি মানুষের প্রতি বিশ্বাসটিও বদ্ধ-মূল আন্দোলিত হতে থাকে। বিশ্বাসী ব্যক্তি

সূঁচের ছিদ্রপথে পথ খুঁজে পায়। বিশ্বাসে কৃষ্ণ এবং ঈশ্বর মেলে, বিশ্বাস করে ঠকাও তায় ইত্যাদি বোকনার মধ্যে মানুষের মনের গভীরে যে শিশুটি থাকে তাকেই বাঁচিয়ে রাখার, উস্কে দেবার, চিরায়ত করার বাসনাটি প্রকাশ পায়। যারা জানে তারা বোঝে যে মানুষকে বিশ্বাস করা পাপ, সন্দেহই সত্য-সন্ধানের প্রধান হাতিয়ার, বক্র-কুঞ্চিত দৃষ্টিই সত্য-সাধন দৃষ্টি। এরা কেউ-কেটা হবার জন্যে জন্মায়, শিশুমেধ-যজ্ঞে এরা বিশ্বাসী আর সরলতাকে আহুতি দিয়ে পরম-চক্রবর্তীত্ব পায়।

এই চক্রবর্তীরা সমাজের সব স্তরে উচ্চস্থান অধিকার করে সদাই নিম্নদৃষ্টি। অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু শত-কোটি অ-চক্রবর্তীরা যে জীবনে বিশ্বাস না-হারিয়েই বাঁচতে চায়, আশার হাতছানিতে বারবার শ্রেয়র প্রতি অগ্রসর হতে সচেষ্ট হয়, সুন্দরের জন্যে অনেক পার্থিব বিষয়কে অবহেলা ক'রে বসে? এদের কি হবে! এরা যে বিশ্বাস ক'রে অপরকে টাকা ধার দেয়, বাড়ি ভাড়া দেয়, বই পড়তে দেয়? এরা যে অপরিচিতকেও বিশ্বাস ক'রে বন্ধু বলে মনে করে, সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়? এরা 'বন্ধুর' আন্তরিকতায় বিশ্বাস করে গল্প করে, আড্ডা জমায়, ছেলে-মেয়ের বিয়ে দেয়, ব্যবসায়ে ধার দেয়, নিজের অন্তরের বেদনাকে প্রকাশ করে, বাড়ি-ঘর-সম্পত্তির বিলি ব্যবস্থা করে, এমন কি রাজনৈতিক নেতাকে বিশ্বাস করে ভোটও দেয়! এরা সরল বিশ্বাসে শিক্ষকের কাছে পুত্র-কন্যার শিক্ষা-ভার ন্যস্ত করে, ডাক্তারকে বিশ্বাস ক'রে রোগীকে ওষুধ খাওয়ায়, হাসপাতালে বিশ্বাস ক'রে অসুস্থকে নিয়ে যায়, নেতাকে বিশ্বাস ক'রে চাকরির দরখাস্ত জমা দেয়, মুদি-কে বিশ্বাস ক'রে সঠিক দ্রব্য এবং ওজনে আস্থা রাখে এবং রাষ্ট্র নেতার বক্তৃতা শুনে দুধে-ভাতের ভবিষ্যৎ আর রামরাজত্বের সম্ভাবনাকে উজ্জ্বল দেখে।

এ-সবই যে 'কাঁচের উপর মাইরে দাক্ষিণ' নীতিতে গোড় খাওয়া সে-তথ্য সেই দু'একজনেই জানে। অন্য সকলে জানেও না বোঝেও না। যদিও বা এই শত-সহস্রের সেই জানা-বোঝার সুযোগ ঘটে, (প্রতিনিয়তই ঘটে, সহস্রবারই ঘটে।) তা সত্ত্বেও এদের মনের গভীরে ওত পেতে বসে থাকা সেই শিশুটির কার্টোগ্রাফিক সারল্য-রসের ক্রিয়া প্রতিক্রিয়ায় সেই বোধোদয় দীর্ঘস্থায়ী হয় না। বড়'র মার বড়-মার। কবির ভাষায় ছোট'র মার অবশ্যই ভয়ানক, কিন্তু সে 'ছোট' আমাদের শিশু নয়, মনের মধ্যে সুপ্ত শিশুটি অবশ্যই নয়। এদের ভাগ্যে, আমাদের জন্যে, বড়'র মারটাই রীতিসিদ্ধ।

এই সুপ্ত শিশুটিই যদি যত নষ্টের গোড়া তাহলে চাণক্যনীতি প্রয়োগ করে বাক্তি-বৃক্ষের গোড়ায় চিনি-রূপ ফলিডল ঢাললে কেমন হয়?

মানুষের সংখ্যা সমস্যা ঃ

'যা থাকলে মানুষ মানুষ, না থাকলে মানুষ মানুষ নয় 'তাই মনুষ্যত্ব', বঙ্কিমের এই স্বরূপ নির্দেশ মেনে নিলে মনুষ্য জনসংখ্যার সমস্যা এক নিমেষেই সমাধান হয়ে যাবে। যাবে, কারণ মানুষ হিসেবে আর কয়জন আমাদের মধ্যে স্বীকারযোগ্য টিকে থাকবে? সম্রাটের খাবড় না হয়েও মনুষ্য জনসংখ্যার সমাধান সম্ভব। যে কোনও পিতাকে প্রশ্ন করুন দেখবেন নির্ভেজাল উত্তর বেরিয়ে বেরুবে। ছেলেটা বা ছেলেগুলো মানুষ হল না, মানুষ করতে পারলাম না। যবে থেকে মানুষের মনে মানুষ বিষয়ে মূল্যায়ন সত্যতাভিত্তিক দানা বেঁধে উঠেছে, মানুষ হতে গেলে মনুষ্যত্বের ছিটেফোঁটাও

যে সন্তানেরা অকর্মণ্য, এই বোধ মনে থেকে ব্যক্তিমনে প্রভাব ফেলেছে তবে থেকেই আমাদের সকল পিতৃ-পিতামহেরা ছেলেমেয়েরা যে মানুষ হল না তা টের পেয়ে গেছেন এবং ক্ষোভ প্রকাশ করে চলেছেন। ছেলে মেয়েরা যতদিন তরুণ-যুবক কালের সীমায় আটকা থাকে, থাকতে বাধ্য হয়, জীবনের স্বাভাবিক নিয়মে, ততদিনই তাদের দেহ-মনে পিতৃদত্ত এই অভিজ্ঞানপত্রটি সদাসর্বদাই জোঁকের মতো লেপ্টে থাকে। এক কথায় কোনও সন্তানই পিতা-মাতার দৃষ্টিতে সঠিক মানুষ নয়, মানুষ হল না।

অবিরোধটুকু বস্তুত অন্যের চোখে পড়ে যেতে পারে, কিন্তু কখনই নিজের চোখে, মা-বাবার নিজের চোখে, ধরা পড়ে না। অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহকে মানুষ হিসেবে ধরে নিলে—ধরে নেওয়াই যাক যেমন অংকে-বিজ্ঞানে ধরে নেওয়া হয়ে থাকে,—তার চোখে তস্য-পুত্র 'অমানুষ'। কিন্তু এই 'অমানুষ'-টিই তার সন্তানকে 'মানুষ' করতে পারেন না। নিম্নধাপ 'নরক-অংকের' সিঁড়ি বেয়ে নামতে থাকলে আমরা তো সব অমানুষস্য অমানুষ বলে ধিককৃত হতে বাধ্য। কিন্তু তা হয় না। হয় না কারণ অতীতের মানুষরা, পিতামাতারা, গোটা চব্বিশেক ক্যালেন্ডারের পরিবর্তন ঘটাতে পারলেই 'মানুষের' পর্যায়ে পৌঁছে যেতেন, অথবা, বলা উচিত, অন্যকে নিজের সন্তানদের অমানুষ বলার অধিকার সীমায় প্রবেশ করে যেতেন। এখনও অনেক ক্ষেত্রেই সেই সীমা থাকলেও বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বয়সের সীমাটা আর একটু ও-পারের দিক সরে গেছে এই যা!

অবশ্য কবি কণ্ঠের ধ্বনি নিয়ে 'মানুষ আমরা, নহিত মেষ', বলে, প্রতিবাদ জানাতে পারি, কিন্তু মাতা পিতার মূল্যায়ন-ধারণায় প্রতিবাদের ধাক্কা লাগলে তারা আমাদের মনুষ্যত্বহীনতাকে বিশেষণে বিশেষিত করার অধিকন্তু কারণ খুঁজে পাবেন অবশ্যই। তাই নতশির মেনে নিলে বিশেষণের অনাবশ্যক বোঝার হাত থেকে মুক্তির সম্ভাবনা থাকে। তর্কহীন সত্যকে না জেনেও সব সন্তানরাই line of least resistance-কে ছোট বেলা থেকেই দু হাতে আঁকড়ে থাকে। এখানেও সেই অবিরোধ। সন্তান যদি ব্যক্তিত্বের প্রতিফলন শিরদাঁড়ায় ঘটিয়ে ফেলে তাহলে মা-বাবা সেই ঋজুতাকে ধৃষ্টতা বলে মনে করেন, আবার নতশির নম্রতাকে মেরুদণ্ডহীনতা বলে ভাবতে পারেন মনে মনে। তবে ব্যতিক্রম আছে: বাইরে মেরুদণ্ড ঋজু রাখা আর ঘরে বিনত থাকা বোধহয় কাম্য, মাতা পিতার কাছেই কাম্য, মনুষ্যত্বের নিকষ সেক্ষেত্রে সত্যাসত্য নয়, সম্পর্কের ব্যাপার!

বাল্যকালে সব মা-বাবারাই সন্তানদের গাড়ি-ঘোড়া চড়ার সহজতম পথটি যেমন ধরিয়ে দেন তেমনি আরও শত-শত হিতোপদেশ দিতে দিতে কর্ণের প্রদাহ করেন যার অধিকাংশই বড় হতে হতে সন্তানরা 'কেতাবী' আখ্যা দিয়ে জীবনের ড্রয়ারে স্থানান্তরিত করে রাখে। ফেলে দেয় বলা যাবে না কারণ, সেই সব উপদেশের প্রতিটি এবং সংযোজনসহ আরও কিছু কিছু, সময় হলেই, স্ব স্ব সন্তানদের কর্ণে প্রবিষ্ট করাতে সকাল সন্ধ্যা হিতোপদেশের স্তবগান করে থাকেন। Tradition সমানেই চলে, এবং সুশিক্ষিত তোতার মতো প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে সেই সু-শিক্ষার পাঁচালি বহমান থাকে।

একপুরুষ থেকে অন্য পুরুষের প্রবাহ থাকায় অবিরোধ ধরা পড়ার সুযোগ ঘটে না। আসলে প্রত্যেক মা-বাবা যা চান ছেলে মেয়েরা তা হতে পারে না। হতে পারে না তার অন্যান্য কারণের মধ্যে প্রধান কারণই হল এই যে মা-বাবা কি চান তাই তাদের মনের মধ্যে বেশ পরিষ্কার উপলব্ধ নয়। যা তাঁরা চান না সেগুলোই যেন চোখে খোঁচা দিতে থাকে আর তাই মনে কষ্ট বোধ গজিয়ে ওঠে: মানুষ

হয় না।

দ্বিতীয় প্রধান কারণ হল এই যে সব ঠাকুমার কাছে যখনই বাবারা by-implication আপন মানুষ-বোধে নিজের সন্তানকে মানুষ করে তুলতে গিয়ে সন্তানের মনে প্রতিচিহ্ন তৈরি করে দিতে পারেন। এখানে মহাজনদের কথা বাদ দিয়ে পড়তে হবে, ব্যতিক্রম হিসেবে।

Ration-এর দোকান-পদ্ধতিতে মানুষ তো সংখ্যা সমস্যায় জর্জর, rational বন্টন পদ্ধতিতেও সংখ্যা সমস্যা হাতে-গোনা যায় মতো। অর্থাৎ সমস্যা বিপরীত, সংখ্যাধিক্যের এবং সংখ্যাল্পতার। এই দ্বিবিধ সমস্যার চক্র-ব্যূহে মানুষ আর মনুষ্যত্ব সমান আটকে গেছে!

ঘর চাই ঃ

মহাশয়ার পূজা প্রভাতে আকাশে বাতাসে যে 'দেহি! দেহি!' ধ্বনিটি আকুতি হয়ে অনুরণিত হয়, বিশ্বচরাচরে উন্মাদিকরণের মতো ছড়িয়ে পড়ে, সেই বিদ্যাং দেহি, ধনং দেহি, সুখং দেহি-সমূহ প্রসঙ্গে আমাদের সকলের মনের গভীর থেকেই শত-সহস্র চাই-চাই-এর উৎসারণ-উচ্চারণ। ভূমিষ্ঠ হওয়ার অনুক্ষণের সক্রন্দন চাই-চাই দিয়ে আমাদের যে যাত্রা শুরু সেই যাত্রাই সমাপ্ত হয় নিরুচ্চার হা-মুখ-প্রসারী প্রয়াণকালের ম্রিয়মান চাহিদায়। শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাই শত-এক 'চাই'-এর পিছু তাড়া করে ফেরা আমাদের বিধিলিপি। এটা চাই, ওটা চাই, সেটা চাই করে করে চাওয়াটাকেই একসময়ে মোক্ষ করে বসি। চাই-এর হা-মুখটি ঠিকই খোলা থাকে, চাওয়ার বিষয়টা শুধু পাল্টে পাল্টে যায়। একমাত্র ব্যতিক্রম ঘর-চাই-এর বেলায়। সকলেই আমরা ঘর চাই। স্থানকালপাত্র পাল্টে যায়, ঘরের অর্থ পাল্টায় কিন্তু ঘর-চাই-এর ধ্বনিটি একই থেকে যায়।

ছোটবেলায় মা-বাবার সঙ্গে যেখানেই যাই না কেন বারে বারেই বলে উঠি 'মা ঘরে চল'। মাঠে-ঘাটে, আত্মীয়-স্বজন-গৃহে, চিড়িয়াখানা-বনভোজনে যেখানেই যাবে সেখানেই 'অশান্তি, দু-দণ্ড বসার উপায় নেই'। কেন? না সেই 'মা, বাড়ি চল, ঘরে চল!' ছেলেপুলে নিয়ে ঘরসংসার করতে গিয়ে সকলেরই তো এই অ-সামাজিক বিপদ ঘণ্টা-দুঘণ্টা পার করতে দেয় না। শিশুদের ঘর চাই। ঘর ওদের কাছে অবশ্যই মাকে একা একা করে পাওয়ার নাম, নৈকট্যের উষ্ণতাকে আঁচলে-মুখ গুঁজে সর্বদেহে নিঃসপত্ন উপভোগের অনুভব। তাই ওরা গৃহ নয় ঘর চায়, মাকে চায়।

তার পরেই তো ওরা এক্কা-দোক্কার ঘর চায়, ঘর বানায়, ঘর দখল করে। লাফিয়ে লাফিয়ে নৃত্যের ভঙ্গিতে এই চাওয়াগুলো প্রকাশ পায়। বাল্যের এই ঘর চাওয়াও কোন গৃহ-চাওয়া নয়, জয়কে অনুভব করা, সত্য করে হিসেব কষা যায়।

যৌবন সোজাসুজিই ঘর চায়, ঘরের জন্য উতলা হয়। এই ঘর খোঁজাটা প্রাণিজগতের নিরন্তর ধারায় বিস্ময় ঘটে চলেছে। কেউ মাটির তলায় গর্ত করে ঘর চায়, কেউ গাছের কোটরে-ডালে-পাতায়, কেউ পাহাড়ের গর্তে-গুহায়-কন্দরে। মোট কথা ঘর চাই সকল যৌবনেরই। আর সকলেই নিজের পরিশ্রমে সকল সংগ্রহকে একটাই করে নিজ-নিজ ঘর-চাওয়াটাকে একান্ত করে তোলে। একান্ত করে একাকিত্বের আড়ালও খোঁজে। এই ঘর চাওয়া কোন গৃহ নয়, ঘর নয়, এই

চাওয়ার মধ্যে উচ্চ-বর্গের স-উদ্যম বৈঠ-নৈকট্যের তন্ময় হওয়ার বাসনাটি মনোময় হয়ে উঠতে চায়। গৃহ নয়, গৃহ-কোণ, ঘর নয় ঘর বসানোর আকাঙ্ক্ষা, নিরুদ্বেগ নয় উদ্বেগ-মুক্তি নির্ভেজাল একান্তেই এই সময়ের ঘর চাই-এর মূল চেতনা। ঘর এখন চাই, এবং অবশ্যই চাই। এই উত্তাল চাওয়ার প্লাবনে যদি ঝড় ওঠে, ঘর ভাঙে, বিচ্ছিন্নতা ঘটে তবুও ঘর চাই, চাইই চাই।

এই ঘরের চেতনার টানে ঘরের মধ্যে ঘরের জন্ম ঘটে। যৌথ পরিবারের পটভূমিতে ঘরের-মধ্যে-ঘরের সহাবস্থানের ব্যবস্থা ছিল, এখন একক ঘরের চাহিদা-সর্বস্বতার ফলস্বরূপ অসহাবস্থানের অনুভব প্রায় সর্বক্ষেত্রেই সামাজিক সত্য। এই ঘর চাওয়া কোনও ধর্মীয়-বিধান বরণ ডালার অভিমুখে সমর্পণ নয়, marriage registrar-এর dotted line-এ সই-সাবুদ করা। যেখানে পুরোহিতের কাটি করা শাস্ত্রের সদম্ভ-আহ্বান আর microphone-এ ধ্বনিত সানাই-এর সুর অভিনন্দন উচ্চারিত সেখানেও ঘর চাই-এর উন্মাদনা দু'চার দিন-মাস-বছরের হিসেবে বাঁধা। সূর্য আমাদের জীবনে পূর্বে উদিত কিন্তু জীবন আমাদের পশ্চিমে দৃষ্টি-নিবদ্ধ। তাই ঘর চাই-এর ঊষা-বোধ এবং প্রভাত-দৃষ্টি ত্যাগ করে আমরা পশ্চিম-বোধ আর সন্ধ্যা-দৃষ্টিতে মশগুল হয়ে আছি। যৌবনের 'ঘর চাই' তাই এখন flat-চাইতে স্থির হয়ে গেছে। আর এই গেছে বলেই আজ চারদিকে flat-এর হাহাকার, Promoter দের রবরবা, জমির মালিকদের কপালে-করাঘাত-কিন্তু-পকেটে ঝনঝনাৎ!

কিন্তু জীবনের বিপ্রহর কেটে গেলে সব বয়স্কদেরই যে 'ঘর চাই ঘর চাই' বলে প্রাণপাত সে তো ঘরের জন্যে নয় 'গৃহের' তাগিদে। সারাজীবন গৃহ-হীন থেকে, চাকরি-ব্যবসায়-পেশাদারিতে ছুটোছুটি করে করে, শেষ বেলায় গৃহের টানটুকু যেন সকলকেই পীড়ন করে। অবসর জীবনে গৃহ-হীন অবস্থান সুখদও নয় স্বস্তিরও নয়। তাই চলে গৃহের অন্বেষণ। একটুখানি সবুজ, একটু রোদ ঝলমল বারান্দা, জল-না-চোঁয়ানো এক টুকরো ছাদ, দু'চারটে ফুটন্ত ফুল, দু'টো পাখির সকাল সন্ধ্যা চিক্ মধুর শিস্, অনাদৃত প্রতিবেশীর সদাবাহার নৈকট্য আর ছেলে পুলে, নাতি-নাতনীদের আদর-সোহাগ! নিকষিত অবসর জীবনের সম্ভাব্য সরস উৎসটি যে গৃহ, গৃহ-কোণ, গৃহকোণের নৈকট্য, তাই যেন 'ঘর চাই' বোধের মূল।

এই সময়ে বয়স্কদের অন্য এক রকমের 'ঘর-চাই'-এ পেয়ে বসে। শুধুই ঘর নয়, ঘরের সঙ্গে একটি বর-ও চাই। কন্যা থাকলেই ঘর-বরের চাহিদায় দিনের বিশ্রাম চলে যায় বন্ধু-বান্ধবের কাছে অনুনয়-বিনয়ে আর রাতের ঘুম ছুটে যায় খবরের কাগজে বিজ্ঞাপনের চিঠিপত্রের বিচার-বিশ্লেষণে। নিজের জন্য যেমন ঘর চাই, গৃহকোণ চাই কন্যার জন্যেও তেমনি ঘর চাই, বর চাই তাড়া করে ফেরে।

এবং এ-বারে যখন হাঁটুতে বাতের আক্রমণ আর কোমরে 'সাইটিকার' বাধাকে পাকাপাকি ঘর বাঁধতে দিয়ে 'ভেঁমাথা' জীবনের শুরু করি তখন হঠাৎই দেখতে পাই যে সে-ঘর এতো দিনে তৈরি করে তুলেছি তা আসলে একটি তাসের ঘর। ছেলে মেয়েরা মিলে সেই ঘরের অন্তর্জলির ব্যবস্থা করে ফেলেছে। ঘরে বরে পাঠানো মেয়ের ঘরের বর্তমান অবস্থাও তার ফেলে আসা পুতুল ঘরের মতোই ছত্রখান, ভঙ্গুর অবস্থায় পৌঁছে গেছে।

অনেকেই আমরা এই অবস্থায় গৃহ-ত্যাগ করি। পরিজনেরা তখন আমাদের 'হতচ্ছাড়া' দোষ দেয়, আত্মজরাও অনুরূপ প্রত্যাশনেত্রে দেখেন। অনেকে গৃহ-হারা জীবন যাপন করি গৃহের মধ্যে

থেকেও। আপনজনেরা তখন আমাদের নড়ি-গর্দভ-প্রাপ্ত অবস্থা ঘোষণা করে, 'তুমি চুপ কর!' ব'লে নিদান হাঁকে। তখন বুঝে পাই না দীর্ঘ চেষ্টা আর আজীবন সাধনার উপসংহারে যে ঘরটিকে গৃহ বলে মনে করেছি তা আসলে গৃহবাস না বৃক্ষতল-পথপ্রান্ত!

এবং তখন মনে হয় আসল গৃহ বলে যদি কিছু থাকে তাহলে সে অবশ্যই অন্য কোথায় অন্য কোনও খানে। যে গৃহ ছেড়ে আমরা সকলেই একদিন এই জীবনের যাত্রাপথের প্রথম স্টেশনটিকে মাতৃগর্ভের অভ্যন্তরে খুঁজে পেয়েছিলাম, সেই গৃহই বোধহয় শ্মশান-ঘাটের শেষ স্টেশন হয়ে পড়বো চলে গেছে, অজানা- অচেনা কোন্ নিরুদ্দেশের পথে।

সারা জীবনই ঘর চাই ঘর চাই করে ঘরকে হারাই। আর হারাতে হারাতেই একদিন স্বঘরে নিজের ঘরের সন্ধান পাই। এটাই কি বিধিলিপি? এটাই কি জীবন বিধি?

কানকথা—পাঁচ কথা:

ছোটবেলায় শুনেছি দেশে নই নেতে (দলে, group-এ, company-তে), বউ নই ঘাটে আর ছেলে নই মাঠে (সেই দলে ইত্যাদি)। অত কথা তখন বুঝেছি বলতে পারি না। আর এখন গ্রামবাংলায় 'দেশ'-ঘাট-মাঠ থাকলেও শহরে অন্তত ঘাটের দৃশ্যই অভাব। জল তোলা, থালা বাসন মাজা, কাপড় কাচা এবং স্নান করা এখন ঘরের দেয়ালঘেরা ঘাটে থাকে। তাই ঘাট এখন ঘরের মধ্যে এসে 'ঝি-কাজের-লোক'-এর ধারায় প্রয়োজন-পূরণ করে চলেছে।

আল-কথা পাল-কথা, গল্পগাছা অলস সময়ের কথা। কিন্তু ক্রমচলমান জীবনে, চীনাস-মাছের মতো এক-বা-দু-কামরার গাঁড়-বাঁধা আবাসে বাইরের জীবন — ঘাটের কলতান-জীবন— ঝি-চাকরের সেতো ভর বেয়েই প্রবেশের পথ পায়। সেই জলের স্রোতটি যে ঝরনার মতো পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হবে তা নয়, 'ভগীরথ'-দের মনের গোঁয়ার পাঁক-পানা-শ্যাওলার কেচ্ছা-কাহিনী-কেলেঙ্কারির আগমন ঘাটে অনিবার্য। সেই সব বিষ ভাষার সঙ্গে আন-নুন-মশলা মেশে হাতের ভঙ্গিতে, চোখের ইঙ্গিতে আর কণ্ঠের ফিস-ফিস sub-vocal উচ্চারণে। বাড়ির বৌ-ঝি-গিন্নীরা এই বেনোজলের আকর্ষণে বিবশ বোধ করেন, নেশাগ্রস্ত হয়ে পড়েন এবং অনাবশ্যক নোংরা-জলের প্রবাহে চিত্তকে কলুষিত করে ফেলেন।

এই পাঁচকথা-কানকথায় পাড়া-প্রতিবেশীদের বিষয়ে বহুতর তথ্য এবং অগাধ জ্ঞান সংগ্রহ হয়। তথ্য ও জ্ঞান না কেচ্ছা ও অজ্ঞান তা কে জানবে? তাছাড়া এ-বাড়ির বৌ-ঝি-রা কখনও কি নিশ্চিত হতে পারেন যে ও বাড়ির ওদের কথা যখন গল্প করে এ-বাড়িতে চালান হয় তখন এ-বাড়ির কথাও সে বাড়িতে উপুর করা হচ্ছে না? Communication gap মানুষের জীবনে যতখানি ক্ষতি করতে পারে—যদি ক্ষতি করতেই পারে—তার চাইতে সহস্রগুণ বেশি ক্ষতি—'যদি' নেই এখানে—এই সব অনাকাঙ্ক্ষিত-মাধ্যম communicator-রা করে থাকেন। কলকারখানার বর্জ্য পদার্থ যেমন অনিবার্য by-product, এবং সেই effluents যেমন fluently জলে-স্থলে-আকাশে বিষ ছড়ায়, pollute করে, সমাজের মধ্যকার প্রতিবেশী মনের যাবতীয় বর্জ্য-পদার্থ - cathartic effluents - এই সব 'ঠিকে-মন' মাধ্যম ক'রে এ বাড়ি - ও বাড়িতে নালা-প্রবাহ ঘটায়, pollute করে।

Pollutants সমূহকে re-cycling করার বৈজ্ঞানিক ব্যবস্থা আছে। বৈজ্ঞানিক বলেই তা অব্যবহার্য থেকে ব্যবহার্যের জন্ম দেয়। সমাজ-মানসের pollutants re-cycled হয়, কিন্তু বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে নয়, উদ্দেশ্যের motivation-এ। এবং তাই সেখানে ঘোলা জলের আবর্ত পাঁককে আরও পঙ্কিল করে তোলে, দূষিতকে অধিকতর দূষণাক্রান্ত করে দেয়। কাজলী (শরৎচন্দ্রের) ধোঁয়ার কুণ্ডলীকে ঘুরে ঘুরে আকাশের দিকে উঠে যেতে দেখে তার নিজের মনের ভাবনা দিয়ে এক রকম করে অর্থারোপ করে নিয়েছিল। মনের মধ্যে ঈর্ষা-দ্বেষ-অপকারইচ্ছার ধোঁয়া-কুণ্ডলীগুলো ঘুরে ঘুরে একমন থেকে অন্যমনে পৌঁছায়, আকাশ পায় না। দৃষ্টিকে এরা আচ্ছন্ন করে রাখে তাই দৃষ্টি-বিভ্রম ঘটে, কর্ণকে এরা পাতলা করে তোলে তাই পরনিন্দাও মধুর বলে মনে হয়। এই দূষণ তাই men-o-sphere থেকে ঊর্ধ্বাকাশে গতি পায় না, মনো-sphere এই দূষণকে দুষ্টতর করে যায়!

আর মালিন্য যখন একবার মনের গভীরে উপ্ত হয়ে যায় তখন সেই মনোমালিন্য যাবতীয় ব্যক্তিগত অন্তরে, গার্হস্থ্য প্রত্যেক আর সামাজিক মূল্যায়নে refraction ঘটাতে থাকে। স্বচ্ছ-দৃষ্টি মার খায়, সত্য-দৃষ্টি বনবাসে যায়। জীবন থেকে সহজ হারিয়ে যায়, পরিবারের মিলন কোঠাটি মলিনতায় ভরে ওঠে, সমাজের সংহতিতে হত্যাকারীর কৃপাণ অকৃপণ ঝলসে ওঠে।

বিচারকের দৃষ্টিকে সমদৃষ্টি করার জন্যে কালো পট্টির আড়াল টানা হয়ে থাকে। প্রতীক। যেন চোখ খোলা থাকলে সম-দৃষ্টি হবার সম্ভাবনাই থাকে না! এ বড় অন্যায়, ন্যায়ের মূর্তিতে এহেন অন্যায় প্রতীক কেন আরোপ করা হল কে জানে? এ-তো সম-দৃষ্টির নয় সম-অদৃষ্টির, অন্ধকারের, প্রতীক মাত্র। cupid কে blind করে paint করায় এমন অন্যায় ঘটে না, প্রেমের দৃষ্টি চক্ষু-কোটরে অবস্থান করে না, অন্তরের গভীরে তার আলোর উৎসটি দ্যুতিময় থাকে। বিচারকের কান খোলা কেন? উভয় পক্ষের বক্তব্য সম-মূল্যে গ্রহণ করার জন্যে? খুনীরও কিছু বক্তব্য থাকে, তাই? উকিল-ব্যারিস্টারদের যাবতীয় সত্য-মিথ্যার polluted আপকথা-পাপকথা-আইনকথাকে বিচারক নিয়ম-আইন-বিধানের ছাকনিতে filter করে নিতে যাবেন কেন? একটা ইন্দ্রিয়ের প্রতি অবিশ্বাস, দৃষ্টির প্রতি, আর অন্য একটির প্রতি আত্যন্তিক বিশ্বাসের কারণ?

যদি মেনে নিতেই হয় তাহলে ব্যক্তি জীবনে, পরিবার জীবনে এবং সমাজ-জীবনে এমন একটা ছাকনির ব্যবস্থা করলেই তো হয়। সেই ছাকনিটা কি? বিধি-বিধানের লেখাজোখা দিয়ে এই ক্ষেত্রে ছাকনি বানানো অসম্ভব। তা হলে? রুচি-বোধ কেমন হয়? অতীতের জানা চেনার মূল্যায়নকে কুলোর বাতাস না দিয়ে আঁচলে বাঁধলে কেমন হয়? আমি-তুমির উত্তম-মধ্যম সম্পর্কের মধ্যে তৃৎ-পুরুষের Third Person-কে প্রবেশের Pass-Port-visa না দিলেই তো অনেক কঠিন সহজ হয়ে যেতে পারে। Pollution বন্ধ করতে সর্বোত্তম পন্থাই তো Pollution ঘটতে না দেওয়া।

জন্মভূত ঃ

আগে একদিন আমাদের 'আমি'-কে নিয়ে সমস্যার কথা বলেছি। সেই আমাদের আমি

আমাদের আদরেরও বটে ভয়েরও বটে। কিন্তু 'আমি'-র যে ভয় তার চেয়েও ভয় 'ভয়ের ভয়'। আমরা সকলেই কম বেশি ভিতু। ছোট বেলায় রাক্ষস খোক্কসের, দৈত্য-দানোর, ভূত-প্রেতের ভয় আমাদের মজ্জায় ঢুকে যায় সেই ভয় আর সারাজীবনে তাড়াতে পারি না। অস্তিত্বের গভীর গোপনে সেই ভয়-ভাবনা যেন একেবারেই লেপ্টে যায়। মনে হয় ভবিষ্যৎ জীবনের হাজারো ভয়ের যে ঝাড়ে-বংশে সমৃদ্ধি তা সেই বাল্যের বীজের কেরামতি।

প্রাণিজগতে সব চাইতে দুর্বল বলতে মানুষকেই বোঝায়। সে শরীরেও দুর্বল, মনেও দুর্বল। তাইতো সে সব চাইতে হিংস্র, মনে মনে। Law of Compensation. সব দুর্বলতাই দুর্বলতাকে ঢাকতে অধিক হিংস্রতার আশ্রয় নেয়। প্রাণিজগতেও আছে, মানুষের সমাজে সর্বাধিক। ঘাটতি-পূরণের নীতিতে পড়ে পাওয়া মনকে সে সংগ্রামে, টিকে থাকার সংগ্রামে, যথাসম্ভব কাজে লাগায়। এতে দোষের কিছুই নেই কারণ বেঁচে-বর্তে থাকার অধিকার সকলেরই সমান।

কিন্তু দোষের হয় তখনই যখন অপ্রয়োজনেই সে সেই হিংস্রতাকে সংসারের মধ্যে অকারণে টেনে আনে। অবশ্য একেবারে অকারণে নয়, কারণ অকারণে তো এই বিশ্বে কোন কিছুই ঘটে না, ঘটতে পারে না। ভয়ের কারণে। ভূতের ভয়ের জন্যে যেমন একটা আস্ত ভূতের আদৌ প্রয়োজন পড়ে না, ভাবনায় ভূতের সম্ভাবনা থাকলেই যথেষ্ট হয়, তেমনি গৃহে-পরিবারে প্রকৃত ভয় আদৌ জরুরী নয়, তবে নিশ্চই মনে যে ভয় একটা সামনে ওত পেতে বসে আছে। এবং তাহলেই অর্সান্দিগ্ধ হিংস্রতা প্রকাশ বৈধ হয়ে গেল।

ছেলে পড়াশুনা করছে না? আড্ডায় সময় নষ্ট করছে? বাগান তোলা, ঘুম ভাঙানো অথবা হঠাৎ প্রয়োজনে চা-চিনি-মুড়ি যেতে চায় না? অবশ্যই অন্য ছেলের সঙ্গে মিশে নষ্ট হচ্ছে! দলের ভূত ওর ঘাড়ে চেপেছে। লাগাও ধমক, চালাও চাবুক, দৃঢ় হাতে ধর শাসনের দণ্ড! মেয়ে আনচান করছে? কলেজ যেতে নদীর ধারে যাচ্ছে? Class room এর চার দেওয়ালের চাইতে উন্মুক্ত আকাশ বীথিকের বেশি মন টানছে, Notes লেখার বদলে রঙিন কাগজে গোটা গোটা শব্দ সাজাচ্ছে? তাহলে তো কোনো বাউণ্ডুলে ভূতের খপ্পরে পড়েছে। ভবিষ্যৎ ঝরঝরে হবার আগেই তাকে নজর বন্দি করে রাখ। কলেজ ছাড়িয়ে দাও, রান্নাঘরের দড়ি-দড়া-হাতা-খুন্তিতে তার উদ্বৃত্ত সময়কে বেঁধে ফেল, চাই কি পত্রিকায় বিজ্ঞাপন ছেড়ে দাও। ঘাড় থেকে নামাতে পারলে সম্ভাব্য ভূত অপরের ঘাড়কেই খুঁজে নেবে!

প্রতিনিয়ত আমরা নিজ নিজ ঘাড়ে হাত বুলোই আর পরখ করি ভয়ের ভূত কোনও ফাঁকে আমাদের ঘাড়-টি না মটকাতে পারে! ছেলের চাল চলন পছন্দ নয়? চাকরি-বাকরি করছে কিন্তু সংসারে যথাযোগ্য হাত-উপুড় করছে না? বেশি রাতে ফেরে পায়ে গন্ধদ্রব্যের খোসবা বয়ে? চটপট চিরিতির করে পাড়াতেলর মেরাটোপে সানাই-এর সুরে তার ঘাড়ে জীবনসাথী চাপিয়ে দাও। তখন হারানোর ভয় থেকে বাঁচা গেলেও ছেলে যে ঘরে ফিরল তা জানা গেল কি? তাই দু-চার দিন যেতে না যেতেই আবার ভয়, সেই হারানোর ভয়। যাকে সাথী বলে জুড়ে দেওয়া হল সেই অভিতীয়া যে ঘাড়ে চেপে বসল না তার স্থিরতা কোথায়? এ-বারে আর ঘাড় মটকানো ভূত নয়, হতে পারে একেবারে রক্ত-চোষা ভূত! আর ছেলে তখন দীর্ঘ ইতিহাস বিজড়িত পুরানো মা-বাবার বদলে একজোড়া নোতুন, আনকোরা নোতুন, সদাহাস্যময়-মধু প্রিয়ভাষী-ভাষিণী বাবা-মা পেয়ে অতীতের ভূত ছেড়ে ভবিষ্যের দিকে আহ্বান-প্রবণ ঝুঁকবে না তার ঠিক আছে কি? তখন? তখন ওঝা-বৈদ্য

পাওয়া যাবে কোথায়?

মেয়ে ঘরে যতদিন ছিল ততদিন তার মনের সুখ ছিল না। আপনি সর্বস্বান্ত-প্রায় হয়ে তাকে নোতুন ঠিকানায় ব্যবস্থা করে দিলেন কিন্তু দুশ্চিন্তার ভূতটি সদাসর্বদার জন্যে কব্জায় করে দিবস রজনী কি হয় - কি হয় করে কাটাচ্ছেন। কাটাচ্ছেন নয়, কাটাতে বাধ্য হচ্ছেন। মেয়ের চিন্তা-চেতনা-অনুভবের অতীত-ভূতটি নোতুন সংসারে মানিয়ে নিতে পারল কিনা, বৈবাহিক মহাশয় যে সকল ইচ্ছা পুত্র-মাধ্যমে পূরণ করতে মনস্থ করে রেখেছিলেন সে সকল মনস্কামনা তার মন ছেড়ে ক্রমশই আপনার কন্যার হাত ধরে আপনার ঘাড়ে চাপছে কিনা, জামাতা বাবাজীবনের অতীত ভূত আর বর্তমানের স্বভাব গোমড়া-মুখ ভূত হয়ে আপনাদের শয়নে-স্বপনে ভয় দেখাবে কিনা—এ মতো কতো শত ভয় আপনার ঘাড়কেই শাওড়া গাছ ভেবে দীর্ঘ-চেপে বসতে পারে, নট্ নড়ন-চড়ন নট্-কিচ্ছু! অন্য ভাবে স্পনর্ডিলিসিস, আপনি জানেন ওঝা চাই!

সকলের পুত্র-কন্যা থাকে না। এ-সব ভূত তাই তাদের ঘাড়ের জন্যে ঘাপটি মারার সুযোগই পায় না। কিন্তু তাদের জন্যে আছে 'আঁটকুঁড়ি' ভূত, সামাজিক ক্রিয়াকর্মে সামনে না-আসার দাবি নিয়ে 'অভক্ত-অশুচী' ভূত। সে-সব ভূত ঘাড়ের বদলে মনের গভীরে বাসা বেঁধে বসে থাকে, নড়নে-চড়নেই খোঁচা মারে আর রাতের গভীরে বালিশকে লবণাক্ত করে তোলে; ছাড় নেই কারো।

অনেকের ছেলেমেয়েরাই তো বিদেশ-বিভুঁই-এ প্রবাসী জীবন কাটায়। তারা কি মুক্ত? একেবারেই নয়। সেখানে আছে বিলেতি ভূত, সাহেব-মেম ভূত। অনেকে এদের বলেন স্পেশাল ভূত। শাওড়া গাছের ওঁদের বাসা বোঝা যায়। ওঁরা প্রধানতই 'মাছ' চায়, Protein-এর সিংহভাগ থাকে অর্থের বাতিকে। কিন্তু এই সব স্পেশাল ভূত প্রধানত আমিষ-ভোজী—পুত্র-কন্যাদের বেমালুম হজমে ওদের তৃপ্তি। সন্তান ত্যাগ করে হাহুতাশ ছাড়া এ-ভূতের হাত থেকে নিস্তার পাওয়া যায় না।

এতক্ষণ যত ভূতের কথা বললাম তারা সবাই বাইরের ভূত। এদের জন্মস্থান অবশ্যই ভয়ের উর্বরা জমিতে, কিন্তু আক্রমণ লক্ষ্যটি আপনি। কিন্তু সব ভূতের মধ্যে ঘাতক ভূত হল 'মনদ' ভূত, (মন দ্বারা দান কৃত, মনদ) ভূত। মনভূত বলতে পারেন। এ-টি নিজ নিজ মনের গভীরে ভয়ের গর্ভে ভ্রান্ত-প্রত্যক্ষের ঔরসে জন্ম নেয়, অথবা স্নেহে লালিত পালিত হয় এবং সুযোগ পেলেই জীবনের রস-রক্ত-প্রাণবায়ু নিঃশেষে শুষে নেয়। ব্যক্তি মানুষকেই এই ভূতে পেলে ছিবড়ে করে ছাড়ে। বনের ভূতে বড়জোর ঘাড় মটকায়, মনের ভূত প্রাণ-মটকায়, প্রাণ নিংড়ায়, জান পুড়িয়ে কয়লা করে খাক করে ছাড়ে।

ভয়ের জমিতে প্রধান প্রধান ভূত-ফসলের কথাই এতক্ষণ বলা হল। খারিফ এবং অন্যান্য ফসলের মতো হাজারো ভূতের সম্ভাবনা থেকে গেল। তারা জন্মায়, থাকে এবং সময় সুযোগ মতো খোঁচা মারে, বিরক্ত করে এবং খাঁচড়ায় কামড়ায়। ট্রেনে-বাসে, হাটে-বাজারে, অফিসে-দপ্তরে, স্বজন-পরিজন গৃহে, সিনেমা-থিয়েটার হলে এমন কি স্কুল-কলেজে এই সব খারিফ-ভূতেরা সদা সর্বদাই আনাগোনা করে। প্রতিনিয়তই তো তা আমরা টের পাই পায়ের পাতা-মর্দনে, দাম-মাপ-ওজনের কারচুপিতে, করাপশন-নেপোটিজম-এর রমরমায়, পরনিন্দা-পরচর্চায় এবং সহজে কিস্তিমাতের মানসিকতায়। এই সব খারিফ-ভূতের খোঁচা-কামড়ে ওঝা-বৈদ্যের দরকার হয় না এই যা রক্ষে। এদের দাঁতের আর নখের চিহ্ন নিয়েই আমরা বেঁচে থাকি।

সুবিধাবাদী ঃ

হিতোপদেশ আছে কানাকে কানা, পঙ্গুকে পঙ্গু এবং কালাকে কানে কালা বলবে না। এই উপদেশের কারণ সহজেই বোঝা যায়। কোটি কোটি স্বাভাবিক সর্বাঙ্গ মানুষের মধ্যে অঙ্গ-বা-ভাগ্যবিড়ম্বিত কতিপয়কে তাদের বিড়ম্বনার বিষয়টিকে নির্দেশ করলে বেদনাটুকু বাড়ে বই কমে না। সত্য কখন অকারণ অপ্রিয় হলে তা সত্য হলেও অসুন্দর-কথন হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয়ত, যে তথ্য অস্তিত্বের মধ্যে বিজ্ঞাপনের মতো সর্বজন বিদিত এবং যে অকরুণ সত্য ভাগ্য-লাঞ্ছিত সেই সেই আংশিক পঙ্গুত্ব-বাহী ব্যক্তিরা নিজেরা অত্যন্ত মর্মান্তিক ভাবেই জানে, তার উল্লেখ উপরন্তু অতি-কথনের দায়েও দুষ্ট।

কিন্তু মানুষের মধ্যে এমন অনেক দোষ আছে যা বিজ্ঞাপনের মতো চোখের সামনে জলজল করে ভেসে থাকে না, স্বভাবের গভীরে সুপ্ত থাকে। এবং এই সব দোষের মধ্যে কিছু আছে ব্যক্তিগত, কিছু আছে সাধারণ, সকলের মধ্যেই সমান ভাবে উপস্থিত। মাত্রাগত তফাত অবশ্যই থাকতে পারে, থাকেও, প্রকাশের ক্ষেত্রে। কিন্তু গুণগত ভাবে আমরা সকলেই সেই স্বভাবের শরিক, সমানভাবেই। এমন অনেক দোষের মধ্যে সুবিধাবাদী মনোভাব একটি সার্বিক মানব-স্বভাব।

কানাকে কানা বললে সে ব্যথা পায়, সেই-বলাটা অসুন্দর হয় এবং, হিতোপদেশ অনুযায়ী, কুরুচির প্রকাশ বলে মনে করা হয়। অথচ সুবিধাবাদীকে, অর্থাৎ যে কোনও ব্যক্তিকেই, সুবিধাবাদী বললে সে উত্তেজিত হয়, সেই বলাটা মনোবৈজ্ঞানিক হয় এবং সামাজিক মূল্যায়ন অনুযায়ী কোনজনকে কোনজন বলে ঘোষণা করার দায় ঘাড়ে চাপে! কোথাও কি এমন কোন উপদেশ আছে যে স্বার্থপরকে স্বার্থপর, পরনিন্দুককে পরনিন্দুক এবং সুবিধাবাদীকে সুবিধাবাদী বলা উচিত নয়? বলা নেই, কিন্তু আমরা বলি না। কেন? না সেই সুবিধাবাদী মনোভাব! সত্যি কথা বলে নিজের স্বার্থের নষ্ট করাটা মূর্খের কাজ! অর্থাৎ সুবিধা-অসুবিধা বিচার করে তবেই সত্যকথন বিধেয়! তবেই বুঝুন!

হ্যাঁ, ব্যতিক্রম অবশ্যই আছে। অনেকেই আছেন যাঁরা নিজেদের ভাল-মন্দ সুবিধা-অসুবিধা নির্বিচারে যা সত্য বলে মনে করেন তাই অ-কাতরে বলে বসেন। এঁরা যে তা বলতে পারেন তার কারণ এঁদের 'নিজ' বলে স্ব-চেতনাটিই খোয়া গেছে—এঁরা বিভিন্ন স্তরের এবং কারণের পাগল। স্বার্থ নেই বলেই এঁরা আত্মসর্বস্ব হতে পারেন না।

মালিকের অগোচরে তার দ্রব্য অপরের আত্মসাৎ করা চুরি, অপরের অজান্তে বা ধোঁকা দিয়ে ভুল বুঝিয়ে নিজের স্বার্থের হাতিয়ে নেওয়ার নাম সুবিধাবাদ। চৌর্য আইনগত অপরাধ, সুবিধাবাদ সর্বজন-অনুসৃত পদ্ধতি। প্রথমটির প্রতিরোধের জন্যে প্রশাসন আছে, আইন আছে এবং বিচার বিভাগের দায়-দায়িত্ব আছে। দ্বিতীয়টি সদাসর্বদা এবং সর্বত্রই সমানে ঘটে চলেছে বলে আইনও নেই, বিচারের ব্যবস্থাও নেই। যা আছে তা নৈতিকতা, moral sanction. তাই অপরকে বোকা বানাতে পারলে অপরাধ যদি কিছু ঘটেই তাহলে তার দায়ভাগ সেই বোকাতে বর্তায়, 'বুদ্ধিমানে' নয়। আর যদি কখনও কেউ সেই সুবিধাবাদীর দিকে সামাজিক-নৈতিক আঙুল তুলে নাড়কে তাকা

দিতে চায় তাদেরই সমূহ বিপদ। কথকতা-তর্ক-মনোনায়িকা। সুবিধাবাদের প্রকাশের বিরুদ্ধে কোনও exhibit পেশ করার মতো বস্তু থাকে না, যা থাকে তা অনুমান, মানসিক বিশ্লেষণ এবং যুক্তি পরম্পরা। এ সবই অদর্শনিক, এবং non-tangible. উত্তেজনার কারণ এখানেই।

সফল সুবিধাবাদী তত্ত্বের দিক থেকে শংকর বেদান্ত, ব্রহ্ম-ও-মায়াবাদে বিশ্বাসী এবং তথ্যের দিক থেকে চার্বাক বস্তুতান্ত্রিকতায় আস্থাবান। সর্বজনের স্বার্থবিষয়ে মায়াবাদের প্রাধান্য, নিজের সুবিধা বিষয়ে পূর্ণ ব্যক্তিগত সুখবাদী-gross egoistic hedonist. আধ্যাত্মিক সর্বক্ষেত্রে ত্যাগই মুক্তির পথ, আকাঙ্ক্ষাহীন গুরুদৃষ্টিই জীবনের মোক্ষ প্রাপ্তির সম্যক উপায়। অপর দিকে আর্থিক—ব্যক্তিগত স্বার্থ বিষয়ক ক্ষেত্রে সর্ব-সুবিধা-সংগ্রহই সার্থকতার মহাজন যেন গতঃ স পন্থাঃ। এই দ্বিমুখী জীবনদর্শনই সুবিধাবাদের মূল প্রকৃতি।

আপন আপন পর পর, যে না বোঝে সে বর্বর! এটা মূল প্রত্যয়। এই আপন বোধ আমাদের শিশুকাল থেকেই প্রত্যেককে নিজ নিজ cocoon-এর মধ্যে, গুটি পোকার গুটির মধ্যে, মহাসুখে ঢুকিয়ে রেখেছে। নিস্তার নেই, বাঁচোয়া নেই, পরিত্রাণ নেই। এই আমাদের স্বার্থকেন্দ্রিক জাতের অধিকারের পরম দান, পরার্থকেন্দ্রিক মানবীয় মূল্যবোধের উন্নত-সভ্য চেতনার কাছে তাই সুবিধাবাদ বিকৃত, ঘৃণিত, নিন্দিত। এই বিকৃতির গুটি-টি যতক্ষণ নিজের কাছে নিজের মধ্যে থাকে ততক্ষণ সর্বাংশে তাকেও সহ্য করা যায়, অপরে যখন আভাস পায় তখনই উত্তেজনা, বিপন্নবোধ এবং প্রতি আক্রমণ থেকে বাইরে বেরিয়ে আসে।

এই সুবিধাবাদের প্রয়োজন সর্বত্র প্রসারী। এমন কি সন্তান বিষয়ে মায়ের মনেও এই সুবিধাবাদের প্রয়োজন স্থান পায়! (উত্তেজনার কারণ নেই, বিচারের অবকাশ আছে!) প্রথম, দ্বিতীয় তৃতীয় সন্তান-ক্রম মায়ের স্নেহ-প্রস্রবণের উপর বিশেষ ঘটায়, পুত্র-সন্তান কন্যা-সন্তান তাঁর মনে বিভেদ-বৈচিত্র্যতার দৃষ্টিভঙ্গি সৃষ্টি করে না কি? চোখ-কান খোলা থাকলে সকলেই প্রত্যয় যাবেন। আর একবার যদি মাতা-সন্তানের মতো পবিত্র সম্পর্কের বেলায় সুবিধাবাদের দেখা মেলে তাহলে অন্য-পরে আর কিই বা বলার থাকে।

তবে শঙ্কিত হবার মতো কারণ বোধহয় নেই। Pessimism অনিবার্য নয়! মনোবিজ্ঞানীরা বলেন যে আমরা সকলেই কম-বেশি 'পাগল', abnormal. সেই মনোবিকলনের মাত্রা বেশির ভাগের বেলায় এতই কম যে তা নিয়ে ভাবনার কারণ থাকলেও দুর্ভাবনার হেতু নেই। রোগ-বালাই তো আমাদের নিত্যনৈমিত্তিক ব্যাপার, কিন্তু তার মাত্রা এতোই ডাক্তার-বৈদ্য নির্দেশিত মাত্রার নিচে যে কমবেশি হুঁশিয়ার হলেই হবে, হাসপাতাল পর্যন্ত পৌঁছাতে হয় না। তবে সব ক্ষেত্রেই যেখানে মাত্রা বেশ বাড়াবাড়ি, সেখানে মনোবিজ্ঞানীর আর হাসপাতালের সাহায্য নেওয়া দরকার বৈকি!

সুবিধাবাদকে সীমার মধ্যে সসীম রাখলে মহামারি ঘটবে না, সীমার মাঝে অসীম হয়ে দেখা দিলেই সর্বনাশ। তবু জীবনের ভীম দ্রোণ কৃপাচার্য থেকে শুরু করে সরকারের মহামন্ত্রী মহামাত্য মহাকেরানি হয়ে মহাজনের আর শিল্পপতিদের হাতে ঘুরে ঘুরে এই সর্বনাশ যখন আপামর জনসাধারণের ঘরের দাওয়ায় আর রাস্তাঘাটের হাওয়ায় ছড়িয়ে যায় তখনই মহাবিপর্যয় ঘটে যাবার সম্ভাবনা। ফিরে সংশোধনের জন্য ঘণ্টা বাঁধা হবে কোথায়? ইলেকশনের গলায়? কমিশনের কোমরে? ব্যুরোর বক্ষে না ভোটারদের ঠ্যাং-এ?

জন-পরিবার ও স্ব-জন পরিবার ঃ

আমরা সকলেই নিজ নিজ পরিবারে বাস করি। এই পরিবার প্রধানত দুই রকমের। নিজেকে কেন্দ্র করে, অথবা অপরকে কেন্দ্র করে দু-পাঁচজনের পরিবার। সম্পর্কের বাঁধন এই পরিবারের মূল সূত্র। আর এক পরিবার নিয়েও আমরা ঘর করি। সেই পরিবারে প্রধানত থাকে আমাদের অতীতের অনুশোচনা, বর্তমানের উৎকণ্ঠা আর ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা। একে বলতে পারি ব্যক্তির মধ্যে ব্যক্তির স্ব-পরিবার। স্ত্রী-পুত্র-কন্যার মতো এই প্রধানরা—অনুশোচনা, উৎকণ্ঠা, দুশ্চিন্তারা আসর জাঁকিয়ে বসে থাকলেও আমাদের স্ব স্ব স্ব-পরিবারে আরও অনেক 'আত্মীয়-স্বজন' আছেন যাঁরা কোন অংশে প্রাধান্যে কম যান না তবে তফাত এই যে ভাবনা-চিন্তা, ধ্যান-ধারণা, নীতিবোধ-মূল্যবোধ, আশা-আকাঙ্খা, কর্তব্য-অকর্তব্যবোধের শরনার্থীরা মাঝে মাঝে কম-বেশি দেখা-সাক্ষাৎ করেন এবং পরিবারের মধ্যে—মনের মধ্যে—সুখ-দুঃখ, আনন্দ-পীড়ন, উদ্বেজনা-বিমর্ষতা তৈরি করে নিজ নিজ কর্তব্য সম্পাদন করে সরে পড়েন। সরে পড়েন বটে কিন্তু যা রেখে যান তা কম নয়! রেখে যান কিছু কিছু অনুশোচনার কারণ, কতিপয় উৎকণ্ঠিত মুহূর্ত এবং অনেক অনেক দুশ্চিন্তার ভার। আয়তনে পরিবারের ভার বাড়ে, মস্তিষ্কের প্রসার ঘটে আর মানসিক চাপ বেড়ে বেড়ে পাহাড় তৈরি হয়ে ওঠে। এই পরিবারে একাকিত্বই প্রধান অনুভব, বিচ্ছিন্নতাবোধই একমাত্র উপলব্ধি।

জীবনের সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত বহুসম্পর্ক-সূত্র জনবহুল-পরিবারে থেকে থেকে, কাজ করে করে, অপরের প্রতি দায়বদ্ধতার সমাধান করতে করতে আমাদের বেলা যায়। বেলা যায় তার কারণ বেলা কারো মুখ চেয়ে বসে থাকে না, বেলা যায় কারণ পরিবারের মধ্যকার কচিকাঁচারা তাদের মনের নীড় আর প্রাণের সবুজকে খুঁজে পায়। তারাও তখন পরিবারের মধ্যে পরিবার হয়ে প্রভাতের সূর্যকে দ্বিপ্রহরের দিকে টেনে নিয়ে যায়। তাই আমাদের দুপুর বিকেলের বেলা পেতে থাকে।

এই অবেলায় চলনে আমাদের ভাণ্ডারটিও পূর্ণ হতে থাকে। অতীত জমা হয়ে শূন্য বোধগুলোকে সাজাতে সাজাতে, কি পেয়েছি তার চাইতে কি পাই নি তার প্রত্যাশাগুলো স্মৃতিকে পীড়ন করতে থাকে, যা যা করার কথা ছিল কিন্তু করা হয়ে ওঠে নি তারা সব দিবস-দৃষ্টি হয়ে রাতের ঘুম কেড়ে নেয়। অনুভাবনা-অনুশোচনার জীবন্ত মুখের স্বাদকে তিক্ত করে তোলে। সব বর্তমান হয়ে অপেক্ষার ধৈর্যহীনতার বিজ্ঞাপন এঁটে দ্রুত সামনে এসে দাঁড়ায় আর to-be বা not to be-র অনবস্থিতচিত্ততার দোলা দোলানিতে উৎকণ্ঠিত বোধ করে, সমাধান অজানতায় উৎকণ্ঠিত হয়ে পড়ে আর ক্রমশই যেন আতঙ্কের চাপ ও তাপকে তীব্র থেকে তীব্রতর করে তোলে। অতীতকে নিয়ে তবু নাড়াচাড়া করা যায়, উলট-পালট দেখা যায়, কাল্পনিক যুক্তি আর মনোমতো অপযুক্তির সাহায্য নিয়ে আপনজন সমর্থনের সুযোগ পাওয়া যায়। বর্তমান সে রকম নয়। সে একেবারেই ঘাড়ে চেপে বসে, না-ছোড় দাবি নিয়ে হাজির হয়, 'এখনই অথবা কখনই না' বলে হাঁক ছাড়ে। তীব্র গতি সময়কে বাহন করে তীব্র-বেগে ছুটে আসে। তাই বর্তমানগুলোর মুখে হাসি থাকে না, গোমড়া-মুখ উৎকণ্ঠার ছাপ সর্বাঙ্গে মেখে আমাদের ভয় দেখায়, আতঙ্কগ্রস্ত করে তোলে।

আর একা-অন্তর-গত পরিবারের তৃতীয় সদস্য? ভবিষ্যতের দুশ্চিন্তা? এই দুশ্চিন্তা

ভবিষ্যতের দুর্ভাবনা নিয়ে, ভঙ্গুর স্বাস্থ্য নিয়ে, দুর্বল মনকে নিয়ে, আত্মকেন্দ্রিক দুশ্চিন্তা আছে। দুশ্চিন্তার সুতোগুলো অপরকে নিয়েও কম জট পাকায় না। স্বামীকে নিয়ে স্ত্রীর, স্ত্রীকে নিয়ে স্বামীর, পুত্র-কন্যাদের বর্তমান জ্বালা-যন্ত্রণা, ভবিষ্যতের ভাবনা চিন্তা এবং শত শত অন্য সমস্যা—ঘর-বাড়ি, পাড়া-প্রতিবেশী, আত্মীয়-স্বজন, নাতি-নাতনী এবং জন্ম মৃত্যু। এর পরেও আছে নিজের এবং আপনজনদের রক্তচাপ নিয়ে উত্থান-পতনের সমস্যা, চলমান বিশ্বের 'হাপরের' হঠাৎ অবিরত হয়ে নীরব হওয়ার সম্ভাবনা, সুন্দর জমায় মধু করে গেলেও রক্তের উপাদান হিসেবে সেই মধুরই আধিক্য, ক্ষীণদৃষ্টি হতে হতে হীন-দৃষ্টি হয়ে পড়ার পূর্বাভাস—চোখে এবং মনে, উভয়তেই। অন্তহীন নয় দুশ্চিন্তা?

এই স্ব-পরিবারের তিন সদস্য বিশিষ্ট মন-গৃহের গৃহ-প্রবেশের দিনটি কোনও পঞ্জিকার নির্দেশ মেনে আসে না। যখন টের পাই যে দুশ্চিন্তাদের সামাজিক পরিবার থেকে ছিটকে সরে যাচ্ছি, প্রান্তবর্তী হয়ে একাকিত্বের মেরুদ্বীপে ভূদাবাসী অনুশোচনা-উৎকণ্ঠা-দুশ্চিন্তা নিয়ে ঘর বাঁধতে বসেছি তখন জানতে পারি যে বেলা সরে গেছে অনেক, অনেকটাই দূরে। প্রকৃতপক্ষে এই ত্রি-সদস্য শিশুরই জন্ম অনেক আগেই ঘটে। বীজের আসন্ন সম্ভাবনা নিয়ে এরা সকলেই যৌবনের সরস-সতেজ-উদ্দাম কামদুষ্ট মনের জমিতে স্থান পেয়ে যায়। অঙ্কুরোদ্গম থেকে শ্রীবৃদ্ধি পেতে এদের বেশ সময় লাগে। তাই বেলা গেলে এরা নিজ-নিজ identity প্রকাশ করে ration-এর দাবি তোলে। প্রথম—এই অনুশোচনা-উৎকণ্ঠা-দুশ্চিন্তাকে আমার প্রতিনিয়ত যোগান না দিলে এরা সহজেই আমাদের—পরিবার প্রধানকে, খাদ্য হিসেবে ঘোষণা করে বসে। সাধু সাবধান!

পঞ্জিকার দিন তারিখ নির্ধারণযোগ্য না হলেও বলা যায় কৈশোরান্ত জীবনেই এদের বীজ উপ্ত হয়। কারণ এই সময় থেকেই সচেতন ভাবে সম্ভাব্য exclusive বিকল্পগুলির মধ্যে একটিকে বেছে নেবার সময় এসে যায়। যে সব বিকল্পগুলো বাতিল হয়ে যায় অনিবার্যভাবেই, mutually exclusive বলে, তারা হারিয়ে গেলেও মন থেকে মুছে যায় না আর তাই গ্রাহ্য-বিকল্প বরাবর কিছুদূর চলার পরেই যখন বাস্তব কারণেই অট্টহাসিতে অথবা মুখ ভ্যাংচানিতে নিজেদের আত্মতৃপ্তি খুঁজে নেয়। অনুশোচনার বীজটি germinate করে বসে!

মধ্যপথে গিয়ে যখন আর সময়কে back-gear-এ set করার পথ থাকে না তখন সেই পরিণামধর্মী তাৎক্ষণিক to be বা not to be-র উৎকণ্ঠাটুকু পাতা ছাড়ে, নিজে আন্দোলিত হয়ে আর বাকি ভীত-সন্ত্রস্ত-আতঙ্ক দুলে ওঠে। কিন্তু জীবনের সামনেটাই তখন বেশি লম্বা বলে, জীবনের অঙ্ক-ধারাপাতকে বার বার মুছে মুছে নোতুন করে আঁক কষার অফুরন্ত সময় সামনে থাকে বলে দুশ্চিন্তার বীজ জমি পেলেও মনের মধ্যে ডাল-পালা ছাড়ে না।

বাহুতে শক্তি, রক্তে তেজ আর হাপরে দম যথেষ্ট থাকে বলে এই সব স্ব-পরিবারের শিশু সদস্যদের আমরা তখন আমলই দেই না, তুড়ি মেরে উড়িয়ে দিই। তাই সময় কালে, সুযোগ পেলে এই সব সদস্যরা আমাদেরই এক সময়ে সেই 'তুড়ি'-টি ফিরিয়ে দিতে চায়। তখন দোষ দিলে চলবে কেন?

ভেবে চিন্তে কাজ করার পরে কি অনুশোচনা করার কারণ থাকে? সকলেই সব কিছু ভাবতে পারে না, মানুষ সীমিত জ্ঞানবুদ্ধির জন্যে দীনতা বোধ করতে পারে, অনুশোচনা কেন? মানুষ তো ঈশ্বর নয়, নয় সর্বজ্ঞ। তাহলে? জ্ঞ এবং মনোযোগটাই আসল, কর্ম তো অন্য-নির্ভর।

উৎকণ্ঠা? এই বিশ্বের তাবৎ বিষয় ঘটানো বা না-ঘটানো যখন ব্যক্তির শক্তির উপর নির্ভর করে না তখন অকারণ উৎকণ্ঠাই বা কেন? ঘড়ি যদি বিলম্বে চলে তাহলে তাকে এক মিনিট এগিয়ে নেবার ক্ষমতা আছে কারও? কালকালির তাড়াকে মনে করে অকারণ উৎকণ্ঠার হেতু আছে?

শেষ, দুশ্চিন্তা? নির্মোহ হলেই তো কেটে যায়। আকাঙ্ক্ষা, মোহ, attachment, মনে ঢেউ তোলে, দুশ্চিন্তার জন্ম দেয়। গীতা স্মরণ করে কাজ করলে আর মনকে অরণ্যাশ্রমবাসী করলে কঠিন পথ অনেক সহজ বলে পার হওয়া যায়। তদ্বৎ সমাধান নয়?

মা ফলেষুঃ

ছোট বেলা থেকেই মা-বাবার নির্দেশে আমাদের অনেক কিছুই শিখতে হয়। আঙুল গুণে গুণে এক দুই, অবুঝের মতো নামতার স্বরলিপি — স্বরলিপি-না-সংখ্যালিপি? — তালপাতা নির্ভর অথবা slate-মাধ্যম অ-আ-ক-খ- এর বর্ণমালা, বকচ্ছপ-ছড়া আর Humpty-Dumpty rhyme গুলোর নির্বোধ উচ্চারণ এবং আরও কতো কি! সে-সবের কতটুকু আমাদের তখন প্রয়োজন থাকে, কি তাদের উদ্দেশ্য-বিধেয় তা-সবের কিছুমাত্র না জেনে-বুঝেই তো আমরা সে-সব নিষ্কাম-নির্ভেজাল অনুসরণ করে থাকি। এমন কি অনেকেই আমরা শক্ত শক্ত কবিতার খটমট উচ্চারণের নুড়ি-পাথর ভেঙে ভেঙে হোঁচট খেতে খেতে ক্ষতবিক্ষত রাস্তা পার হয়ে এগুতে বাধ্য হই। আমার মনে আছে যে বয়সে বাবার হাত ধরে সকালের শিশির ভেজা মাঠে ঘুরে বেড়ানোর কথা আর বিকেলের সূর্যকে সাক্ষী রেখে সবুজের সঙ্গে মিতালি পাতানোর সময় তখন গীতা-চণ্ডীর নির্দেশিত অংশ আবৃত্তি করতে হত!

তখন বুঝিনি, এখন বুঝি 'মা ফলেষু কদাচন' বলতে প্রকৃতপক্ষে কি বোঝায়। কাজেই তোমার অধিকার ফলে নয়—এই বাক্য বা নীতি-নির্দেশ অবুঝ বয়সে যতটা সত্য সারা জীবনে তো তা আর তেমন করে সত্য বলে মনে হল না! অপরের আঙুল ধরে চলার চাইতে আঙুল ছেড়ে দিয়ে চলার সময়টা যে জীবনে অনেক বেশি তা টের পেতে অনেকের মতো আমারও বেশি সময় বিধাতা ধার্য করেন নি। Teen-age শেষ হবার বহু আগেই লৌহ-কঠিন বাস্তব জীবনের পেষণ শুরু হয়ে গেল, iron-age-এর সূচনা ঘটে গেল। আর তখন থেকেই তো উদ্দেশ্যহীন কাজ করার ইতি। 'যা করবে বেশ ভেবে চিন্তেই করবে' বলে চারধারের ঘোষণা শুরু হয়ে গেল। Means এবং ends এর সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিচার-বিবেচনার সময় এসে গেল। লক্ষ্য স্থির রেখে স্থির-লক্ষ্য না হতে পারলে যে জীবনে অপচয়ের মাত্রাই বেড়ে যাবে তা তখনও যেমন সত্য ছিল এখনও তেমনি সত্য আছে। সকলের জন্যেই, সব সময়েই তো উদ্দেশ্যকে ধ্রুব করে নেবার নীতি-নির্দেশ সমান সত্য। তাহলে ফলের আকাঙ্ক্ষা ত্যাগ করে কাজে মন দেবে কি করে? শৈশবই কি গীতা-উক্ত কৃষ্ণ-কথার উপযুক্ত বয়স-সীমা?

শৈশবে কোনও শিশুই তো এক-দুই-তিন কেন মুখস্থ করতে হবে জানতে চায়না, তারা তো নিরাসক্ত হয়েই নামতার steam roller-কে মেনে নেয় আর বর্ণমালার বর্ণ-চোরা ভবিষ্যৎ-কে

না-কেনই আমরা হাত বুলাব? ফলাকাঙ্ক্ষাহীন সেই সব কাজই পরবর্তী জীবনে তাদের এক-দুই-তিন-দুই-একের অনল-বিনয় এবং ইঞ্জিনিয়ারের জীবন-দর্শন, অর্থ-তাৎপর্য, সত্য হয়ে ওঠে।

আর তার পরেই শুরু হয়ে যায় কেন? কেন? কেন? মায়ের অনুরোধ, পিতার নির্দেশ, শিক্ষকের উপদেশ এবং প্রতিবেশীর অনুনয় আর সমালোচনাই তো 'কেন-হীন' মান্যতা পায় না। এটা কর—তো কেন? ওটা করতে নেই—তো কেন? ওখানে যেতে নেই—তো কেন? তার সঙ্গে মেশ না—তো কেন? এই সব 'কেন-কেন?'-রা আসলে ফলের আকাঙ্ক্ষাকেই সোচ্চার তুলে ধরছে। উদ্দেশ্য-বিষয়ে সম্পর্কে জানার আগ্রহকেই প্রধান করে তুলছে। বিচার-বিশ্লেষণ reasoning হাত-পা ঝাড়া দিয়ে স্বাবলম্বী হতে চাইছে। তাহলে ঐ কাজেই তোমার অধিকার, কদাচ ফলে নয় — এই কথাটা কেমন করে হবে?

আমরা মাঠে নেমে খেলায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করব কিন্তু জয়ের আকাঙ্ক্ষা করব না, পাঠশালা-বিদ্যালয় যাব কিন্তু বৎসরান্তের 'ফলে' মন দেবো না, অফিসে যাবার জন্যে নাকে-মুখে গুঁজে ছুটব কিন্তু মাস-কাবারি গোনার লক্ষ্যে চোখ রাখব না, মন দিয়ে একান্ত হয়ে চাকরি করব কিন্তু promotion-প্রাপ্তি কদাচ মনের কোণে ঠাঁই দেবো না এবং অবসর নেবার সময়ে P.F বা gratuity-লক্ষ্য হব না! এ-তো প্রায় বিড়ালকে মাছ পাহারায় সৎ হবার পরামর্শ,বাঘ-সিংহকে কণ্ঠিধারী সদাচারী জীবন যাপনের উপদেশ এবং Licence-Permit-CMC কেন্দ্রের বাবুকে টাকা-মাটি মাটি-টাকা বোধে কাজ করার নির্দেশের মতো বন্ধ্যা-পঙ্গু-পরিকল্পনা!

বরং বলা যায় যে গীতার সত্য শিশুর বেলায়, বিপরীত সত্য যৌবনান্ত বাকি-বাকি জীবনে। কর্মযোগ নয়, স্বজন অধিকারকে যা করেন কদাচন! প্রথম নিদর্শন সরকারী মজুর। দ্বিতীয় প্রমাণ যাবতীয় শিক্ষালয় শিক্ষা আধিকারিক শিক্ষাসহ সমূহ। সর্বত্রই কর্মের বেলায় বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ, মাসান্ত ফলের বেলায় ঠাঁই-ঠাঁই! এবং তৃতীয় উদাহরণ কোর্ট-আদালত-বিচারালয়। এক-দুই-তিনের সংখ্যাজ্ঞান সেখানে নমস্তার geometrical proportion-এ ডিনামাইটের মতো চূর্ণ হয়ে সংখ্যার পুরুষ হয়ে স্থির বসে আছে। কারণ সংখ্যার পুরুষের মতোই তারা নিষ্ক্রিয় ভোক্তা মাত্র 'ফলের' আশায় তারা অংশভাককে একান্ত করে ফেলেছে, কর্মের অধিকার সমাধির বোধি-লাভ করেছে সেখানে। আর উদাহরণ বাড়াতে ভরসা নেই কারণ সেই 'ফলের' সম্ভাবনা। নিষ্কাম সেবা কোনও কাজের কথা নয়, পঁচিশ অ-বিচ্ছিন্ন রাখার বাসনা তদপেক্ষা বেশি গুরুত্বপূর্ণ! কারণ এ-রকম মামের ফলাকাঙ্ক্ষা নিয়ে এবং কর্মের অনীহা বিষয়ে উল্লেখ করেছি তারা সম্ভবত তেড়ে আসবে না যেহেতু তাদের পক্ষে আমার পুঁচিশ অংবরণ সমবায়ী হবে না! কিন্তু রাজনৈতিক নেতা আর সমাজের পাণ্ডাদের হাতের প্রসার সুদূর বিস্তৃত এবং হস্ত-পদ ব্যবহারে তাদের অসীম আনন্দ বোধ ঘটিতে পারে! এবং পুলিশদের বিষয়ে কোনো কুশিলনেস গুরুর নিষেধ!

আচ্ছা, নীতি-প্রবক্তার নিজের ঘোষণা কতোটা সুসমঞ্জস? ধর্ম-সংস্থাপনার্থে, অধর্ম থেকে ধর্মকে বাঁচানোর জন্যে, সেই লক্ষ্যে, তিনি নিজে যুগে-যুগে অবতীর্ণ হবেন। তাঁর যাত্রা বা আগমন ফলাকাঙ্ক্ষা রহিত নয় কিন্তু! 'আপনি আচরি ধর্ম' তাহলে সর্বথা এবং সর্বজনে সত্য নয়! তখনকার মানবশ্রেষ্ঠের জন্যেও নয় এখনকার মানবশ্রেষ্ঠ শীতাতপ-কক্ষ-বাসী নেতৃবৃন্দের জন্যেও নয়। নীতি-প্রয়োগ-বিভাজনের বেলাতেও তাহলে 'তোমার-আমার আমার-আমার' প্রকৌশল

প্রয়োজন? তাদেরই ধর্ম—তেন ত্যক্তেন—তোমার জন্যে। মোক্ষ তোমার জন্যে নির্দেশিত—আমার অধিকার,'পুরুষের' অধিকার। মা-ফলেষু কদাচন—তোমার জন্যে নির্দেশ, কর্মেই তোমার অধিকার। গ্লানি উপস্থিত হলেই 'আমি'। বেশ, বেশ, জলের মতোই সহজ বোধ্য, সরল-তথ্য।

সমাজ-সংসারের পিঠে ভাগের—পিঠে-বিভাজনের এ-মতো সূচী-সূক্ষ্ম ব্যবস্থাপত্র দ্বিতীয়টি আছে কি?

শোষণ ঃ

শোষণ কথাটি আধুনিক সময়ে বহুল প্রচলিত। কার্ল মার্কস ধারণাটিকে একটি নিষ্কারী গতি দিয়েছেন। শ্রেণী শোষণ। অর্থনৈতিক পটভূমিকায় শোষণের সার্বিক সত্তাকে ঐতিহাসিক বিশ্লেষণের তত্ত্বপর্যে তিনিই প্রথম সর্বসাধারণের ভাবনা-চেতনার কাছে পৌঁছে দিলেন। তিনি দিলেন না বলে বরং বলা যায় যে তাঁর ধ্যান-ধারণাকে অনুসরণ করে সমাজতন্ত্রবাদ জনমানসের একটা বিরাট অংশকে প্রভাবিত করল, একটা রাজনৈতিক চেতনা দলবদ্ধ হয়ে দেশে দেশে কম্যুনিষ্ট আন্দোলনের ঢেউ হয়ে এই শোষণের চরিত্রকে অ-সাধারণ তাত্ত্বিক স্তর থেকে মুক্ত করে সাধারণ জনের জীবনবোধকে আন্দোলিত করে তুলল।

প্রাণিজগতে শোষণ নেই কারণ সেখানে অর্থনীতির স্থান নেই। আদিম মানুষের জীবন যাপনেও শোষণের স্থান ছিল না কারণ অর্থনৈতিক পটভূমি ছিল না। দলবদ্ধ যাযাবর জীবনে সকলের সমান অধিকার ছিল। সেই খাদ্য-সংগ্রহ কেন্দ্রিক জীবন যাপনে আর যা প্রয়োজন ছিল তা সুরক্ষা-আত্মরক্ষা ও প্রতিরক্ষা। সকলের অধিকার স্বীকৃত ছিল, দুর্বলের ভাগ্যে জুটতো উপেক্ষা এবং বঞ্চনা, কখনই শোষণ নয়। এক গোষ্ঠীর সদস্যরা নিজেদের মধ্যে শোষণের সম্ভাবনা দেখতে পায় নি। অস্তিত্বরক্ষার নিয়মে, বাঁচার-জন্য-সংগ্রামের নিয়ম ছিল স্বাভাবিক। যোগ্যের উদ্বর্তন এবং অযোগ্যের অপসারণ ছিল প্রকৃতি নির্দেশিত আইন।

শোষণ তাই সভ্যতার দান, স্বার্থরক্ষার জন্যে ব্যবহৃত অস্ত্র। মানুষের বুদ্ধি যতো বেড়েছে, অভিজ্ঞতা যেমন যেমন দানা বেঁধে উঠেছে, মানুষ তত বেশি নিপুণ ভাবে শোষণের প্রথা-প্রকরণ খুঁজে পেয়েছে এবং তেমন তেমন প্রয়োগের ক্ষেত্র আবিষ্কার করেছে। প্রকৃতির বিভিন্ন ধরনের রোষের সামনে সে অসহায়-বিকল বোধ করেছে, ভীত হয়েছে। ঝড়-প্লাবন, দাবানল-অগ্ন্যুৎপাত, মহামারি, ভূমিকম্প, বজ্রপাত-অতিবৃষ্টি। তাই ভিতরে জন্ম নিয়েছে ভয় এবং সেই ভয় থেকে মুক্তির আকাঙ্ক্ষা; বাইরে উপস্থিত হয়েছে ধুরন্ধরদের ইন্দ্রজাল আর বুদ্ধিমানদের ঈশ্বর, ভগবান। দেহগত ক্ষমতার বিভিন্নতা মানুষকে শ্রেণীতে বিচ্ছিন্ন করে না, বুদ্ধিগত ক্ষমতা সেই কাজটি অনায়াসেই করে থাকে। Have আর have-not-এর ধারণা—অনেক পরের ধারণা। তার আগেই equal থেকে different-এর বোধ মানুষের মনে সম্ভাব্য স্বার্থ-চেতনার বীজটিকে অংকুরিত করে দেয়। কৃষির উদ্ভব সেই চেতনাকে পুষ্ট করে তোলে।

সভ্য মানুষের যাত্রা শুরু কৃষি সভ্যতার উর্বর ক্ষেত্র থেকেই। এই যাত্রাপথে তার সংগ্রহ

তিনটি। এক, অবসর, দুই শ্রেণীভেদ এবং তিন শোষণ। প্রথমটি মানুষকে দিল মাথা খাটানোর নিরবচ্ছিন্ন অবকাশ। সম্ভব হয়ে উঠলো জ্ঞানবিজ্ঞানের পরিশীলন, কাব্য-ইতিহাস-মহাকাব্যের কারুকাজও তার কাছে হল অবারিত। দ্বিতীয়টি বাস্তব হয়ে উঠলো শরীর-প্রধান মানুষ থেকে মস্তিষ্ক-প্রধান মানুষের প্রাকৃতিক বিভেদজনিত কারণে। জমির প্রয়োজন, কর্মীর প্রয়োজন, প্রশাসনের প্রয়োজন, দেখাশুনো করার প্রয়োজন এবং পরিকল্পনার প্রয়োজন। ক্ষমতা সকলের সমান নয়। বিভাজন অনিবার্য এবং স্বাভাবিক ভাবেই ঘটে গেল। তার পরে সমগোত্রীয়-বোধ সমস্বার্থ নৈকট্যের কারণ হল। তখন তৃতীয়টি আর দূরে থাকতে পারে কি? ক্ষমতার স্বভাবই ক্ষমতাবান থাকা। ক্ষমতা শক্তির আধারও বটে প্রকাশও বটে। যে যে সম্ভাব্য প্রত্যুপকরণে ক্ষমতাকে একই কেন্দ্রে স্থির রাখা যায় তার ব্যবস্থা সর্বপ্রকারে অনুসৃত হল।

মানুষ মরণশীল, কিন্তু ক্ষমতা নয়; তাই বংশকেন্দ্রিক ক্ষমতা ভোগ ক্ষমতাবানের প্রধান আকাঙ্ক্ষা। সামাজিক ধর্মাচরণ পথের দিশা দিল। অপরের মনের মধ্যে ভয় ঢুকিয়ে না দিতে পারলে অকারণ সংঘর্ষের সম্ভাবনা। তাই ধর্মকে, ঈশ্বরকে এবং ধর্মস্থানকে সপাটে কাজে লাগান হল। এতৎসত্ত্বেও সামাজিক উত্থান ঘটে যেতে পারে! তাই সামাজিক চেতনাকে নির্ভরশীল করে তোলার জন্যে 'মনু' এবং মনু-শৃঙ্খল তৈরি করা আবশ্যক হয়ে উঠলো। নারীর প্রাধান্য বাস্তব সত্য, পুরুষের জীবনে। ভবিষ্যতের পক্ষের এবং সমাজের এই অত্যন্ত শক্তিশালী প্রকৃতি সর্বাধিক উৎসটিকে সমূলে উৎপাটিত করে পুরুষ নির্ভর করে তোলার যাবতীয় ব্যবস্থা-বন্দোবস্ত, সামাজিক-মানসিক দিক থেকেই, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম নিয়ম-কানুনে বেঁধে দেওয়া হল।

শোষণের হাতেখড়ি-প্রয়োগ তাই অর্থনৈতিক বাতাবরণে নয়, সামাজিক-মানসিক জীবনে। ক্ষমতাকে কুক্ষিগত করার একান্ত বাসনা থেকে, স্বার্থ চেতনার ব্যক্তি কেন্দ্রিক অভিলাষা থেকে আর শক্তিকে বংশপরম্পরায় ভোগ করার লালসা থেকেই শোষণের জন্ম। অপরকে বঞ্চিত করার প্রাণিধর্মকে কাজে লাগিয়ে সম্পদ আর সম্পত্তির মাত্রা বাড়ে; সেই মাত্রা-বৃদ্ধি অন্যায়ের পথ বেয়ে যায় শোষণের মাধ্যমে, শোষণ তাই মানুষের স্বভাবে সত্য, প্রাণিস্বরূপে নয়।

শোষণ যে মানুষের স্বভাব সত্য তার ভূরি-ভূরি উদাহরণ আমাদের গৃহে-পরিবারে, পরিবেশে-সমাজে, ধর্মে-বিশ্বাসে এবং দলবাজি-বলবাজি-রাজনীতির ক্ষেত্রে সর্বত্রই ছড়িয়ে আছে। গৃহে-পরিবারে দুর্বল শুধু বঞ্চিতই হয় না শোষিতও হয়, exploited হয়। বিনয় এবং মানাটো সমাজ-প্রতিবেশীর জন্যে শোষণের ক্ষেত্রকে উর্বরা করে রাখে। ওঝা-বৈদ্য-হস্ত-রেখাবিদ গ্রহ-রত্ন-বিচার-সম্রাট থেকে পেঁচো-পেঁচি ঝাড়ফুঁক তোলা-বাটি-চালান চাল-পড়া-ধুলো-পড়া ইত্যক সর্বত্রই সহজ বিশ্বাসের শোষণ সেই কবে থেকেই চলে আসছে। পুজা-মানত থেকে নরবলি পশুবলির ব্যবস্থা দেবস্থান কৃত শোষণ। অজ্ঞতা এবং ভয়কে মূলধন করে সজ্জনেরা, ধূর্তরা সকলকে শোষণ করে থাকে।

তাই দেখতে পাই পিতা পুত্রকে, ভ্রাতা ভ্রাতাকে, স্বামী স্ত্রীকে নিজ-নিজ কার্যোদ্ধারের জন্যে exploit করছে। তাই ব্যবসায়ী ক্রেতাকে, আধিকারিক প্রার্থীকে, শিক্ষক ছাত্রকে, উপরওয়ালা অধস্তনকে, উকিল মক্কেলকে, নেতা জনগণকে exploit করে স্বার্থের মোহে, পুষ্ট হয় এবং আরও বেশি শোষণের জন্যে বুদ্ধিতে শান দেয়। আইনকানুন তৈরি হয় সকলের মঙ্গলের জন্যে, সমাজের সকলকেই সমদৃষ্টি, সম সুযোগ এবং সম-অধিকার দেবার মহৎ বাসনায়। কিন্তু সেই সব

আইনকানুন ব্যবহৃত হয় কতিপয়ের সুবিধার জন্যে, শোষণের জন্যে। ক্ষমতাবানদের দ্বারা ক্ষমতাহীন শত-সহস্রকে বিপন্ন করে শোষণকে ফুল-বিল্বপত্র দেবার জন্যে। আইন-আদালত, বিচার ব্যবস্থা-প্রকরণ এমন ভাবেই নির্ধারিত।

এ ভাবেই চলে ব্যক্তি শোষণ আর শ্রেণী শোষণ। কতিপয়ের দ্বারা বহুজনের শোষণ। অর্থনৈতিক ব্যাপারটি প্রধান হলেও সব নয়, সবটুকু নয়। আগেই সেই বিষয়ের উল্লেখ করা হয়েছে।

এই শোষণ প্রক্রিয়ায় বিজ্ঞান কাজে লাগে, সাহিত্য কাজে লাগে, ধর্ম ব্যবহৃত হয়। বিজ্ঞান আর প্রযুক্তিবিদরা অত্যাধুনিক সমাজ জীবনে ও রাজনৈতিক ক্ষমতা রক্ষায় এক বিশেষ সুবিধার স্থান দখল করে আছে। Atom bomb, V2, Patriot, NPT, PL 480, World Bank, IMF, Super Computer এবং আরও শত-এবং-এক মাধ্যমে ক্ষমতা অক্ষমকে শোষণ করছে, করবে। মধ্যবিত্ত জীবন-সাহিত্যিকরা মুচি-মাথর-ডোম, বেশ্যা call-girl-nymphomaniac দের নিয়ে চটকদার উপন্যাস বা গল্প তৈরি করছেন। চোর-পাচারকারী, শ্মশান-ভূত, পকেটমারদের নিয়ে লাগসই dialogue-ব্যবহারে রমরমা নাটক-নভেল-গল্প তৈরি করছেন। কেন? বিক্রি বাড়বে, লোকে 'খাবে', চাই কি একআধটি পুরস্কারও নিয়ে যেতে পারে। ভক্তি দিয়ে মন ভোলানোর ব্যবস্থা! Exploitation নয়?

সর্বহারার নেতা Underground এ নিজের বাসস্থানকে দুর্ভেদ্য fort করে ইন্দ্রের স্বর্গে বাস করেন! অনেকেই পাঁচ-দশ বিঘে জমির উপর 'বাংলো' বানিয়ে শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ করে রাখেন গরীবদের জন্যে শান্ত ভাবে ভাবনা-চিন্তার সুযোগ পাবেন বলে! মিথ্যাচার এবং শোষণ উভয়ই নয়? ব্যক্তি বা শ্রেণীই শোষিত হয় তা নয়, ধারণাও শোষিত হয় যে!

শিক্ষার জগাই, অশিক্ষার মাধাই : (১)

শিক্ষার উদ্দেশ্য কি মানুষকে মানুষ করে গড়ে তোলা, না, মানুষকে সফল মানুষ করে তৈরি করা? এটাই বোধহয় একটা মূল প্রশ্ন। অতীতে কখনও মানুষ হয়তো প্রকৃত মনুষ্যত্বের অধিকারী হিসেবে শ্রদ্ধা ও সম্মান স্বীকৃতি ও সার্থকতা পেয়ে থাকবে। বর্তমানে, যবে থেকে আধুনিকতা সভ্যতার মানদণ্ড হয়ে দাঁড়িয়েছে, সাফল্যই মানুষকে আকর্ষণ করছে। আধুনিক সভ্যতার মূল্যায়নসমূহও মানুষের বাইরেটাকে কেন্দ্র করেই নিশ্চিত হচ্ছে, উন্নতি বলতে বোঝাচ্ছে, প্রগতি বলতে জীবন যাপনের প্রকৃতি-পদ্ধতি-উপকরণের উপভোগের গুণ ও পরিমাণকে নির্দেশ করছে। অন্তরের সম্পদের চাইতে সংগ্রহের সম্পন্নতাকে, জ্ঞানের দীপ্তির চাইতে কর্মের কুশলতাকে এবং চরিত্রের মাধুর্যের চাইতে আচরণ-ব্যবহারের চটককে, বাইরেটাকে, বেশি মূল্য দেওয়া হচ্ছে। শিক্ষা সমস্যার মূল কেন্দ্রটি বোধহয় এই মূল্যায়ন-বিবর্তনের, বা পরিবর্তনের, উৎসে দানা বেঁধে উঠেছে। Plain living and high thinking-এর দিক নির্দেশটি এখন আধুনিকতার তাড়নায় পশ্চিম মুখী হয়ে High Living and self thinking হয়ে জন-মন আকর্ষণ করে চলেছে।

প্রশ্ন উঠতে পারে শিক্ষার তাত্ত্বিক লক্ষটি বাস্তব ক্ষেত্রে প্রযোজ্য কি না, কাঙ্ক্ষিত কি না।

মানুষ গড়ার পরিশীলন কেন্দ্র হিসেবে শিক্ষা ব্যবস্থাকে মনে করাটাই, অন্তত বর্তমান যুগে, একটা কল্পনার বিলাস মাত্র। অতীতের আটহাত লেংটি কাপড়ে লজ্জা নিবারণ এবং মাইলোর গুড় খেয়ে উদরের আচ্ছাদনের সুদীর্ঘ জীবন-দর্শন এখন কষ্ট কল্পনা মাত্র। অন্তরের গভীরে ভূমার প্রতি আকর্ষণকে একান্ত করে চিত্তনাশক সংসারে একমাত্র সত্যে দৃষ্টি স্থির রেখে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মে মতি রেখে, মনুষ্যত্বের শিখর-পথ অনুসারী হওয়াটাও এখন অজ্ঞতার-মূর্খতার-অবাস্তবতার উদাহরণ হবে।

বিশেষ করে এই জন্যে যে তেমন কোন মানুষ গড়ার পরিশীলন কেন্দ্র আদৌ কখনও ছিল কি? না-কি, সে কেবল আমাদের কল্পনার জগতে একটা আদর্শনিষ্ঠা, একটা utopian বা Plantonic Idea মাত্র হয়েই অনাদি-অনন্ত-তৃপ্তিহীন মানবীয় আকাঙ্ক্ষা হয়েই উপস্থিত ছিল? এ-প্রশ্নও কম জিজ্ঞাসার নয়। কারণ সেই পরিশীলন কেন্দ্রে যে সব উৎকৃষ্ট মানুষ গঠন হত তাঁরাই কিন্তু জাতি-ভেদ, বর্ণভেদ, ছুত-অচ্ছুৎ নীতি-নিয়ম-নির্দেশ অবলীলায় উদ্ভাবন করেছেন, চালু করেছেন এবং পারিষদ হিসেবে দীর্ঘস্থায়ী রাজার যাবতীয় ধর্মীয়-সামাজিক ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। যে শিক্ষা ব্যবস্থা, যে পরিশীলন মানুষের সঙ্গে মানুষের বিভেদটিকে চিরায়ত করার অনুশীলনকে মান্য মনে করে, যে বুদ্ধি ক্ষমতাকে আঁকড়ে থাকার জন্যে যন্ত্র হিসেবেই তাকে ব্যবহার করে, যে জ্ঞান নবজাত শিশুকে শিশু হিসেবে, ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা হিসেবে না দেখে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র শিশু হিসেবে দেখতে অভ্যস্ত, এবং অনুশীলনকে যে প্রভাবশালী শ্রেণী স্বার্থ সুরক্ষায় সদা নিয়োজিত সেই শিক্ষা ব্যবস্থা, সেই পরিশীলন, সেই জ্ঞান এবং সেই অনুশীলন কদাপি 'মানুষ গড়ার' কেন্দ্র বলে বিবেচিত হতে পারে কি?

তাই এটা কি মনে হতে পারে না যে সেই Plain living-টা অনন্যোপায় ছিল? অথবা 'Plain' ব্যাপারটা relative বলেই ঘি-দুধ-ননী-মাখন-ছানার 'খাদ্য' ভুক্ত জ্ঞানী জনেরা, ব্রাহ্মণ জনেরা, গুরু-পুরোহিত জনেরা, পরিতৃপ্তির ঢেকুর তুলে তুলে শত-সহস্র নিরন্ন-অভুক্ত-ক্ষুধা-ক্লান্ত অনাথনাথদের মাঝে 'Plain living এবং high thinking-এর আদর্শটি দোদুল্যমান ঝুলিয়ে রাখতেন! এবং সেখানে 'Plain' মানে আট-হাত খেটো ধুতি-সর্বস্ব নিম্নাঙ্গ, উর্ধ্বাঙ্গে পিতৃদত্ত চর্মাচ্ছাদনই যথেষ্ট, পেটের জন্যে মোটা-ভাত আর জীবন যাপনের জন্যে সমাজশ্রেষ্ঠদের জী-হুজুরে, পদ-লেহনে বিনয়ভাবটাই প্রধান!

ভণ্ডামি বা শঠতা কি আধুনিক সভ্যতার দান? এরা কি মানবীয় গুণ হিসেবে মানুষের সমবয়সী, সমসাময়িক নয়?

শিক্ষা সমস্যাটিকে তুলে ধরতে গিয়ে তাকে যতটা জটিল মনে হয়েছিল এখন দেখা যাচ্ছে সে তার চাইতেও বেশি জটিল। অতীত শিক্ষাব্যবস্থার সঙ্গে বর্তমান ব্যবস্থার তাহলে প্রভেদ কোথায়? শিক্ষা তখনও বিত্তবানের, শ্রেণীস্বার্থরক্ষার এবং ভোগ-উপভোগের মাধ্যম ছিল এখনও তো তাই-ই আছে। তখনও উপযোগবাদ প্রধান ছিল এখনও সেই Utiliterianism-ই প্রধান। সব সমাজেই শিক্ষা ক্ষমতাবানদের হাতিয়ার। বৈদিক সমাজে মুনি-ঋষি-ব্রাহ্মণদের, আর্যসমাজে আর্য-ব্রাহ্মণদের, মধ্যযুগে সম্রাট-সাহেনশা-রাজা-মহারাজাদের, বৃটিশ যুগে সাহেবদের এবং আধুনিক যুগে নেতা-ব্যবসায়ী-আমলাদের অধিকার, ক্ষমতা এবং সুবিধাভোগের হাতিয়ার হয়েই শিক্ষার আদর্শ-উদ্দেশ্য-প্রকরণ নির্ধারিত হয়েছে।

আধুনিক সভ্যতার সহস্রাক্ষ দৃষ্টিতে সহস্র-পথ উন্মোচনে এবং সহস্রগুণ গতি বৃদ্ধিতে শিক্ষার দেহ-মনে প্রভূত পরিবর্তন স্বাভাবিক ভাবেই এসে গেছে। নানা মতবাদ, যেমন স্বভাববাদ, প্রয়োগবাদ, বাস্তববাদ, ভাববাদ, উপযোগবাদ—নানা দিক থেকে শিক্ষার স্বরূপ, পদ্ধতি, প্রয়োজন, উদ্দেশ্য, লক্ষ্য, আদর্শ ইত্যাদি বিষয়ে 'আলোকপাত' করার চেষ্টা করে চলেছে। জটিল তাই অনিবার্যভাবেই জটিলতর হচ্ছে।

এবং আমরা সকলেই শিক্ষাকে Pass-Port সংগ্রহ office বা দপ্তর বলে মনে করে চলেছি। ব্যতিক্রম যদি কিছু থাকে তাহলে তা এই গড্ডালিকা-নিয়মকেই প্রমাণ করে মাত্র, বৃহৎ কর্মযজ্ঞে দু'চারটি প্রতিভা এবং talent by-product হিসেবে নিজেদের চিহ্নিত করে, দু'চারজনকে প্রভাবিতও করতে পারে। সে অন্য কথা, ব্যতিক্রমের কথা, বাইরের কথা।

এই Pass Port চলে certificate বা diploma-র মতো দেখতে। সংস্থার কুল-মান এই প্রত্যয়ন পত্রের গুণ-প্রকৃতি নির্ধারণ করে দেয় বলেই আমরা মনে মনে English medium সংস্থার প্রতি ঝুঁকে পড়ি। ভিড় বাড়তে বাড়তে একসময়ে উপচে পড়ে। স্বাভাবিক। যোগ্যতা ক্ষমতা এবং আকাঙ্ক্ষা আমাদের প্রত্যেককেই নিজ নিজ তীব্রতা অনুযায়ী তাড়িত করে। প্রত্যাখ্যাত অক্ষমরা দেশজ বিদ্যালয়-মাদ্রাসায় ভিড় করে। বিদ্যাপীঠস্থানের আর্থসামাজিক নাম-ডাক অনুযায়ী অথবা নাম ডাকের অভাবের মাত্রা অনুযায়ী ছাত্র-ছাত্রীদের প্রতিযোগী মনোভাব, যোগ্যতা এবং প্রকৃতি গড়ে ওঠে। Investment-এর পরিমাণ স্থির করে দেয়, পুরস্কার আবরণটি নিশ্চিত করে দেয়। শ্রেণী বিভক্ত সমাজে শ্রেণী বিন্যস্ত শিক্ষা ব্যবস্থা অনিবার্য নয় কি?

অতীত দিনে ভদ্রদের জন্য শিক্ষা সংরক্ষিত ছিল। নির্দেশিত। বর্তমানে অন্য উপায়ে শ্রেণীকরণ নিশ্চিত হয়েছে মাত্র। ঘোষিত নীতি আর বাস্তব প্রয়োগ যদি পরস্পরবিরোধী থাকে তাকে কি বলা হবে?

আমরা যারা সমাজের নেতা, নীতি নিয়ামক, তারা কি সন্ন্যাস নিয়েছি? আধুনিক গণতন্ত্রের পটভূমিতে ঈশ্বর নয়, ভোটই আমাদের দেবতা নয়? সামাজিক-আর্থিক পীঠস্থানগুলি থেকে যথাসম্ভব ভিড়-প্রতিযোগিতা হটানো কাম্য নয়? আপন বুঝ পাগলেও বোঝে, আমরা পাগল হলে অপরের কি লাভ হবে না? তবে আমরাও পাগল, কিন্তু ক্ষমতা পাগল, নেতৃত্ব পাগল, স্বার্থ পাগল। ওম্ তৎ সৎ।

শিক্ষা যে জটিলতম বিষয়গুলির মধ্যে বা ধারণার মধ্যে অন্যতম তা বলার অপেক্ষা রাখে। এটি একটি composite Concept-অনেকটাই 'মানুষ' শব্দটির মতো। বহু বিচিত্র-বিপরীত-বিরুদ্ধ গুণ-স্বভাব প্রকৃতি-বিবরণের সহাবস্থান ক্ষেত্র বা কেন্দ্র। শিক্ষা ধারণার মধ্যে বহু প্রোতবিভক্ত প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা, জীবনের অভিজ্ঞতা সঞ্চয়ের বিচিত্র-বিভিন্ন উৎস-ক্ষেত্র-প্রসারের অ-প্রাতিষ্ঠানিক 'জীবনের বাস্তব শিক্ষা' এবং প্রত্যেক জীবনের প্রথম দুই বছর থেকে পাঁচ বছর সময়ের মধ্যে প্রথম শব্দ-বাক্য-বর্ণমালাহীন জ্ঞানোদয় এবং orientation-এর প্রাকৃতিক শিক্ষা। এই ত্রি-উৎসের মধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা কতটুকু স্থান জুড়ে থাকে? মস্তিষ্ককে তত্ত্বের এবং তথ্যের যোগান দেওয়া প্রধান কাজ। তার বাইরে বুদ্ধির Processing, হাত-পা-চোখের কুশলতার ব্যায়াম ও অনুশীলন, ব্যবহার বিধি সমূহের গ্রন্থ প্রকরণ অনেকটাই স্থান জুড়ে থাকে। এই শিক্ষা যৎ সামান্য মানুষের ব্যবহারিক জীবনে কাজে লাগলেও লাগতে পারে। বাকি অধিকাংশই অপচয়ের হিসেবে জমা হয়ে যায়।

কারণ অধীত বিদ্যায় ধুলো পড়ে, মরচে ধরে, নষ্ট হয়ে যায় এবং অব্যবহার-অপব্যবহারে পাংশুবর্ণ-বাতিলের পর্যায়ে চলে যায়।

কিন্তু যে শিক্ষা প্রকৃতিতে স্বাভাবিক ভাবে শিশুর বর্ণমালা হয়ে আমাদের বোধের গভীরে দাগ কেটে যায় প্রথম দুই বা পাঁচ বছরে, অন্য সকলের অজান্তে এবং অজ্ঞতায়, সেই হয়ে দাঁড়ায় আমাদের শিক্ষার প্রকৃত ভিত। তার উপর জীবনের বাস্তব শিক্ষাই edifice টি তৈরি করে। সেইখানেই আমরা আমাদের নিজ নিজ শিক্ষার মূল কাঠামোটি এবং 'বাসগৃহ রূপ'-টি পাকা করে ফেলি। সেই শিক্ষাগৃহের edifice-এ আমরা প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার চুনকাম ও decoration চড়াই।

এবং এই চুনকাম আর decoration দেখে যখন আমরা শিক্ষিত-অশিক্ষিত যাচাই করি, নির্ণয় করি, তখন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই প্রতারিত হয়ে পড়ি। অনিবার্য নয় কি? বাইরের তকমা আর বিজ্ঞাপন দেখে ভিতরের বস্তুস্বরূপ জানার পথ থাকে কি?

থাকে না বলেই তো যতো বিড়ম্বনা। এবং ঘরে বাইরে অশান্তি। এবং Commission ইত্যাদি।

শিক্ষার জগাই, অশিক্ষার মাধাই : (২)

শিক্ষা যে একটা সমস্যা এবং তা যে বেশ জটিল তা মানুষের নিজের সৃষ্টি। বয়পারহি প্রাণী জগতে কোন সমস্যাই নয়। সেখানে যেটুকু 'শিক্ষা' প্রয়োজন তা পরিবেশ-প্রকৃতি এবং প্রাণী-প্রকৃতির সহজ-সরল লেনদেনেই ঘটে যায়। প্রকৃতিতে উদ্দেশ্য যেমন সাদা-মাঠা শিক্ষণ পদ্ধতিও তেমনি সোজা-সাপ্টা। সভ্যতা-সংস্কৃতি, চরিত্র-ব্যক্তিত্ব, ব্যক্তি-সমাজ, নীতি-আদর্শ, এবং ইত্যাদি নিয়ে মানুষের জীবনে পাঠশালা-মাদ্রাসা, স্কুল-বিদ্যালয় এবং শতেক প্রতিষ্ঠানের জটিলতা অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। শিক্ষার Net-work যতো জটিল রূপ নিয়েছে, যতো বিচিত্র পথে প্রসার পেয়েছে এবং যতো বিচিত্র দাবি মেটানোর জন্য নিজেকে প্রতিনিয়ত ঢেলে সাজিয়েছে এবং সাজাচ্ছে ততো সে জটিলতর-ভিন্নতর-বিচিত্রতর হয়ে উঠেছে। শিক্ষার সমস্যা তাই মানুষের শত-সহস্র উদ্দেশ্য সাধনের প্রয়োজন থেকেই গজিয়ে উঠেছে।

যখন কোনও সমস্যা নিয়ে আর থৈ পাওয়া যায় না তখনই অনিবার্য হয় Commission, Seminer, Symposium পণ্ডিত ব্যক্তিদের মাথাগুলো সেখানে ঘর্মাক্ত হয়, বিশেষজ্ঞদের ক্ষুরধার বুদ্ধিগুলো তখন কাটাকুটি, গ্রহণ বর্জন আর amendment-resolution-এর ঘাট খুঁজে মরে। শিক্ষা সমস্যাটিকে তাই দীর্ঘ জলসেচনে বাড়িয়ে তুলে, আশঙ্কা-কুশঙ্কার জল্পনা-কল্পনা করে, উৎকণ্ঠিত প্রশাসন সমাজ হাঁক পাড়তে থাকে 'পথ দেখাও, পথ দেখাও!' অনেকটাই সেই kick dust and then complain you can't see-এর মতো। রাজ্যময়, দেশময়, তোলপাড় হতে থাকে, সকাল-বিকেল session বসে, উত্তেজনা ছুটে ওঠে, দৈনিকে-সাপ্তাহিকে-পাক্ষিকে ঢোল-করতাল-ঢাক-ঢোলের তালবাদ্যে সেই সমস্যা এবং সমস্যা-সমাধানের অর্থনীতি-সমাজনীতি, ইতিহাস-ভূগোল বিজ্ঞান-দর্শন নিয়ে প্রচণ্ড নাচন নাচতে থাকে, রাজনীতির ক্ষেত্র থেকে জ্ঞানী-গুণীরা

আসরে নেমে আসরকে সরগরম করে তোলে। একসময়ে অন্য কোনও সমস্যা নিয়ে সকলেই ক্ষেত্রান্তরে প্রস্থান করে, সেখানে তখন সমূহ চাপ সৃষ্টি হয়, সোরগোলে শিক্ষা-সমস্যা থেকে দূরে সরে যায়। আর ঠিক তখনই সমস্যা, সমস্যা সমাধানের সূত্র-সমূহ, তত্ত্ব ব্যাখ্যা এবং ব্যাখ্যার ব্যাখ্যা-ভূষণ দামী দামী লেফাফা-বন্দি হয়ে shelf বা আলমারির তাকে অনিবার্য ধুলোর অপেক্ষায় স্থির-অনড় morgue-জীবন যাপনে বদ্ধ-চক্ষু অপেক্ষা করতে থাকে।

উচ্চকোটি প্রশাসনের suited-booted খটাখট্ চলন, Everest সদৃশ প্রভার চাদর-ঢাকা শান্ত আগমন-নিষ্ক্রমণ এবং ঊর্ধ্ব-দৃষ্টি আত্মভোলা বিজ্ঞানমনস্কতার স্থির নিশ্চিত surgery-dissection যখন চলতে থাকে শিক্ষা সমস্যার দেহ-আত্মা-রক্ত-রসকে ঘিরে ঘিরে তখন আমলাতন্ত্রের পুরোহিতেরা গাম্ভীর্যের নামাবলি সর্বাঙ্গে লেপটে-এঁটে, তর্জনীটি ঠোঁটের সামনে লক্ষ-নির্দেশ করে নৈঃশব্দকেও সভয়ে দূরত্বে সরিয়ে রাখে। গৃহের বা স্ব-স্ব পরিবারের বাতাবরণে যজ্ঞ-সমাপনান্তে ফিরে আসা এইসব উচ্চকোটিজন, প্রাজ্ঞজন এবং ঊর্ধ্ব-দৃষ্টি-জন অন্য সকলকেই "উদ্বিগ্ন" করে তোলেন।

কিন্তু পাঠকেরা আশা করি জানেন যে সাধারণজন, যে চাসিম শেখ আর রামা কৈবর্ত-রা ছড়িয়ে আছে তাদের কাছে এই বিরাট-বিপুল শিক্ষা-যজ্ঞের ঢাকঢোল কোন্ কাজে লাগে, কতটুকুই বা পৌঁছোয়? সাধারণ জনেরা শিক্ষা কি তা বোঝে না, শিক্ষিত-জনকে দেখেই তারা যা-কিছু আন্দাজ করে নেয়, তারা অশিক্ষাকেও বোঝে না, অশিক্ষিতদের ব্যবহার দেখে বুঝে নেয়। ঈশ্বর বলতে তারা বিমূর্ত ব্রহ্ম বোঝে না, ছবি-পুতুল-প্রতিমাকে চেনে, তেমনি বিমূর্ত 'শিক্ষা' তাদের মাথার উপর দিয়ে যায়, শিক্ষিত-অশিক্ষিত জন তাদের চোখের সামনে প্রত্যক্ষ হয়ে নড়া চড়া করে।

এবং সেই প্রত্যক্ষ নড়াচড়ায় তারা বড় বড় শিক্ষিত জনকে দেখতে পায় কেমন অবলীলায় ঈর্ষা-দ্বেষ-হিংস্রতাকে প্রকাশ করছে, এক পয়সা-দু'পয়সার জন্য কেমন নখদন্ত সারমেয়-শৃগাল ব্যবহার করছে, দু'ইঞ্চি জমি নিয়ে কামড়া-কামড়িকে থানা-পুলিশ-কোর্ট পর্যন্ত গড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে। এই সব স্কুল-বিশ্ববিদ্যালয় স্বীকৃত শিক্ষিতদের পকেট-file-এ সুরক্ষিত certificate-diploma গুলোতে সাধারণ লোকের আগ্রহ নেই, তাদের আগ্রহ এদের সামাজিক-মানসিক ব্যবহারে, আচরণে, মিথস্ক্রিয়ায় (interaction-এ)। এ-পর্যন্ত কোন্ কমিশন, seminer, symposium শিক্ষার এই মূল সমস্যার কেন্দ্রটিতে আলো ফেলতে পারল?

শিক্ষিত জনের দৃষ্টিতে নিরক্ষর জনেরাই অশিক্ষিত, গ্রাম্যরাই অশিক্ষিত, বস্তিবাসী মাত্রেই অশিক্ষিত এবং অবশ্যই diploma-certificate-হীনরাই অশিক্ষিত। শিক্ষিত জনের কাছে শিক্ষার তিনটি মাত্রা স্বীকৃত এক, বেশ-ভূষার পারিপাট্য এবং দেহের সপুষ্ট মসৃণতা, দুই, সম্পদ অর্থকরী এবং অথবা পদাধিকারী অবস্থান এবং তিন, কোনও উচ্চকোটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতিপত্র বা প্রত্যয়ন। এই ত্রি-মাত্রা তুলাদণ্ডে জনসাধারণকে মাপার এবং সুতরাং দেশের অধিকাংশ জনকে অশিক্ষিত বলে ঘোষণা করার অধিকারটুকু স্বনির্ধারিত। সরল-সহজ জীবন যাপন, চেষ্টা ও শ্রমের দ্বারা খাদ্য-উপার্জন, দেবদ্বিজে ভক্তি আর রামায়ণ-মহাভারত-কথকথায় জেনে পাওয়া সহজ-বিশ্বাসের মানসিক অবস্থান, চালু সমাজের গতিশীল বর্ণচ্ছটার কাছে স্বীকৃতির ঝকো-কমকে না পাওয়ার কারণ।

ওদিকে নিরক্ষর-'অশিক্ষিত' জনসাধারণের ধ্যানধারণাও আধুনিকতা দ্বারা প্রভাবিত। তারা জানে যে যাঁদের মাথার উপরে দিবসের কর্মস্থলে এবং রাতের বিশ্রামকক্ষে বৈদ্যুতিক পাখা বাতাস

সের, যাঁদের কাজ-কর্ম বলতে চেয়ার-টেবিলে উপবিষ্টাবস্থা এবং হিট-ইটি কাগজ-পত্র নাড়াচাড়া বোঝায়, তাঁরাই শিক্ষিত। যাঁরা সকালে ঢোলা-পাঞ্জাবী গায়ে চটি মচ্ মচ্ বাজার-বের হন এবং পুঁই-শাক ধনে হাতে গৃহে ফেরেন, যাঁরা ছুটোছুটি করে অফিসে কাছারিতে ঢোকেন, সেখানে পৌঁছে বিশ্রাম করেন, দিনান্তে বিশ্রামে আর গলদঘর্ম ক্লান্ত হয়ে আবার দমদম হয়ে গৃহে চা-পানের নিমিত্ত ফিরে আসেন তাঁরাই শিক্ষিত। দশটা-পাঁচটার আহ্নিক বেষ্টনের বাইরে যাঁদের করণীয় নেই কিছুই, শুধু যাঁদের শরণেই আরামের প্রেক্ষুর তোলার আবাস, পাড়ার রক, ক্লাবের চারদেওয়াল আর নাট-মন্দিরের চাতাল যাঁদের আড্ডার মনোভূমি তাঁরাই শিক্ষিত। যাঁরা দপ্তরে বসে আবেদনকারীর প্রতি বিরক্তি প্রকাশের অধিকারী, যাঁরা হাসপাতালে অবস্থান করে আতুরজনের প্রতি উদাসীন ব্যবহারে অকৃপণ, যাঁরা শিক্ষাঙ্গনে উপবেশন করেও ছাত্র-ছাত্রীদের শিক্ষা বিষয়ে অনুভূতিহীন এবং প্রশাসনের ছোটবড় বিবেদা ব্যবস্থায় পদার টুকরো শিখরচারী হয়েও জনগনের জন্য একমাত্র বৃদ্ধ-অঙ্গুষ্ঠটিই উত্তোলিত রাখেন তাঁরাই সুশিক্ষিত।

জনসাধারণ শুধু 'শিক্ষিত' হয়ে উঠতে চায় কিন্তু একমাত্র মানসিক দিকটি ছাড়া শিক্ষার ত্রি মাত্রার কোনও মাত্রাই সহজে করায়ত্ত হতে চায় না। বাড়ির ভিত বানানোর সময়ে অপরের জমি 'দখল' করে আত্মসাৎ করা, নিজের ছেলে গোল্লায় গেলে অপরের ছেলের ঘাড়ে দোষ চাপানো, ছোট-খাট মনোমালিন্যকে তর্কের আঘাতে ঝগড়ায় নিয়ে যাওয়া, ঝগড়াকে নখদন্তে টেনে নেওয়া, স্বার্থের দাপাদাপিতে সারমেয় দন্তরাজী দর্শানো আর নখের ধার পরখে সদা তৎপরতা—এ-সকল শিক্ষিত-সদৃশ আচরণ শুধু ছড়িয়ে পড়ছে জনগণের মধ্যে। কিন্তু ত্রি-মাত্রা শ্রেণী স্বার্থ বড়ই উচ্চাকাঙ্ক্ষী স্বার্থ! সেই স্বার্থ সুচারুভাবে সুরক্ষায় আগলে রাখাটাই শিক্ষার প্রধান কাজ নয় কি?

বিশ্বাস-সন্দেহ-বিচার :

দৈনন্দিন জীবনের আটপৌরে সংসারেই বলুন আর পরিপাটি সাজানো-গোছানো বিশিষ্ট জীবনেই বলুন আমরা সকলেই কয়েকটি মনোভাবকে সব সময়েই সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফিরি। এদের সকলেই তাই বিলক্ষণ চেনেন। বিশ্বাস-অবিশ্বাস, সন্দেহ-স্বীকার, বিচার-অবধারণ (analysis judgement)। এরা সকলেই আমাদের সংসারে-জীবনে পথ দেখায় বলেই এদের সঙ্গে আমাদের পরিচয়। কিন্তু এরা যে কতো বিপদের কারণ, কতো যন্ত্রণার উৎস তা আমরা মনে রাখি না, ভেবে দেখি না।

একজন যা বিশ্বাস করে অন্যজন যখন তা বিশ্বাস করে না তখন কোনো বিরুদ্ধতা ঘটে? বিশ্বাস-অবিশ্বাস তো অনুভব মাত্র, তাই একজনের অনুভবের সঙ্গে অন্যজনের অনুভব না মিললে, বিপরীত হলে, আদৌ কোনও 'বিরুদ্ধতা' থাকে না। কারণ দুটি 'অনুভব' একই সঙ্গে ঘটনা [বা, সত্য!] হতে পারে যখন তারা, সেই অনুভব দুটি, দুটি আলাদা ব্যক্তির মনে ঘটছে। এমন কি একই ব্যক্তির জীবনে বিভিন্ন সময়ে একই বিষয়ে ভিন্ন বিশ্বাস ঘটনা বা 'সত্য' হতে পারে। এমন তো হামেশাই হয়ে থাকে। আবছা আলোয় ভ্রমবশে সন্ধ্যায় আমি যেখানে ভূত দেখতে পাচ্ছি বলে

বিশ্বাসে অটল এবং ভয়ে টলমল সেই অবস্থায় তুমি কেবল একটি শাওড়াগাছ বা কলাগাছ দেখে ভয় বিশ্বাস করতেই পার। তাতে আমার ভূত-বিশ্বাস যেমন চোট খায় না তোমার শাওড়া-বিশ্বাসও তেমনি স্থির থাকে। আবার বয়সের তেজে ঈশ্বরকে ফুৎকার বাতাস দিয়ে একই ব্যক্তি, তাহার টানে, ভগবানে-বিশ্বাসকে ধ্রুব করে জীবনকে সত্য-দৃষ্টি করে রাখতে পারেন। কেন? কারণ বিশ্বাস-অবিশ্বাস উভয় মনোভাবই বিষয়ীগত-এবং-ব্যক্তিগত (Subjective and private.)। কিন্তু বিশ্বাস নিয়ে ঝগড়া কি কিছুমাত্র কম হয়?

বিশ্বাস আর একটা কাজও করে। বিশ্বাস মনকে শান্তি দেয়। বিশ্বাসে বস্তু মেলে কৃষ্ণও মেলে। কারণ বিশ্বাস একটা সদর্থক মনোভাব। বিশ্বাস করে ঠকাও ভাল বলে অনেকে এই শান্তি-দায়ী মনোভাবের পূজা-আবাহন করে থাকেন; কিন্তু জীবনে এবং সংসারে বিশ্বাস করে শতেক লোক যে পথে বসেছেন তা পরিসংখ্যানগত তথ্য। যা সহজ-সরল তাই যে ভাল এবং উচিত তা বলা যায় কি? অবিশ্বাসকে চেহারা দেখে নঞর্থক বলে মনে হয়; আসলে কিন্তু সেটিও সদর্থক, Positive মানসিক অবস্থা। ভূতে অবিশ্বাস= ভূতের অনুপস্থিতিতে বিশ্বাস। স্থির, নিশ্চয়, Positive.

সন্দেহ কিন্তু বেশ মারাত্মক অবস্থা। শান্তি দেয় না, স্বস্তির চিহ্নমাত্র কাছে ধরে আসতে দেয় না, যতক্ষণ মনে সন্দেহের বিন্দুমাত্রও টিকে থাকবে। সন্দেহ অত্যন্ত বৈজ্ঞানিক মনোভাব, এবং এতোই, যে ফরাসী দার্শনিক 'দেকার্তে' মহাশয় এই সন্দেহের কাঁটা-কম্পাস হাতে দর্শনের জগতে সত্য খুঁজতে বেরিয়ে অবিস্মরণীয় পিতৃদেব, আধুনিক দর্শনের পিতৃদেব, অভিধাটি পেয়ে গেছেন। দর্শনের বিজ্ঞানের চৌহদ্দিকে একাকার সন্দেহ মনোভাবটি প্রশংসার শিরোপা পেলেও জীবন-সংসারে এটি একটি যন্ত্রণার উৎস, ক্ষত-বিক্ষত হবার বিচরণভূমি এবং অপরের দৃষ্টিতে অসুস্থ মানসিকতার কারণ। সন্দেহের লেলিহান অগ্নিকুণ্ডকে ফরাসী দার্শনিক Purifying furnace বলেছেন। সত্যের দাবি নিয়ে যা-কিছুই সামনে আসবে তাকেই সন্দেহের সেই furnace-এ পুড়িয়ে তিনি দেখে নিতে চেয়েছিলেন খাঁটি কিছু তা-সবের মধ্যে আদৌ আছে কি না। ভাল কথা। সংসারে স্বামী খাঁটি কিনা, স্ত্রী খাঁটি কিনা এবং এমনো ইয়ারা দপ্তরে-কাছারিতে এবং সর্বত্রই যদি খাঁটি খুঁজতে সন্দেহের furnace-টি কাজে লাগাই তাহলে যথাসম্ভব সত্বর প্রত্যেকেই নিজেকে রাঁচির লৌহ-যবনিকার অভ্যন্তরে আবিষ্কারের অধিকার পেয়ে যাবো; এবং জীবন-সংসারে বেঁচে থাকার সেই একটি মাত্রই তাৎপর্য অবশিষ্ট থেকে যাবে—রাঁচি বাসই তখন একমাত্র লাভ হবে!

অনুশীলন-উত্তর বিশ্বাস আমাদের শান্তি দেবে; অনুশীলনান্তে সন্দেহ-ক্রিয়া আমাদের সত্য দেবে। সন্দেহ সত্য-সন্ধ বলেই সে বিষয়ীগত হয়েও Private নয়, objective; এবং একটি উপস্থিত মানসিক প্রবৃত্তি (attitude) বলে সে সদর্থকও বটে। অতি ব্যবহারে উভয় ক্ষেত্রেই বিপদের সম্ভাবনা। বিশ্বাসের অতি-ব্যবহার মস্তিষ্কহীন 'সবজী-জীবনে' টেনে নামাতে পারে আর সন্দেহের অতি-ব্যবহার 'বেদনা-পুষ্ট' জীবন যাপনকে অবশ্যম্ভাবী করে তুলতে পারে।

বিচার-অবধারণ ব্যাপারটা কেমন? reasoning-analysis-judgement? জীবন-সংসারে খুবই পুষ্টিকর পদ্ধতি, শান্ত-নিরপেক্ষ প্রক্রিয়া, কিন্তু হলে কি হবে? আধুনিক জীবন-সংসারের দ্রুতগতি চলন আর হাড়ভাঙা প্রতিযোগিতার বাতাবরণে এই Prescription অচল। সকলেই তাৎক্ষণিক সিদ্ধান্তের জন্য আর সদ্য workabilityর তাগিদে aspro-anacin-septran-ampiciline-এর ব্যবহারে সন্তুষ্ট। প্রয়োজনীয় বিচার প্রচেষ্টা তাই

দীর্ঘসূত্র বলে জেনেছি, কাণ্ডজ্ঞান অবধারণ প্রক্রিয়াও তেমনি সময়ের অপচয়ে বলে ধিক্কৃত। বিচার-বিবেচনা তাই অতীতের বিষয় বলে অপব্যবহারে অবর্জিত হতে বসেছে। যাঁরা বিচার-বিবেচনা করে অবধারণকে খুঁজতে বসেন তাঁরা হয় বৃদ্ধ অথবা অকাজের লোক বলে সমাজে কুকথা আর বক্রের বঙ্কিম দৃষ্টির দ্বারা আহত হতে বাধ্য হয়ে পড়েন। সময় নেই সময়-সাপেক্ষ বিচারের পথ হাঁটার। বিচারহীন তাৎক্ষণিকের ধাক্কায় তাই বিচার-বিবেচনার প্রাণও ওষ্ঠাগত।

সব কিছুকেই সোজা-সহজ করতে আধুনিক জীবন সব কিছুকেই যান্ত্রিক করে তুলেছে। ক্রমবর্ধমান যান্ত্রিক জীবনের তীব্র গতিচক্রের টানে জীবন-যৌবন-ধনমান ছুটে চলেছে মাথা বরাবর, আর তারই পাশে পাশে, দুকূলের অপেক্ষাকৃত নিস্তব্ধ গতির আহ্বানে সমাজের অনাকাঙ্ক্ষিত-অপাঙক্তেয় জনেরা নিশ্বাসের চোখে মুড়ি দিয়ে নদীর ধারে, বই ভজার নিচু আর বানপ্রস্থীদের আখড়ায় নিরুত্ত শান্তির অন্বেষণে চোখ বুজে বসে যাচ্ছে। এখন যারা জীবন নদীর মাঝ মাঝখানে ছুটে চলেছে তারা একবারও ভাবে কি যে পিছনে আরো প্রকম্প-ধাক্কায় তারা যখন ছিটকে সরে যাবে মূল স্রোতের বাইরে তখন অসম্মানিত-পর্যুদস্ত বিচার-ক্ষমতা আর চর্চাহীন-অননুশীলিত বিবেচনারা মাথা কুটে মরলেও কাছে এসে ধরা দেবে না?

বিচারহীন কোনও বিবেচনা হয় না, বিবেচনার স্পর্শহীন বিচার বিচারই নয়, অনুশীলিত সন্দেহ আমাদের প্রত্যেককে, বিশ্বাসকে প্রাপ্ত করে তোলে, বিশ্বাসের অন্তরালেই সন্দেহকে সত্যের স্বর্ণ-নিকষে অসত্যের খাদ পুড়িয়ে 'সোহাগা' করে তুলতে হয়। তাই বলা যায় এরা সকলে—বিশ্বাস-সন্দেহ-বিচার—সকলেই মনের হাতিয়ার, যন্ত্রপাতি বা হাকর্মা। প্রেয় এবং শ্রেয় স্থির হলেই এদের ব্যবহার সার্থক হতে পারে। অন্যথা মত্তার কারণ হয়ে ওঠে।

বিত্ত-বিভেদ :

কোনও ধারণাকে সম্যক অনুধাবন করতে বিশ্লেষণের ব্যবহার করা হয়, কোনও বস্তুকে বা প্রাণীকে বোঝার জন্য দরকার ব্যবচ্ছেদ, বীক্ষণ থেকে অনুবীক্ষণ। কিন্তু সব কিছুকেই ব্যাখ্যা করার জন্য শ্রেণীবিভাগ একটি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলে স্বীকৃত।

সমাজ একটা ধারণাও বটে, একটা বহু-ব্যক্তি সমবায়-সংহতিও বটে। তাই সমাজের প্রতিটি বিষয়ে সম্যক অনুধাবন এবং পারস্পরিক ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়াকে যথাযথ বুঝতে গেলে বিশ্লেষণ এবং ব্যবচ্ছেদ একই সঙ্গে ব্যবহারের প্রয়োজন দেখা দেয়। বিষয়টি তাই একাধারে বিশাল এবং জটিল। যোগ্যতর জনেরা তা নিয়ে ব্যাপৃতও আছেন। শ্রেণী বিভাগকে কেন্দ্র করে ভাবিকর অনুভবকে প্রকাশ করার চেষ্টা করাই এখানে উদ্দেশ্য।

প্রাণিজগতে genus-specis শ্রেণী বিভাগ প্রকৃতি নির্ধারিত। কিন্তু একই উপজাতির মধ্যে যে শ্রেণী বিভাগ তা প্রকৃতি-সমর্থিত নয়। এখানে দৈহ-গঠন, পরিবেশের প্রভাব, মস্তিষ্কের ওজন-পরিমাণ এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের কুশলতা ইত্যাদি বিরাট ভূমিকা পালন করে। যেটোর শ্রেণী বিভাগের আগেও, আর্য ঋষিদের চতুর-বর্ণ সমাজ সৃজনের পূর্বেও শ্রেণী বিভাগ ছিল। প্রকৃতির নিজের ব্যবস্থাপনায়

বুদ্ধির ধূর্ততায়, শরীরের ক্ষমতা-কুশলতার আর সাফল্যের সূত্রে একই গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যক্তিতে ব্যক্তিতে এবং আত্ম-গোষ্ঠী যোগ্যতার গোষ্ঠী-শ্রেণীতে গোষ্ঠী-শ্রেণীতে বিভেদ সৃষ্টি হয়েছিল।

হয়েছিল, কিন্তু সেই শ্রেণীবিভাগ প্রকৃতি সমর্থিত বলে তাতে সামঞ্জস্যহীনতার ধাক্কা ছিল না, ecology নাড় খায় নি। মনুষ্যসৃষ্ট শ্রেণী বিভাজন কৃত্রিম, প্রকৃতির নিয়মে না ঘটে মানুষের প্রয়োজনে উদ্ভাবিত-প্রচলিত বলে সেই শ্রেণী বিভেদের মধ্যে বিচ্ছিন্নতাকে অনিবার্য করে তুলেছিল। অর্থাৎ বিভাজন না হয়ে তা বিভেদ হয়ে দেখা দিয়েছিল।

এই বিভেদ-প্রধান শ্রেণীবিন্যাস নিয়ে, এর উৎস বা কারণ নিয়ে, ধর্ম-দর্শন-বিজ্ঞান প্রভৃত আলোচনা করেছে, করছে এবং করবেও। কোথাও কর্ম-যোগ্যতাকে, কোথাও মঙ্গলের ধারণাকে (idea of good), অর্থনৈতিক উদ্বৃত্তের ঐতিহাসিকতাকে আবার কোথাও বা সংস্কারকে শ্রেণী বিভিন্নতার কারণ বলে ধরা হয়েছে। শুধুমাত্র বিত্ত-কে নির্দেশ করে এই বিভেদের উৎসটির সন্ধান যথাযথ হয়ে ওঠে নি।

উর্ধ্ববিত্ত, মধ্যবিত্ত এবং নিম্নবিত্ত—এই ত্রিবিধ বিত্ত-সম্পর্ক বা বিত্ত-স্তর-বিভাজন অতীতেও ছিল বর্তমানেও আছে ভবিষ্যতেও থাকবে। বিত্ত একটি সংখ্যা-দ্যোতনা, তাই এর মাত্রাগত বিভিন্নতা অসীম বিভাজনের গাণিতিক সত্য; সংখ্যা মাত্রই infinitely divisible তা সত্ত্বেও জলের তাপমাত্রাকে বোঝার জন্যে যেমন বাষ্প-জল-বরফ-এ ভাগ করা হয়, তেমনি বিত্তের অসীম বিভাজন scale কেও তিনটি প্রধান স্তরে প্রকাশ করা হয়।

চরিত্র-বৈশিষ্ট্য এবং গুণ-লক্ষণ একটি পর্ব-বন্ধনীতে ধরা পড়ে বলেই উর্ধ্ববিত্ত, মধ্যবিত্ত, নিম্নবিত্ত পর্ব-বিভাগ সর্বজন স্বীকৃত। উর্ধ্ববিত্ত শ্রেণীর কুশলতা, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বুদ্ধিবৃত্তি এবং নিম্নবিত্ত শ্রেণীর শ্রমদান যোগ্যতাই প্রধান প্রধান গুণ লক্ষণ। সমাজ-সভ্যতার সবক্ষেত্রেই যে যে উপাদান ক্ষমতা-শক্তি-অধিকারের মূলে, উৎপাদন-গতি-এবং-স্থিতিশীলতার উৎসে সেই সকল ক্ষেত্রই উর্ধ্ববিত্ত শ্রেণীর দখল, দক্ষতা এবং নৈপুণ্য বিশিষ্ট হয়ে অবস্থান করে। এই শ্রেণীর বাস্তবতা বোধ যাবতীয় ভোগ ও ভোগের উপকরণসমূহকে কেন্দ্রীভূত করে তোলে। এই অংশে মার্কসীয় উদ্বৃত্ত তত্ত্বের ব্যাখ্যা স্মরণযোগ্য। সত্ত্ব সৃষ্টি এবং সৃষ্ট সত্ত্বের উপভোগ তাই উর্ধ্ববিত্ত সমাজের স্বাধিকার বলেই এই শ্রেণী মনে করে। মুনাফার উদ্বৃত্ত অংশ যে কেবলমাত্র এই শ্রেণীর গুণ-বৈশিষ্ট্যের অবদান সে বিষয়ে এদের নিশ্চয়তাবোধই অপর দুই শ্রেণীকে বঞ্চিত করার যুক্তি-বিশ্বাস যোগায় এবং, পরে দেখা যাবে, নিম্নবিত্ত শ্রেণীকে শোষণ করার অধিকার-সুযোগ, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর উপসত্ত্ব-ভোগ-বাসনার ইচ্ছার সহায়তায়, কেমন অনায়াসেই এদের হাতে চলে আসে।

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুণ-লক্ষণ তার বুদ্ধি-বৃত্তি। বাস্তব নয়, আকার গত বুদ্ধির অনুশীলন-পরিশীলন, মেধার উন্মেষ-উন্নতি এবং ধী-শক্তির উৎকর্ষ-শ্রীবৃদ্ধি এই শ্রেণীর বৈশিষ্ট্য। যুক্তি-বুদ্ধি আপেক্ষিক, মেধা ক্রয়যোগ্য ব্যক্তি-পণ্য (Commodity), ধী-শক্তি প্রয়োগ-প্রকাশে উজ্জ্বল হবার অপেক্ষা রাখে। তাই মধ্যবিত্ত শ্রেণীর গুণ-বৈশিষ্ট্য উচ্চবিত্তের কাজে লাগে, ভোগ্যপণ্য সৃষ্টিতে ব্যবহৃত হয় এবং বিত্ত-বিভাগ সুস্থিত করার জন্যে অপরের নির্দেশে উপযোগিতা খুঁজে পায়। কৃষ্টি-সংস্কৃতি-মূল্যবোধের স্রষ্টা-ধারক-এবং-বাহক এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী একদিকে সৃষ্টির আনন্দে বুঁদ হয়ে থাকে অন্যদিকে ব্যবহৃত হতে পেরে দক্ষিণার প্রাপ্তিটুকুকেই কর্তৃধর্ম বলে স্বীকার করে। তার বুদ্ধি-মেধা-ধীশক্তির আত্ম ঐশ্বর্য যে উপসত্ত্ব ভোগের বিনিময়ে দক্ষিণার অবমূল্যায়নে ধর্ষিত হচ্ছে

তা এই শ্রেণীর কর্মচারির মধ্যেই পড়ে না, চেতনার জগতে আসে না।

এই মধ্যবিত্ত শ্রেণী দর্শনে বিজ্ঞানে নোতুন চিন্তা-ভাবনা যোগ করে, প্রকৌশলগত নৈপুণ্যে নব নব শিল্প এবং সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম প্রয়োগ-সাফল্য সম্ভব করে তোলে, আর্থসামাজিক চেতনায় আর রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনুসন্ধান চালিয়ে অমূল্য রত্নরাজি আহরণ করে আনে। এই শ্রেণী অফিসে-দপ্তরে, গণ-মাধ্যমের সর্বক্ষেত্রে, এবং সকল দল-শ্রেণী-গোষ্ঠীর শীর্ষে অবস্থান করে। জ্ঞান-গরিমা-শক্তি-সাহস এদের অস্তিত্বের পরতে পরতে সমুজ্জ্বল থাকে বলেই এরা প্রাপ্তির নেশায় আচ্ছন্ন অবস্থায় একদিকে উচ্চবিত্তের বিত্ত-সংগ্রহে নিজেদের সবটুকুকেই উৎসর্গ করে দেয়, অন্যদিকে নিম্নবিত্ত শ্রমিক শ্রেণীকে বঞ্চিত-শোষিত করার যাবতীয় নাট-বল্টু হয়ে ব্যবহৃত হতে দেয়।

শ্রমিক শ্রেণী প্রাণ থাকায়, সেই মুনাফার উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চিত হবার বোধে উত্তেজিত থাকে। উচ্চবিত্ত শ্রেণী সেই উদ্বৃত্তকেই কুক্ষিগত করতে পারে বলে উল্লসিত থাকে। মধ্যবিত্তের ট্র্যাজেডি এখানেই যে সে তার দুর্গতি-মাত্রাকে সম্যক বুঝে উঠতে পারে না, শুধু প্রাপ্তির উপসত্বকেই সে তাৎক্ষণিক সুধা-সুরা মনে করে। শিল্পীর জীবদ্দশায় যে ছবি তার দারিদ্র্যকে ঘোচাতে পারে না, মৃত্যুর পরে উচ্চবিত্তের করস্পর্শে সেই ছবিই লক্ষ লক্ষ ডলারে বিক্রি হয়ে যায়।

মধ্যবিত্তের দ্বিতীয় ট্র্যাজেডির উৎসটি তার উর্ধ্বমুখ, উচ্চবিত্ত-দৃষ্টির জন্য এবং পাশাপাশিই নিম্নবিত্তের প্রতি নিম্ন-দৃষ্টি, হীন-দৃষ্টির কারণে। শোষিত-বঞ্চিত রূপে যে তার আপন সেই শ্রমিকদের সে নিজের বলে মনেই করে না। মনে করে না কারণ সে নিজে কলম-বুদ্ধি-মেধা চালায় আর শ্রমিক দেহ, লাঙল আর হাতুড়ি চালায়। আকাশের 'চাঁদা'-কে দেখে সে উচ্ছ্বসিত 'মামা' বলে সম্বোধন করতে তৃপ্তি বোধ করে, বিত্তের আত্মীয় বোধে উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। অথচ যে নিজের সমস্ত অস্তিত্বের সকল রক্ত-রস-মেদ-মজ্জা দিয়ে জীবন যাপনের রসদ-রূপ আলোটুকু জ্বালাতে নিজেই জ্বলে যাচ্ছে সেই শ্রমিক-নিম্নবিত্তের গলা টিপে দিতে চায়, 'মামা' ডাক শুনলে! এটা মধ্যবিত্তের বিপত্তি নয়?

এবং তৃতীয় ট্র্যাজেডি? উচ্চবিত্তের চড়ক গাছে পাঁড়-খোলা বড়শি-বেঁধা মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী সমাজের সর্বত্র নেতা-ছাত্র-সম্পাদক-শিক্ষক-বিজ্ঞানী Engineer-technologist, computer-specialist হয়ে শিরদাঁড়া-মাথায় উপসত্বের জোরে সমাজের উর্ধ্ব-আকাশ-স্তরে বিচরণ করছি আর মনে মনে আত্মপ্রসাদের ঢেকুর তুলে ঘোষণা করছি : আমরাই প্রধান, ওরা বস্তিবাসী নিরক্ষর বলেই অপাংক্তেয়। কিন্তু আমাদের সেবা করাই ওদের ধর্ম, অন্যথা গলা দেবো টিপে।

বিজ্ঞান কথা ও কথায় বিজ্ঞান :

আমাদের সকলেরই শব্দ ভাণ্ডারে দুরকমের শব্দ থাকে, কথা জমা হয়ে যায়। ভাল শব্দ আর কাজের শব্দ, ভাল কথা আর কাজের কথা। কাজের কথা যখন বলি তখন মাত্রা বাছ-বিচার করি না, কথায় যেমন যেমন আসে তেমন তেমন ছিটকোতে থাকে। বক্তার বলতে আটকায় না, শ্রোতার

বুঝতেও আটকায় না। কিন্তু জ্ঞান কথা যখন বলি, বলতে হয়, যেমন আলোচনা সভায়, বক্তৃতাকালে অথবা জনসমাজে, তখন বাছা বাছা শব্দ খুঁজতেই হয়। বক্তব্যকে 'বৈজ্ঞানিক' করে তুলতে তখন সচেতন সচেষ্টতা প্রকাশ পায়।

আমাদের দৈনন্দিন জীবনের কাজের কথায় আর বিশেষ বিশেষ জীবনের সপ্রচেষ্ট কথায় 'বিজ্ঞান' বা 'বৈজ্ঞানিক' শব্দটি এমন একটি কথা যা আমরা নির্বিচারে ব্যবহার করে থাকি। যত্র-তত্র ব্যবহার করে করে আর যখন তখন শব্দটিকে কাজে লাগাতে লাগাতে শব্দটার ধার যেমন কমে গেছে মানেটাও তেমনি মার খেতে খেতে ভোঁতা হয়ে গেছে। বিশেষ-জ্ঞান-এর ব্যুৎপত্তিতে ওর যে কোন খানদানী কোন ঐতিহ্য আছে তা নয়। কারণ সব জ্ঞানই সাধারণ আবার সব জ্ঞানই অসাধারণ বা বিশেষ। ব্যাপারটা, মানে বিশেষ হয়ে ওঠাটা, ব্যক্তির বেলায় যেমন ব্যক্তির ভবিষ্যৎ ঠিক করে দেয়, শব্দের বেলাতেও, এ-ধরনের অক্ষর-ব্যক্তিত্বে যে সব শব্দ বেড়ে ওঠে তাদের বেলাতেও, তেমনি, ভবিষ্যতেই সাধারণ বা অসাধারণের ছাপ মেরে দেয়। বিজ্ঞান শব্দটির অন্নগত শৈশব যেমনই কাটুক না কেন এরিস্টটলের লালনে আর নিউটন-গ্যালিলিওর পালনে সেই শব্দটির তরুণ কায়া একেবারে একটা ভবিষ্যতের আলো পেয়েছিল। তার পরে অল্প সময়ের মধ্যে বহু জনের যত্ন-শ্রম-চেষ্টায় সে অবশ্যই একটা নধরশরীর-মহাশয় যৌবনের তেজ পেল, দীপ্তি পেল। বিশ্ব সভায় স্বীকৃতি পেয়ে বিজ্ঞান তখন আকাশ-মাথা ধারণা হয়ে দাঁড়াল।

মানুষের স্বভাবই এমন যে সে খুব বড়কে তেমন সহ্য করতে পারে না। পারে না তার কারণ বোধহয় এই যে সেই বড়র মাপে নিজেকে বড় ছোট বলে মনে হয়। সেটি সত্য হলে কি হবে, যন্ত্রণার তো বটেই। অবশ্য অনেকের কাছে, সকলের কাছে নয়। যারা ছোট এবং জানে যে ছোট তারা কোনও যন্ত্রণা বোধ করে না। যন্ত্রণা তাদের যারা ছোট কিন্তু জানে যে তারা বেশ বড়। তাই কেউ যদি বেশি বড় হয়ে দেখা দেয় তা হলে এই আসলে-ছোট-কিন্তু-মনে-মনে-বড়দের জ্বালা ধরে যায়। স্বাভাবিক নয়?

এটা যেমন সত্যের একদিক, তেমনি এর আর একটা দিকও আছে। সেও সেই মানুষের স্বভাব। বড়র আড়ালে লুকোনোর চেষ্টা। সেই জন্যই তো কথায় কথায় রবীন্দ্রনাথের নাম আসে, আইনস্টাইনের কথা ওঠে, নিউটনকে নিয়ে টানাটানি পড়ে। আমরা সকলে কি তাঁদের বুঝি, চিনি, জানি? তা নয়, কাজে লাগাই। এলাকা বুঝে বুঝে বড়-দের ধরে আনি আর নিজের নিজের ছোট-কে পাচার করার চেষ্টা করি।

'বিজ্ঞান', 'বৈজ্ঞানিক' তাই আমাদের কাজের কথায় যেমন জ্ঞান কথাতেও তেমন অনায়াসে ঢুকে পড়ে। বোঝা-না-বোঝার প্রশ্নই তখন আর কেউ তুলতে পারে না। বিজ্ঞান একটা বিষয়ও বটে, একটা অনুসন্ধানের প্রক্রিয়ার নামও বটে। 'বৈজ্ঞানিক' তো বিষয়েরই বিশেষণ, অনুসন্ধানের গুণ-প্রকৃতির ব্যাখ্যা। বিজ্ঞান-মনস্কতা, বিজ্ঞান-সম্মত জীবন যাত্রা, বৈজ্ঞানিক তথ্য, বৈজ্ঞানিক ধারণা-জ্ঞান-বিশ্বাস কোথায় না কোথায় ব্যবহার করা যায়, ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু কথাটাকে ব্যবহার করা আর অর্থটাকে অনুসরণ করা তো এক-কথা নয়।

দর্শনের পিতৃ-গৃহ ছেড়ে, Law of Reason এর নিয়মের এলাকা ত্যাগ করে এবং শুধুমাত্র Consistency-র speculative জগৎ পিতার জন্যে ধার্য করে বিজ্ঞান যখন verifiability-র আবাসে সরে এলো, predictability-র নিয়মকে আঁকড়ে ধরল এবং প্রমাণ বলতে

হয়-প্রমাণ-নয়তো-অপ্রমাণ ঘোষণাকে নীতি হিসেবে মেনে নিল তখনই ব্যাপারটা আর গৃহ-বিচ্ছেদের প্রকাশ না হয়ে স্বতন্ত্র-গৃহের নববিন্যাস বলে ঘোষণা হয়ে গেল। দর্শন তাই সম্ভাবনার এলাকায় অনুসন্ধানকে যথারীতি চালিয়ে গেল, বিজ্ঞান কোনও বিরুদ্ধতা না করেও সেই সব সম্ভাবনাদের বাস্তবতা নিয়ে যুক্ত হতে লাগল। প্রয়োগ সাফল্য নিয়ে ব্যস্ত হল। একই জ্ঞান-পরিবারের সদস্য হলেও, একই অনুসন্ধানের যুক্তি-সিদ্ধ পথ ধরেও পিতা-পুত্রের উদ্দেশ্য ও গন্তব্য স্বতন্ত্র হয়ে গেল। একজন চায় যা logically consistent তাকে নিশ্চয় করতে, অন্যজন চায় যা predictably applicable তাকে নির্ধারণ করতে। এদের দুই পুরুষে স্বাতন্ত্র্য আছে, বিরোধ কোথায়?

বিরোধ আছে এবং তা বেশ গভীর ভাবেই আছে। বিজ্ঞানের পোশাক-আশাক পরে দর্শনের এলাকায় ঢুকে পড়লে অথবা দর্শনের ধারণা আর সামঞ্জস্যের নামাবলি গায়ে দিয়ে বিজ্ঞানের উঠোনে দাঁড়ালেই বিরোধ। কথার জোড়-বদলে শব্দ বিপন্ন হয়ে পড়ে। যখন যদি বৈজ্ঞানিক তথ্য তখন মানে বোঝাই দায় হয়ে দাঁড়ায় না? তথ্য বা fact বৈজ্ঞানিকও নয় অবৈজ্ঞানিকও নয়, সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। বিজ্ঞানী প্রয়োজন মত তথ্য বা fact কে কাজে লাগান, তেমনি দার্শনিক ধারণা-বিশ্বাস-সম্পদকে অন্যান্য ধারণা-বিশ্বাস-সম্পদের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ কিনা তাই দেখতে দেখাতে চান। একটা বিশ্বাস বিশ্বাসই মাত্র, সত্যও নয় মিথ্যাও নয়। সুতরাং বিশ্বাসেরও বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক, দর্শনসম্মত বা অন্যতর হবার সাধ্য কোথায়? যতক্ষণ ঘোষণা না থাকছে, Statement বা Proposition না তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ সত্যতা-মিথ্যাত্বের আসা-যাওয়ার পথ খুলছে না।

একই ক্ষেত্রে একাধিক ঘোষণা থাকলে দর্শন তাদের মধ্যে সামঞ্জস্য আছে কি না তা দেখতে ভোলে না। ঘোষণাদের যৌক্তিক নিয়ম মেনে চলতে বাধ্য, ভিতরের বিশ্বাসটা নয়। বিজ্ঞান শুধুমাত্র সেই সামঞ্জস্যে থামবে না, সে সেই ঘোষণাটি মেনে নিলে আর কি কি অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে অবশ্যই মেনে নিতে হয় তা দেখবে এবং—এই 'এবং' টাই বেশি জোরালো—এবং, সেই অনুসিদ্ধান্তসমূহ, প্রত্যেকটি এবং সবগুলিই, বাস্তব ক্ষেত্রে প্রয়োগ সফল কি না তা যাচাই করে নেবে।

আমরা বৈজ্ঞানিক আলোচনা চাই, আসলে যা বলতে চাই তা যৌক্তিক আলোচনা। কারণ আলোচনার বৈজ্ঞানিক-অবৈজ্ঞানিক বলে কোন বিশেষণ হয় কি? আমরা বৈজ্ঞানিক বিশ্বাসে আস্থাবান, বিশ্বাস ব্যাপারটা যে সম্পূর্ণত মানসিক, তার মধ্যে যে বৈজ্ঞানিকতার ছিটে ফোঁটার স্থান নেই তা আমরা ভাবিই না। বৈজ্ঞানিক দর্শন, ধর্ম, সমাজ ইত্যাদি কথা এবং এমনতো শত শত প্রকাশ আসলে বিজ্ঞানের আড়ালে দুর্বলতা ঢাকার চেষ্টা মাত্র। 'বৈজ্ঞানিক' কথাটা চমকের কাজে মনের ভাবনায় লাগানো হয়, আসলে ক্ষেত্র এবং বিষয় অনুযায়ী অন্য কোনও শব্দ বা কথা ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু 'বিজ্ঞান' কথাটা একটা বাতাবরণ তৈরি করে দেয়, একটা ভক্ত-আসক্ততাকে মুক্তি দেয় তাই এই মন্ত্র-তন্ত্র প্রয়োগ বাসনা। It works; and that which works is true! আমরা সকলেই তাই সন্তুষ্ট।

প্রেম ঃ

'প্রেম' বিষয়ে দু'কথা লিখতে বা বলতে পারি এমন ধারণা কোনও দিনই গড়ে ওঠেনি। অতএব পরিচিতজনেরা যদি দুনাক্ষরেও টের পায় যে সে রকম একটা বাসনা মনের আনাচে কানাচেতেও ঘুরঘুর করছে তাহলেই অট্টহাস্য হয়ে ফেটে পড়তে পারে। সে অট্টহাসিতে আমার কোনও ইতর বিশেষ হবে না কারণ ওদের সঙ্গে আমিও একমত। অভিজ্ঞতা না থাকলে কলমে প্রাণের ছোঁয়া লাগে না, জীবন দিয়ে অনুভব না করলে জীবনের কোনও ধনকেই সাহিত্যের অঙ্গনে সাজিয়ে করা চলে না—এমন কথা অনেক আগে থেকেই জানা। প্রেম আমার জীবন থেকে সদাসর্বদাই সহস্র-পদ দূরে দূরে থেকেছে এমন একটা বিশ্বাস আমার মধ্যে বেশ দৃঢ়-মূল গেড়ে গেছে। শুষ্ক কাঠ, নীরস প্রস্তর আর উষর মরুর বুকে প্রেমের বীজটি অঙ্কুর ছাড়তে পারে না, কারণ শিকড় প্রবেশে বাধা পায়। হৃদয়ের উষ্ণতা, বয়সের আর্দ্রতা আর দৃষ্টি-পাতের নম্র-পল্লব হিল্লোলের অক্সিজেন না পেলে প্রেমের বীজও মার খেয়ে যায়। তাই সারাজীবন যে মেরু-পথে আমি যাত্রী জীবন-গোলার্ধের সেই প্রান্তে যোগ্য উষ্ণতা-আর্দ্রতা-অক্সিজেনের বরাবরই ঘাটতি ছিল বলে আমি নিশ্চিন্তই ছিলাম, ভিতরের অঙ্কুরোদ্গমের যেমন সম্ভাবনা ছিল না বাইরের আক্রমণেরও তেমনি যথেষ্ট সুযোগ ছিল না।

এ-পর্যন্ত বলেই থমকে যেতে হল, সঞ্জীব চাটুজ্যে মশাই হঠাৎই অতীতের আবছা থেকে বর্তমানের স্বচ্ছতায় দেখা দিলেন: বটগাছ বড়ই রসিক, নীরস পাথরের বুকেও সে রসের সন্ধান পেয়ে প্রেমের সবুজকে সতেজ করতে পেরেছিল। পালামৌ বেড়াতে গিয়ে তিনি আর যাই পাঠককে দিয়ে থাকুন প্রেমীদের জন্য এই এক টুকরো ছবিকে সনাতন করে রেখে গেছেন। এখানে বটগাছের প্রেম পাথরের বুকে যেমন সবুজ ফুটে উঠেছে, লেখকের মনের সবুজও কম প্রকাশ পায় নি। থমকে গেলাম এ-জন্য যে সুদূর অতীতের একটা সজীব হিল্লোল যেন মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে ধূসর বিস্মৃতি থেকে হঠাৎই মাথা নেড়ে নেড়ে কিছু একটা বলতে চাইল। যেন বলতে চাইল প্রকৃতি সব দিতে সরসতা শুধু পাথরের বুকেই নয় অ-প্রেমীর অন্তরেও উৎসারিত হতে পারে! তাই মনের ইতিহাসখানার ধূ-ধূ পাড়ে যেন একটা সির সির তরঙ্গ টের পাচ্ছিলাম। অনেক, অনেক আগের সেই কথা কিছুটা পরে বলাই বোধহয় ভাল কারণ বৃদ্ধের কলমে কৈশোরের কথা, ভূমিকাহীন, মার খেয়ে যেতে পারে।

প্রেম ব্যাপারটা আমার কাছে বরাবরই কেমন যেন কুহেলিকা, নিজে থেকে বুঝিনি, বোঝার মতো করে কোন প্লাবনও আসে নি। অপরে যদি বা বোঝাতে চেয়েছে তা সেই অপরের গীত-বাদ্য বোঝার মতোই বুঝেছি। তবে শুনে শুনে প্রত্যয় হয়েছে যে প্রেম আছে বহু প্রকারের আর সেই সব প্রেমের প্রত্যেকটিই নাকি দুকূলপ্লাবী, নিজ-নিজ ব্যক্তিত্ব-স্বত্ব-স্বাতন্ত্র্য-স্বার্থপরতার নোঙর ছিঁড়ে ভাসিয়ে নিয়ে যায় প্রেমাস্পদের দিকে। এবং এও জেনেছি যে প্রেম-প্লাবনের মহাপ্লাবন ঘটে ঈশ্বর-প্রেমে আর মানব-মানবী প্রেমে। এমন কি সেই সেই প্রেমে মাতোয়ারা হলে শত্রু-মিত্র বোধ রহিত হয়ে প্রেমিকেরা অধিকারজনিত দহন ঘটাতে পারে।

কচকচি ছেড়ে তরতাজা উপাখ্যানে আসা যাক। আপনারাই ঠিক করুন ঘটনার মধ্যে রসের সন্ধান আছে কি না।

সবে যখন কৈশোরের খোলস ছেড়ে যৌবনের আহ্বান দেহে, আর প্রাণের স্পন্দন মনে তরঙ্গ-ভঙ্গ ঘটাচ্ছে। নিজের মধ্যে যতটা টের পাই তার চাইতে অপরের চোখে ধরা পড়ে অনেক বেশি, একেবারে আমূল পরিবর্তন হয়ে গেল পরিবেশের ইতিহাস-ভূগোলে। গ্রামের আজন্ম গণ্ডি ছেড়ে গ্রাম-শহরের হৃদয়ের মধ্যে গিয়ে পড়লাম। ভিতরেও যেমন নোতুনের সিরসির, বাইরেও তেমনি চমকের পর চমক যেন সকাল সন্ধ্যা হকচকিয়ে দিতে লাগল।

ঘটনা এমনি এক সন্ধিক্ষণে ঘটেছিল। তখন হাবুডুবু খেয়েছি মাত্র, জলের প্রকৃতি, জলাশয়ের প্রসার এবং গভীরতা পরিমাপের অবকাশই পাই নি। পাড়ে পৌঁছবার আগেই দেশ বিভাগের ঢিল ছুঁড়ে আমার সেই সদ্য-সরস অঙ্কুর-ওঠা জীবন-পত্রটিকে এক মহাবাত্যা তুলে নিয়ে অজানা-অনভিপ্রেত এক জীবনের মোটা ঘূর্ণিতে ছুঁড়ে দিয়ে গেল। সংক্ষিপ্ত ঘটনা, সংক্ষিপ্ততর তার জীবন। সে কি ছিল প্রেম, সে কি ছিল না প্রেম—তা এখন স্মৃতি মাত্র।

ছেলেদের জীবনে পনেরো উর্ধ্ব জীবন-দিশা প্রেমের জন্য বেশ প্রশস্ত বলে, অন্তত আমাদের দেশে, শুনি নি। কিন্তু সেই সদ্য-প্রবাসী এক দূর-আত্মীয় তরুণকে দৃষ্টি বিদ্ধ করে অবশ করে দিয়েছিল আর এক সদ্য-যুবক-ভাঙা তরুণী! তার আগে পর্যন্ত আমার গ্রাম্য জীবনে বহু রমণীর নৈকট্য পেয়েছি, পেয়েছি শাসন, পেয়েছি নির্দেশ-উপদেশ, পেয়েছি আদর-আপ্যায়ন, স্নেহ-ভালবাসা এবং অবশ্যই বহু প্রকারের টানাটানি—কান, চুল ইত্যাদি যে শাসনের জন্যে অত্যাবশ্যক হাতল তা গুরুজন স্থানীয়াদের কাছে সময়ে জেনে গেছি। কিন্তু তাদের কারো চোখেই কখনই সেই দৃষ্টি দেখি নি যা এই আমার প্রতিবেশিনীর চোখের তারায় দেখতে পেয়েছিলাম। সেই চাহনির অর্থ বুঝি এমন ক্ষমতা আমার তখন অঙ্কুরিত হয় নি, কিন্তু প্রকৃতির লালনে পালনে নিশ্চয়ই কোনো জাদু আছে না হলে সেই দৃষ্টি যে আমাকে বিদ্ধ করল, সেই চাহনি যে আমার অন্তরের গভীরে ঢেউ হয়ে ছলকে উঠলো, তা আমার বোকা মন টের পেল কি করে? দূর থেকে দেখেই ফুলের গন্ধ অনুভব, চোখের পল্লব পতনে কবিতার ছন্দ আর, গ্রীবার ভঙ্গিতে মনের মধু-প্রস্রবণ যদি অনায়াসে ধরা পড়ে তাহলে সে কি প্রকৃতির কারিকুরি নয়? ধরিত্রীর অতল গভীরে যখন আগ্নেয় উষ্ণতা নড়ে চড়ে ওঠে, বাইরে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ার ব্যাকুলতায় আঁকুপাঁকু করে তখন কি ধরিত্রী-দেহের পর্বে পর্বে পরতে পরতে তার অনুরণন ছড়িয়ে পড়ে না? বাইরের দণ্ডায়মান শুষ্ক পাথর আর সজীব বৃক্ষরাজির দেহ-মনেও তো একটা শিহরণ লেগে যায়, অবুঝ, অজ্ঞাত অনাস্বাদিতপূর্ব? এটাই কি প্রেম, এই শিহরণ? না কি প্রেমের অনাগত-আগমনী পদধ্বনি?

সেটা প্রেম ছিল না প্রেমের পদধ্বনি ছিল তা তখনও যেমন টের পাই নি, এখনও, এই এতদিন পরেও স্মরণের অতল থেকে তুলে চোখের সামনে মেলে ধরেও যে বুঝতে পারছি তা বলতে পারি নে। ঘাসের দীর্ঘ সবুজ শিষের ডগায় যে বর্ণসুষমাটুকু প্রজাপতি হয়ে দেহ তার রাখে, এবং সেই নৈকট্যটুকু যে সূক্ষ্ম শিহরণটুকু তিরতির করে ছড়িয়ে দেয়, আন্দোলিত করে, শাখারাজির দেহে-মনে, সে কি প্রেম? সে কি মিলন সন্ধিক্ষণের মন-দেওয়া-নেওয়া? তখনও জানা সম্ভব হয় নি, এখনও নয়। প্রকৃতির বুকে অহরহ এমন অনেক মন-দেওয়া-নেওয়ার অফুরন্ত মিলন মুহূর্ত প্রতিনিয়তই ঘটছে। ঘটছে, কিন্তু প্রকৃতির মনে রাখার দায় নেই বলেই বোধহয় তারা অনন্তের মধ্যে হারিয়ে যাচ্ছে। এবং হারিয়ে যাচ্ছে বলেই আবার ঘটছে, ঘটতে পারছে। মানুষের দায় আছে মনে রাখার, এ-দায় তার স্বভাবের মধ্যেই সত্য হয়ে আছে। তাই প্রায় পঞ্চাশ বছর পার হয়ে এসেও সেই সদ্য

তরুণ চোখের তারায় কিশোরী প্রজাপতির দৃষ্টিপাতের শিহরণ সমান সতেজ থেকে গেল। দীর্ঘ জীবনের যাত্রাপথে দিন মাস বছরের পদতাড়নায় অনেক ধুলো, অনেক জল, অনেক কার্বন-ডাই-অক্সাইড উৎক্ষিপ্ত হয়ে হয়ে সামনের দৃষ্টিপথকে আচ্ছন্ন করে দিল, অতীতের অনুভবগুলোকে ধূসর করে ফেলল, কিন্তু এ-সবের মধ্যেও সেই ক্ষণটি তো কৈ হারিয়ে গেল না! অনাদি অনন্ত কালের মধ্যে কোনও ঘটনাই তো আর দ্বিতীয়বার ঘটে না, কিন্তু অনুরূপ তো ঘটেই, ঘটেই চলে। একের জীবনে না ঘটলেও বহুর জীবনে অবশ্যই ঘটে। ঘাসের সবুজ শীর্ষের আহ্বানে যেমন অনন্তকাল ধরেই চলছে তেমনিই চলছে প্রজাপতিদের সেই দীর্ঘ অন্বেষণ। এ-তো মিথ্যে নয়।

সবুজ পত্র-পল্লবের অন্তরাল থেকে যখন কুঁড়িটি হয়ে প্রকাশ পায় তখন কি সে প্রেমের আশীর্বাদ হয়ে অস্ফুট কলিতে প্রেমাস্পদের জন্যে ক্রমশই নিজেকে ফুটিয়ে তুলে রূপে-গানে-গন্ধে মহিমময়ী হয়ে ওঠে না? সেই কুঁড়িটি তখন বাসন্তিক তপনের তরুণ কিরণে নিজেকে রাঙিয়ে তোলে, ভোরের মৃদু-মন্দ বাতাসের দোলনায় দুলে দুলে ছন্দের স্বাদ গ্রহণ করে আর উন্মোচিত পাপড়ির বুকে শিশিরের সিঞ্চন ঘটিয়ে গুঞ্জরত মধুবাহিকে মৌ মৌ মৌমাছিদের জন্যে আস্পদ করে প্রেম স্পর্শের জন্যে উন্মুখ করে রাখে। অথবা, গাছ সবুজের বুক খুঁড়ে আত্মপ্রকাশের সময়ে বর্ণসম্ভারে সমুজ্জ্বল কিশলয় যখন তার সর্বাঙ্গে বসন্তের দক্ষিণে বাতাস মেখে কলহাস্যমুখর আনচান করে তখন কি সেও প্রেমের প্রকাশ নয়? সমুদ্রসৈকতে বেলা ভূমির অনন্ত অপেক্ষায় বার বার সাগরের জলরাশির দৌড়ে দৌড়ে আসা আর বক্ষলগ্ন হওয়ার মধ্যে যে প্রেম আলিঙ্গন, যে প্রেমের অবগাহন সে কি চিরকালীন নয়? অথবা প্রান্তিক প্রসারিত নদীপ্রান্তের বনরাজির সবুজ আর নিঃসীম আকাশের নীলের যে সনাতন মিলন সেও তো অসীমের প্রেম সসীমের সবুজে।

প্রেম নিয়ে এত কাব্য করে বলার কি আছে? আছে, অবশ্যই আছে। প্রেম নিত্যই কাব্যময়, প্রেম জীবনে ক্ষণস্থায়ী এবং প্রেম মৃত্যুতেই চিরজীবী। পদ্মপাতার বুকে শিশির-বিন্দুর প্রেম সেই কারণেই চিরসত্য। প্রকৃতির বুকে যে অহরহ প্রেমের খেলা চলছে সেখানে স্বার্থের সুর নেই, ঘর-বেঁধে দীর্ঘজীবন দানের আর্তি নেই, নৈর্ব্যক্তিকতার প্রয়োজনবোধ দিয়ে কলুষিত করার প্রচেষ্টা নেই। মানুষের প্রেমে স্বার্থের ছোঁয়া লাগে বলেই তা প্রেম নয়। মানুষের প্রেম দেহ-গন্ধী, স্বার্থের সুতোয় আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধা পড়ে প্রেম হারাতে বাধ্য। যুবক যুবতী যখন প্রেমের টানে কাছাকাছি আসে তখন সেই প্রেমকে তারা ঘড়ায় বন্দি করে তৃষ্ণা নিবারণের চিরায়ত উপায় করে তুলতে চায়, ঘর বেঁধে চার দেওয়ালের সীমায় সেই প্রেমকে গৃহবন্দি করে নিজের নিজের সুখ-সমৃদ্ধির পাথেয় করে তুলতে মনোযোগী হয়ে ওঠে। কল্পনার তুলি দিয়ে তারা পরিকল্পনার কাগজ-কলম নিয়ে বসে যায়। মানুষের স্বভাব হিসেবের খাতাকেই বেশি মূল্য দেয়, লাভ-লোকসানের খতিয়ান তাই প্রেমের অপমৃত্যুর নিদান হাঁকে। প্রকৃতির খেলায় হিসেবের প্রশ্নই নেই, লাভ-লোকসানের কোনও খতিয়ানই সেখানে কাজ করে না। তাই প্রেম সেখানে মুক্তি পায় সহজেই, সত্য হয়ে উঠতে পারে অনায়াসেই।

তাই আমার মনে হয় আমার দীর্ঘ জীবনে প্রেম ঐ একবারই এসেছিল। আমার জীবন তখন সবে মাত্র পত্রপাতাটি হয়ে পরিবারের গণ্ডি ছেড়ে অপরিচিতের পরিসরে ছড়িয়ে দেবার সুযোগ

পেয়েছিল। আর তখনই কিশোরীর দৃষ্টি হয়ে শিশির বিন্দুর মতো নিঃশব্দ সঞ্চরণে সদা উদ্ভাসিত আমার সত্তায় স্থান করে নিয়েছিল। মুক্তাবিন্দুর মতো এখনও ফিরে তাকালে সেই প্রেমের টলটলে নড়াচড়া বুঝতে পারি, যেন দেখতে পাই, যেন হারিয়ে গেছে বলেই সেই প্রেম-অনুভব এখনও সত্য হয়ে কথা হয়ে সাড়া দেয়।

তার পর বহু বছর পার হয়ে গেল, যুগ হল অতীত এবং এক সময়ে হঠাৎই অফিসের দপ্তরী ঘণ্টা বাজিয়ে জানান দিয়ে গেল হিসেবের খাতায় সময়ের শেষ দাঁড়ি কাটা হয়ে গেছে। মাথা উঁচু করে সামনে তাকিয়ে দেখলাম সব কেমন আবছা আবছা, ঘাড় ঘুরিয়ে পেছনে তাকাতেই সব কেমন যেন ঝাপসা ঝাপসা মনে হল। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের পরিব্যাপ্তিতে চোখ রেখে অতলান্ত অন্ধকারে আলোর বিন্দু খোঁজা ছাড়া তখন আর করার কি থাকে? সদ্য ফেলে আসা অতীত তো এখনও বিক্ষুব্ধ, তাই দূর অতীতে জীবনের অন্বেষার সম্ভব কি না তাই দেখতে গেলাম। আর তখনই জল জল করে দৃষ্টির সামনে ভেসে উঠলো আমার মুক্তা বিন্দুটি। স্বার্থ চেতনা তখনও দানা বেঁধে ওঠেনি, কল্পনার কিশলয় পল্লবের আড়াল ছেড়ে সবে উঁকি ঝুঁকি দিতে শুরু করেছে, পরিকল্পনার স্থান ঘটে নি সেই অতোটা কাঁচা বয়সে, প্রকৃতির আপন ঘরের নীতি-নিয়মে সদ্য বেড়ে ওঠা সবুজের ছোপ তখন পড়াশোনার চাপ পার হয় নি। তখনই প্রথম মনে হল জোনাকির শান্ত আলোর দীপ্তিতে একটি প্রাপ্তি আমার জীবনে সত্য হয়ে আছে।

তার পরে যৌবনের ঝঞ্ঝাঝাপটানির মধ্যে চোখের সঙ্গে চোখের মিলন হয়েছে, হৃদয়ের তাপ বাষ্প হয়ে অন্তরকে আলোড়িত করেছে, অন্তরের আলোড়ন মনের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে করাঘাতের পর করাঘাতও করেছে। কিন্তু সেই সব হেউ-হেউ দিনে হিসেব-নিকেশ লাভ-লোকসানের জাবেদা খাতাখানা মুখ উঁচু করে আমার বর্তমান-ভবিষ্যতের দিকে অপলক তাকিয়ে থেকেছে। তাই সেখানে প্রেমের আনাগোনার অবকাশ ঘটে নি। তারও পরে ভালবেসে বিয়ে করেছি, সংসারের কথা ভেবে পরিকল্পনা করেছি আর ভবিষ্যতের দিক-নির্ণয় করে অঙ্ক করেছি। সেখানে ঘর বাঁধার প্রবণতা স্রোতের যোগান দিয়েছে, পাখিদের নীড় রচনার আগে যেমন প্রবৃত্তির পর্ব চলে, আর সেই প্রবৃত্তি পর্বে প্রকৃতি গতি-স্রোতের যোগান দেয়। ঘড়া নিয়ে জল তুলতে যাবার প্রেরণা আসে নিশ্চিত তৃষ্ণা নিবারণের প্রয়োজনবোধ থেকে। সেই প্রেরণার মূলে প্রেম নয় প্রকৃতি ঠাকরুন অবস্থান করেন!

প্রেমের সঙ্গে অ-প্রেমের প্রধান প্রভেদ বোধহয় এইখানেই যে প্রেম হাবুডুবু খাওয়ায় আর অ-প্রেম ব্যক্তিকে ডুবিয়ে দেয়, মানুষ ডুবে যায় কাজের মধ্যে, সংসারের সমুদ্রে, লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সিদ্ধির বাসনায়। এক-মন এক-প্রাণ হয়ে মানুষ তার ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে পারে, গড়েও থাকে। সর্বত্রই স্বার্থের সুর, প্রয়োজনের তাগিদ, আকাঙ্ক্ষার আগুন মানুষকে প্রেরণা যোগায়, ঠেলে নিয়ে যায়। এমন কি মন্দির-মসজিদ প্রেমও অন্যরকম নয় : সেখানেও 'দেহি' 'দেহি'-র অঞ্জলিটি সামনে প্রসারিত থাকে। কখনও শান্তি, কখনও সম্পদ, কখনও সমাধান। রামকৃষ্ণ-চৈতন্য-বুদ্ধেরা ব্যতিক্রম : তাঁরা হাবুডুবু খেয়ে নিজের নিজত্বটুকুকেই প্রেমাঞ্জলি দিয়ে ফেলেন। সে সব ক্ষেত্রেও দেখি ভূমিকম্পের মতো সৎ-চিৎ-আনন্দময় অন্তরের অভিব্যক্তি নিমগ্ন চেতনা পেয়ে যায়। এই সব প্রেমে তৃষ্ণার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় ঘটে যায়, এদের স্বভাবের অন্তরমহলেই মানব-প্রেম বা ঈশ্বর-প্রেমের বীজটি পত্র-পল্লবে-পুষ্পে প্রকাশ হবার জন্যে সময়ের প্রতীক্ষা করে থাকে।

প্রেম আর অ-প্রেমের দ্বিতীয় প্রভেদ বোধহয় দেহাতীত এবং দেহবদ্ধতায়। চাঁদের টানে সাগরের বুকে যে প্রেমের জোয়ার ওঠে সেখানে দেহগততা নেই, পাখির গানের জন্যে অরণ্যের অপেক্ষার মধ্যে দেহ সম্পর্ক কোথায়? শ্রীচৈতন্যের চেতনায় শ্রীকৃষ্ণের উপস্থিতি দেহজ নয়, দূর চক্রবালে তন্বী শ্যামা বনরাজির সঙ্গে দূরপ্রসারী অনন্ত নীলের যে শাশ্বত প্রেম সেও তো দেহজাত নয়। দেহের সুতোয় প্রেমের ঘুড়িকে যখন আমরা কাছে টানি তখনই তা স্বার্থের সীমায় প্রাণত্যাগ করে। দৈনন্দিনতার ঘেরাটোপে আটকা পড়ে প্রেম তার কলকল্লোল হারায়, প্রয়োজনের দাগকাটা শিশিতে সে সেবা হয়ে ওঠে যায়। তখনই সে আমাদের ডুবিয়ে দেয়, চেতনার গভীরে অবস্থান করে শান্ত আলোর দ্যুতিতে আমাদের মনকে জাগ্রত রাখার অবকাশ পায় না।

তাই ভালবাসা আর ভাললাগা আসে জীবনে বার বার, আসে প্রতিদিনরাত, সাগরের ঢেউ-এর মতো তার ওঠাপড়া। প্রেম আসে জীবনে একবারই। তাজমহল সে একটাই, দ্বিতীয় বা তৃতীয় বার সে হতে পারে না আরো আরো তাজমহল। প্রেমও তাই এক ফোঁটা শিশির বিন্দুর মতো শুভ্র সমুজ্জ্বল, ঝিনুকের বুকে মুক্তাবিন্দুর মতো অসীমের রূপ সসীমের গর্ভে, নীল আকাশের অন্ধকারে একটি মাত্র নক্ষত্রের মতো কৃষ্ণবর্ণ কর্মজীবনের আঁচলে খচিত আলোর বিন্দুর মতো। বহু বছরের ওপার থেকেও তাই প্রেমকে চেনা যায়, দেখা যায়, জানা যায়। প্রেম বিন্দুতে সিন্ধুর অনুভবটি ধরে রাখে। সেই অনুভবে ফিরে যাওয়াটাও তো প্রেমই!

সহজে-কঠিনে :

আমরা সকলেই অনেক অনেক কঠিন কাজ করে থাকি। কঠিন কাজ করা যে কত। কঠিন তা আমরা রোজই বুঝে যাই, প্রকাশও করি অন্যের কাছে, সকলের কাছে। প্রকাশ করে এক ধরনের আনন্দ বোধ করি। আর এই আনন্দকে বাড়িয়ে তুলতে যে কাজটুকু করে থাকি তার কাঠিন্যকে নানান বর্ণনায় নানাভাবে বাড়িয়ে দেখাতে চাই। বাড়িয়ে দেখাতে চাই একথা ভেবে যে অন্য আমার সম্পর্কে বেশ একটা বড় ধারণা করবে। নিকটজন, আত্মীয়জন, বন্ধুজনের কাছে নিজের মূল্য বেড়ে যাবে। তার পরে হাঁসফাঁস করি, পাখার নিচে বসি অথবা হাতপাখা চালাই এবং বলি, 'একটু গরম চা হলে ভাল হত!' সব মিলিয়ে যে কঠিনটুকু পার হয়ে এলাম সেই কঠিনের কাঠিন্যকে অন্যের কাছে বেশ বাস্তব করে তুলে ধরতে চাই।

ছোট বেলা থেকেই এই কঠিনের সামনা সামনি হতে হতে আমরা আমাদের আমিগুলোকে নোতুন মাত্রা দিতে থাকি। কঠিন অঙ্কটি করে খাতাখানা বাবার চোখের সামনে তুলে ধরি, কঠিন পরীক্ষাটি পাশ করে লাফাতে লাফাতে বাড়ি ফিরি, কঠিন চাকরিটি সংগ্রহ হলে আনন্দে আটখানা হই। তার পরে সংসার জীবনের অনেক অনেক কঠিন কাজ সেরে এসে গামছা দিয়ে বুকের ঘাম মুছি, রুমাল দিয়ে মুখের ক্লান্তিকে শুষে নিতে চাই আর তার পরেই গড়গড়ার নল মুখে পুরে অথবা সিগারেটের প্রান্তটি ঠোঁটে লাগিয়ে ধোঁয়ার কুণ্ডলী ছড়িয়ে দিয়ে জানাতে চাই যে অত্যন্ত কঠিনকেই নিজের চেষ্টায় সমাধান করে ফেলেছি।

সারা জীবন কঠিন কঠিন কাজ করে করে আর দেখে দেখে, শুনে শুনে, খবরের কাগজের পাতায় চোখ বুলিয়ে বুলিয়ে জেনে গেছি যে কঠিন কাজের তালিকা শেষ হবার নয়। জেনে গেছি যে একজনের কাছে যা কঠিন অন্যের কাছে তা কঠিন নাও হতে পারে, বুঝে গেছি যে জীবনের সব কঠিন কাজের চাইতেও জীবন নিজেই অনেক বেশি কঠিন। আবার এখন যখন জীবনের সব উঁচু-নিচু কঠিনগুলোকে একে একে পার হয়ে এসে নদীর ওপারের কাউন্টারে দাঁড়িয়ে ওপারের টিকিট সংগ্রহের জন্য লাইন দিয়ে অপেক্ষা করছি তখন মনে হচ্ছে যে জীবনের সব থেকে কঠিন কাজটাই কখনও সঠিক ভাবে করতে পারি নি: সহজ কথাটাকে সহজ করে বলাটাই সব থেকে কঠিন, আর, আমরা কজনে সেই কাজটা করতে পেরেছি?

বেশিরভাগ লোকই যা বলে তা আসলে বলতে চায় না, বলতে চায় অন্য কিছু, বোঝাতে চায় অন্য আরও কিছু। "সোজা কথা আমি ভালবাসি, বলতেও ভালবাসি, শুনতেও ভালবাসি," বলেও কিন্তু সোজা কথা বাঁকা পথে বের হয়ে আসে, সহজ কথা ঘোর প্যাঁচের মাঝ থেকে তার মনে ঢোকে। আমরা বেশিরভাগই তো 'কাঁহাকে উড়ুর মাইরে দক্ষিণ'-এর পথিক! সব সময়েই যে আমরা সহজকে ইচ্ছে করে জটিল করি তা নয়, সোজাকে ইচ্ছে করেই বাঁকিয়ে ফেলি তা নয়, এমনটিই যেন হয়ে যায়, মটে যায়, বেরিয়ে যায়! জলের পাত্রে কাঠিটি ডুবিয়ে দিলে জলতলে যে বাঁকটি তৈরি হয়—refraction যাই—তা তো কাঠির ভেতর থাকে না, জলের চাপেও হয় না! আমাদের সহজ কাঠি-কথাও অন্যরের জল-মনে প্রবেশের মুখে বেঁকে-চুরে যেতে পারে। আমাদের নিজের মনের মাঝেও তো অনেক দিশেহীন, বাধা বিপত্তি, জটিলতা ওত পেতে থাকে। ইচ্ছা-আকাঙ্ক্ষা-উচ্চাশা আছে, আছে আবেগ-অনুভব-কল্পনা, এবং চিন্তাভাবনার টানাপোড়েন। তাহলে যে কথাকে সহজ বলে মনের একটি কক্ষ থেকে বাইরে আসার অনুমতি দেই, বেরুবার মুখে সেখানেও তো refracted হবার সম্ভাবনা কম নেই! মনের বিভিন্ন প্রকোষ্ঠের 'ঘুলঘুলি' 'মস্তক মুকুল' ইত্যাদির স্পর্শ পেয়ে যখন কথাটি সাজসজ্জা করে বাইরে আসে তখন তাকে কি আর চেনা যায়? সে কি আর সহজ থাকতে পারে? বক্তার মনেও যা শ্রোতার মনেও তো সেই ঘরের মধ্যে ঘর, প্রতি দরজায় স্পর্শ, আশীর্বাদ, আবাহনের ব্যবস্থা সদা জাগ্রত!

এর সঙ্গে যোগ হয় ভাষা, ভাষার নীতিনিয়ম—শব্দ চয়ন, ক্রমপদ, কণ্ঠের ওঠাপড়া, সরল-জটিল চলন—এবং বক্তার অঙ্গ-সঞ্চালন, যেমন চোখের কুঞ্চন-প্রসারণ-সঙ্কোচন, হস্তাঙ্গুলাদির অবস্থান-পরিবর্তন-ঝংকার ইত্যাদি। সব মিলিয়ে যা বলতে চাই তাকে বলে দিতে চাই, যা বলতে চাই না তাকে আড়াল করে তুলতে চাই, সমুহ উদ্দেশ্যকে সামনে রাখি, দূরবর্তী অভিপ্রায়কে সঙ্গোপনে অন্তরালে করে রাখতে চেষ্টা করি এবং ইত্যাদি। এই করতে গিয়ে সহজ নিজেকে হারায়ই শুধু নয়, জটিলকে আলিঙ্গন করে সব ব্যাপারটাকেই কঠিন করে তোলে। সব সময়েই তো আমাদের মনে ভয়—এমন করে বললে ও কি মনে করবে, অমন করে বললে কেমন শোনাবে, তেমন করে বললে কেমন হয়!

দীর্ঘদিন ধরেই জেনে এসেছি যে ভাষার কাজ মনের ভাব প্রকাশ করা, এখন টিকিটের লাইনে দাঁড়িয়ে ভাবতে হচ্ছে ভাষার প্রধান কাজ বোধহয় ভাবকে গোপন করা, সভ্যতার জামাকাপড় পরিয়ে, ভাবমঞ্চের হিসেব নিকেশে, শব্দজালের বাঁধনে ভাষা আমাদের উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার মাত্র! ভাষার কাজ ভাবকে কঠিন করে তোলা, জটিল করে তোলা। এটা মানুষের নিজের স্বভাবের জন্যে

সত্য। প্রকৃতিতে ভাষার সমারোহ নেই তাই সেখানে ব্যাকরণ নেই, অভিধান নেই, নেই কোনও কোষগ্রন্থের ভার। পাখির কণ্ঠে, বনের মর্মরে আর বাতাসের বাজনে যে স্বচ্ছ-শব্দ ভাষা সে ভাষায় সহজ-কথা সহজ করেই প্রকাশ পায়, কঠিনের সেখানে স্থান নেই, সব জটিলতাই সেখানে আপনা আপনি খুলে খুলে সোজা সরল হয়ে প্রকাশ হয়ে পড়ে।

মানুষের ক্ষেত্রে মনটাই তার বাসের আস্তানা, ভয়ের ভিত্। দুঃখের ভয়, মৃত্যুর ভয়, হারানোর ভয়—শত ভয়, সহস্র উৎকণ্ঠা এবং লক্ষকোটি আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মানুষের জীবন স্বতঃই জটিল। আর তাই সে সোজা কথা সোজা করে বলতে পারে না, কঠিন করে তোলে। সে কঠিনের আড়াল খোঁজে নিজেকে প্রকাশ করার, নিজের অহংকে বাড়িয়ে তোলার আর প্রকৃত উদ্দেশ্যকে লুকিয়ে পাচার করার জন্য। এই করতে গিয়েই সে জটিলকে করে তোলে জটিলতর, কঠিনকে করে তোলে কঠিনতর। সহজ তার জীবন থেকেও যেমন শতহস্ত দূরে সরে যায়, তার কথা বলার অভ্যাস থেকেও হারিয়ে যায়।

সহজের এই হারিয়ে যাওয়া বা নিরুদ্দেশ যাত্রা ধীরে ধীরে ঘটে, কিন্তু ঘটে অনিবার্যভাবেই। একজন পুত্র তার মনের সহজ বাসনাটি সহজ করে পিতার কাছে জানাতে পারে না, উচিত-অনুচিত বিচারের ভয় থেকে শুরু করে শাসন-ধমকের ভয়, এমন কি মায়ের ভয়টিও তখন মিথ্যে হয়ে যায় নি। কন্যা তার মনের কথাটি মায়ের কাছে খুলে বলতে পারে না। ভয় সেই একই। আবার সময়ের মার খেতে খেতে একদিন এমন সময় আসে যখন সেই এককালের দোর্দণ্ডপ্রতাপ পিতা তার মনের অনেক সুপ্ত বাসনা তার তখন-তরুণ-কিন্তু-এখন-সংসারের-কর্তা পুত্রের কাছে সোজাসুজি বলতে পারেন না। সেই ভয়! ভয়, পাছে নাকচ হয়ে যায়। রুদ্রাক্ষ-মালা-গলায় সেই জননী এখন সেদিনের সেই মেয়ের কাছে সহজ দুটি কথা বলতে কুণ্ঠা বোধ করেন। ভয়! ভয়, যদি বিরূপ মুখ নেতিবাচক উত্তর শুনতে হয়! শৈশব থেকে শুরু করে সেই যে ঘুরপথে প্রকাশের পথ খুঁজতে হয়, সেই ঘোরপ্যাঁচ থেকে বার্ধক্যের নামাবলি গায়ে চড়িয়েও ছাড় পাওয়া যায় না। অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায় বাকটীর প্যাঁচঘোঁচ, জটিল পথ, কুটিল পন্থাগুলো। প্রকৃতির খোলামেলা আকাশের প্রেক্ষিতে জীবন নিজেকে সহজ করে ছড়িয়ে দিতে পারে, প্রকাশের জন্য ঘোর প্যাঁচের দরকার সেখানে অনাবশ্যক। কিন্তু সভ্যতার দীর্ঘ ইতিহাসের ভাল-মন্দ, উচিত-অনুচিত, করণীয়-অকরণীয় শতসূত্রের সহস্র টানাপোড়েনে মানুষের জীবনে তাই প্রকাশের ভাষা গানের সুর হারায়, সহজ কথা সুতোর টানে-টানে জড়িয়ে জটিল হয়ে যায়, ভয়ের দুর্দিনে মনের ভাব ঘুরপাক খেতে থাকে। তাই সহজ কথা সোজা করে বলার উপায় কোথায় সভ্য মানুষের? সব সোজা কথাই কঠিন হয়ে যায়।

পিতা-পুত্র, মাতা-কন্যা ছাড়াও মানুষের অনেক অনেক সম্পর্ক-সূত্র আছে। স্বামী-স্ত্রী, কন্যা-জামাতা, ভাই-ভাইপো, বন্ধু-বন্ধুপুত্র-বন্ধুকন্যা, অফিসের বড়বাবু-ছোটবাবু, সহপাঠী-সহপাঠিনী, সহকর্মী-সহকর্মিনী এবং আরও কত। স্বামী-স্ত্রীর 'তোমার-আমার-আমার-তোমার' মতো অর্ধ-অঙ্গ-পূর্ণ-প্রকাশ সম্পর্কের ক্ষেত্রেও সারাজীবন অনেক সোজা কথাই জটিল-কুটিল-বক্র হয়ে হয়ে জমা হয়ে যায়। অন্য সব ক্ষেত্রে যে তা কত সহজেই হতে পারে তার জ্বলন্ত ইতিহাস তো আমরা সকলেই। ভাল কথা বলতে গিয়ে বিপরীত ফল আমরা অনেকেই হাতে নাতে না পেলেও

গেছে-যে-কি তাতে কোনও সন্দেহ নেই। একটা সোজা-সরল কথার যে কতো রকমের 'মানে' হতে পারে তার বৃত্তান্ত শুনে আমরা অনেকেই হাঁ হয়ে গেছি বা মাথায় হাত দিয়ে ভাবতে বসেছি যখন অর্থের কুণ্ডলী পাকিয়ে পাকিয়ে সেই কথা পাক খেতে খেতে আবার আমাদেরই দিকে আক্রমণ করেছে! এ-সব তো বানানো কথা নয়, সাক্ষাৎ অভিজ্ঞতার কথা। তাই সোজা ভেবে যে কথাটা সহজ করে কাউকে বলা হল সেটা যে সোজাই হল তার নিশ্চয়তা কিন্তু কখনই পাওয়া গেল না। তাহলে সোজা কথা বলাটাই অত্যন্ত কঠিন নয়?

তাছাড়া এই লেখাটাই দেখুন না। সোজা করে, সহজ করে বলাটা কঠিন—এই সহজ-সরল কথাটাকেই সহজ করে এতক্ষণেও বলে উঠতে পারা গেল কি? অনেকেই অনর্থ করবেন, অনেকে মুখ বাঁকাবেন, অনেকে বিদ্রূপ মন্তব্যও করবেন। কঠিন কথাকে কঠিন করে বলা সোজা, কঠিনতর করে বলার মধ্যে অবশ্যই দার্শনিকতা বা পাণ্ডিত্য আছে। কিন্তু সহজ কথাকে সহজ করে বলতে গেলেই তা সুকুমার রায় হয়ে যাবার সম্ভাবনা থাকে, অথবা আবোল তাবোল হয়ে দাঁড়ায়। ঔপন্যাসিকেরা জটিলকে নিয়ে নাড়াচাড়া করেন, তাদের সৃষ্টিতে তাই জটিলের সুতো টানাটানি, চরিত্রের লুকোচুরি, ঘটনার ঘনঘটা। ছোটগল্প লেখকেরা জীবনের টুকরো খণ্ডের মধ্যে তাৎপর্যের আয়োজন ঘটাতে ব্যঞ্জনার ডাও খুলে বসেন। কবিরা সোজা অনুভবকে গভীর করে বলতে অভ্যস্ত। সর্বত্রই দেখুন সহজকে সাদামাটা পরিবেশনের ব্যবস্থা নেই। নেই কারণ জীবনেই তো তার বন্দোবস্ত নেই। জীবনটাই যে জটিল, সোজা পথ সে কখনই নিজের পথ বলে মনে করতেই পারে না।

মনে যে করতে পারে না তার কারণ বোধহয় এই যে জীবন নদীর মতো। এঁকে-বেঁকে চলাটা তার স্বভাবের মধ্যেই পড়ে। জীবনের যেমন দুটি বিন্দুই সব—জন্ম বিন্দু আর মৃত্যুবিন্দু নদীরও তেমনি দ্বি-বিন্দু জীবন—উৎস আর মোহনা। সে দিক থেকে উভয়ের জীবনই সরল-সোজা হবার কথা, কিন্তু তা হবার নয়। নিজের নিজের স্বভাবের জন্যে, গতি-প্রকৃতি আর দ্বন্দ্ব গভীরের তাপের জন্যেই এরা পাক খেয়ে খেয়ে, এদিকে ওঁকিয়ে ওদিকে ঘুরে সামনের দিকে এগোতে থাকে। সহজ আর সরলে তুষ্ট নয়, পাড় ভাঙা মোড়ন জীবনের স্রোত তৈরি করে নিজের নিজের পিঠে জীবনেরই দাগ শোষন করার বাসনা এদের পেয়ে বসে। একদিকে যেতে যেতে এরা হঠাৎ হঠাৎ দিক পরিবর্তন করে, যাবে দক্ষিণে তো চলন শুরু করে বিপরীত-বিরুদ্ধ দিকে। কখনও খেলার মেতে উচ্ছল হয়, কখনও সংগ্রাম সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ে তীব্র থেকে তীব্রতর আঘাত হানে। সহজ সোজা পথটি ছেড়ে অনবরতই আসে পাশে ঘুরে বেড়ায়। এবং শেষ কালে যখন সেই শেষ বিন্দুতে এসে পৌঁছায় তখন অবশ-নিস্তেজ দেহ-মন নিয়ে বারে বারেই ভাবে: সহজ পথটুকু আর সোজা করে পার হওয়াই হল না।

হবার নয় বলেই যে হল না তা বুঝতে সকলেরই এক জীবন সময় লাগে। সময়টা হলেই বোঝা যায় যে যাকে সহজ কথায় প্রকাশ করা যায় বলে মনে হয় তাকে সহজে প্রকাশ করার সুযোগই ঘটে না, আর বোঝা যায় যে সহজ কথাটাই সব থেকে কঠিন কথা।

মৃত্যুটাই সব থেকে সহজ কথা এবং সব থেকে কঠিন কথা। জন্ম আমরা জানি না, অনুমান করি মাত্র, মৃত্যু অনুমানের বিষয় না, প্রত্যেকের জন্যে মোহনায় অপেক্ষা করে থাকে মাত্র। সেই মুহূর্তে আমরা যখন পৌঁছাই তখন তো নিজ নিজ পূর্ণতা নিয়েই পৌঁছাই। এই কথাটাও

সহজতমদের একটি, কিন্তু কি কঠিন হল তার প্রকাশ! সহজ আছে শিশুবে, আছে 'সহজ পাঠ'-র পাতায়, তার পর থেকেই সব কঠিন হতে হতে, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত, কঠিনের ধারাপাত। জীবনের ধারাপাত।

ট্রেন-যাত্রী (লোকাল) :

কাল সন্ধ্যা সাড়ে ছটায় বেন্টিংক স্ট্রিট থেকে ফিরলাম। প্রচণ্ড গরম ছিল। বাসের মধ্যে যেন আগুনের হল্‌কা চলছে। তার সঙ্গে 'ঞ্যাসর্টেড' গন্ধ! হ্যাণ্ডেল ধরা উর্ধ্বমুখ হাত বেয়ে বেয়ে ঘামের ছোট বড় লাইন গড়িয়ে গড়িয়ে কনুইমুখী, ঘাড়ের অনুভব কলারের বেষ্টনীতে ভিজে-কাঁথা, আর শরীরের অবাধ সান্নিধ্যে লেপ্টে থাকা গেঞ্জিখানা যেন জবজবে 'স্পঞ্জ'! স্ট্র্যাণ্ড রোডের জ্যাম নরক-গুলজার করে তুলল। এক সময়ে, কখন যেন, হাওড়া ব্রীজের 'ব্রিজ'—শীতল হাওয়া—জানালার ফাঁক দিয়ে, মানুষের গায়ে গায়ে ধাক্কা খেয়ে খেয়ে প্রাণ জুড়ানো গঙ্গার প্রলেপ বুলিয়ে গেল; বুঝলাম এবারে অস্থিভঠর উদ্গীরণ-মুক্তির ক্ষণ সমাসন্ন। হাওড়া স্টেশন-মুখ চত্বরে তরুণ তরুণ বাসের গর্ভ থেকে তখন শত শত নিত্যযাত্রী প্রবহমান বাতাসের নদীতে ঝাঁপ দিয়েই উর্ধ্বশ্বাস ছুটে চলেছে আর এক অন্ধকূপের দিকে—সাবওয়ে বেয়ে সিঁড়ি দিয়ে ওঠার সময় ফুটোর পরতে পরতে উপরের দিকে চলেছে অগণিত মানুষের ঝাঁক। উদ্দেশ্য? পুনর্বার যন্ত্রযান গর্ভে প্রবেশ এবং গৃহ-অপেক্ষা। ট্রেন যাত্রা।

আমার লেখার বিষয় বাসের মধ্যের জীবন নয়, ট্রেনের মধ্যের জীবন। ট্রেনের 'জার্নি' বা ট্রেন যাতায়াত। কখনও বেশ মজার, কখনও বিস্ময়কর, কখনও মর্মস্পর্শ আবার কখনও আনন্দের। ভারতীয় রেল আর ভারতবাসীর ট্রেন-কালচার, 'সাবার্বান' ট্রেন আর নিত্য এবং নৈমিত্তিক যাত্রীদের বিচিত্র-বিভিন্ন ভাব-ভালবাসা, ঝগড়া-বিবাদ, ঠেলা-ঠেলি হাতাহাতি এবং এই সব 'হাই-ভোল্টেজ' ড্রামার মধ্যে মধ্যে তাসুড়েদের 'ওয়েসিস্', তরুণ-তরুণীদের কোণে-বসা বিচ্ছিন্ন একাকিত্বের ঘনিষ্ঠ নৈকট্য, অথবা জীবন-যুদ্ধে জয়-পরাজয়ের একান্ত উপাখ্যান উন্মোচনকারী মধ্যবয়স্ক-বার্ধক্য-লাঞ্ছিত ব্যক্তি বর্গের পারিপার্শ্ব ভুলে যাওয়া অবগাহন! এবং আরও কত কি যে ঘটে, ঘটেছে তার প্রতি দৃষ্টি দেবার সময়, সুযোগ ও মানসিকতা আমাদের কর্মব্যস্ত দ্রুতগামী জীবনে খুবই কম আসে। একটু দূরত্ব রেখে সে সব দেখা বেশ মজার একটা অনুভব জাগে মনে। নৈর্ব্যক্তিক হওয়াটাই প্রয়োজন। চলুন আমরা বিভিন্ন দিনে বিভিন্ন ট্রেনে ওদের এই ধাবমান জীবনকে দেখার চেষ্টা করি।

যেমন খুশি তেমন দেখাটা কোন দেখাই নয়; একটা 'প্রোগ্রাম' বা পরিকল্পনা চাই তো? বৈজ্ঞানিক দেখা কি অত সোজা! কাদের দেখবেন এবং কোন্ ট্রেন দেখবেন? নিত্যই যারা একই সময়ে একই ট্রেনে করে যান তাঁরা নিত্যযাত্রী, ডেইলি প্যাসেঞ্জার। এঁরাই নিজেদের মজা করে তির্যক শব্দে 'নিত্য পাষণ্ড' বলে আত্মবিজ্ঞাপন দিয়ে থাকেন। এই নিত্য যাত্রীদের অধিকাংশই অত্যন্ত 'উইটি', ফুরফুরে বাকপটু, ভদ্রলোকের ম্যানুফ্যাকচারার। কোনও কন্ম ধার্য না করেই এঁরা সাধারণত গ্রুপ তৈরি করে চিহ্নিত কামরায় অধিষ্ঠিত হন এবং জীবন্ত উপস্থিতি বিস্ফুরিত করতে করতে ইট-লোহা-কাঠ-সিমেন্টের যান্ত্রিক দূরত্বটুকুকে অবহেলায় পার হয়ে যান। এঁরা হাসামুখে

ট্রেনের—এবং জীবনের—অনেক অংশটিকে পরিহাস করে এগিয়ে যান অবসর জীবনের নিশ্চিন্ত একাকিত্বের দিকে। অবসর নিয়েও এঁদের অনেকেই এই অতীত ট্রেন জীবনকে নেশার মতো ধরে রাখেন। কিছুদিন বা অনেকদিন। শরীর-মনের 'কম্পাস' তখন দিক-নির্দেশক।

সদ্য চাকরি পাওয়া ছেলে-ছোকরা-রা সদ্য ফেলে আসা মফস্বলী জীবনের তাল-ছন্দ-লয় নিয়েই ট্রেনের কামরায় নিত্যযাত্রীদের তালিকা বাড়ায়, কিন্তু শ্রেণী-স্বাতন্ত্র্য এদের প্রথম দিকের জীবনকে গোষ্ঠী-কেন্দ্রিক বলয়-চিহ্নে আটকে রাখতে পারে না। এরা অপরের লেগ পুলিং করে, খুনসুটি করে প্রৌঢ়-বৃদ্ধদের উত্ত্যক্ত করে, টীকা-টিপ্পনী কাটে সমশ্রেণীর নিত্য-সাথিদের নিয়ে। তাদের সাজ-পোশাক, চুল-ভুরুর বঙ্কিম-বিন্যাস পরিশীলন (!), উচ্চাকাঙ্ক্ষা অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনা এবং চড়ুই-চড়ুই দৃষ্টি চালাচালি নিয়ে। দুটিপক্ষেরই নয়, নিজেদের মধ্যেই। পড়াশোনার ঝামেলা শেষ, অভিভাবকদের প্রতি কোনও আর্থিক দায় তখনও দানা বাঁধে নি, রেস্তোরাঁ-সিগারেটের দোকান আর পানীয় এদের নরক অতীত থেকে মুক্তির স্বাদ এনে দেয়। ট্রেনের মধ্যে এদের চিনে নিতে অসুবিধা হয় না। চঞ্চল-চপল-উচ্ছ্বাসিতদৃষ্টি, এরা 'কেয়ার-ফ্রি' গোষ্ঠী।

নিত্যযাত্রীরা শুধু কাছেরই নয়, দূরেরও আছে। চার পাঁচ ঘণ্টার দূরত্ব থেকেও বহু নিত্যযাত্রী কলকাতা আসেন। (এঁরা নিজেরাই নিজেদের ব্যঙ্গ করে বলেন যে ছেলে মেয়েদের সংখ্যা এবং আনুষ্ঠানিক তিথিটি এঁদের জানা! মধ্য উচ্চতা চাকুরি করার সময় এঁদের হয় কৈ?) এই দীর্ঘ যাত্রাপথকে এঁরা সহজ করে নেন, ভরাট করে তোলেন। একঘেয়েমি আর থাকে না খোল-করতাল ইত্যাদির শব্দ-ব্রেকে। এঁরা দলগান বাঁধেন, করেন এবং কামরাটিকে মাত করে তোলেন। কীর্তন, টপ্পা, ঠুংরি, গীত, গজল। নানান স্বাদের, নানান অঙ্গের সংগীত সাধনায় এই সব নিত্যযাত্রীর দীর্ঘ পথ এবং সেই পথের অন্যান্য বহু পথিকই তৃপ্ত হন এঁদের এই পরিকল্পিত অনুষ্ঠানসঙ্গীতে।

অনেকেই দলবদ্ধ হয়ে নাটিকা, কিছু কিছু মাত্রায় অঙ্ক 'ট্রেনস্থ' করেন যাত্রাপথকে, দীর্ঘসময়টুকুকে প্রাণস্পন্দন করে তুলতে। কবিতা আবৃত্তি, পাঠ এবং রবীন্দ্রসঙ্গীত নিত্যযাত্রী মহলে বেশ সমাদৃত। আনুষ্ঠানিক গণ্ডীতে নয়, আড্ডার মেজাজে এই সব চলতে থাকে। গুণগ্রাহীর সংখ্যাও যেমন আছে, বিরক্ত হওয়ার সংখ্যাও আছে। রুচি তো বিচিত্র হবেই। তাই এই সব চলমান সাংস্কৃতিক ট্রেনানুষ্ঠান কামরাগুলোতে ভিড় হয় বেশ।

এবারে চলুন তাঁদের একটু দেখি যাঁরা ট্রেনের সকল যাত্রাসময়টুকুই গাম্ভীর্যের মোড়কে নিজেদের আপাদমস্তক মুড়ে রেখেছেন। স্যুটেড্-বুটেড-টাইড। হাতে ব্রীফ কেস, চোখে সুদূরের দৃষ্টি আর গম্ভীরের আড়ালে স্থির রেখে নির্বিষ্ট বসে আছেন। ইংরেজি কাগজখানা অনেক আগেই পড়া হয়ে গেছে, কিন্তু খোলা ধরা আছে সামনে। রেল কেন প্রথমশ্রেণী তুলে দিল?—এই প্রশ্ন যেন সদাসর্বদা আশেপাশের লোকেদের মধ্যে খাঁড়া-উঁচিয়ে সতর্ক পাহারায় মজুত! প্রথম শ্রেণী থাকলে তো আর এই বাদবাকি-আর-সাধারণের সঙ্গে একসঙ্গে যাত্রা করতে হত না! এঁরা শরীরে থাকেন ট্রেনের কামরায়, মনে মনে যাত্রা করেন পুরানো দিনের প্রথম শ্রেণীতে। এঁরা তাই উপস্থিত থাকেন, হাজির থাকেন না। আশপাশের কথা শোনেন (দেখেন না কখনই), কখনও উপভোগ করেন, কখনও বিরক্ত হন কিন্তু কখনই অংশ গ্রহণ করেন না। থেকেও-নেই এই সব জনা-কয় উর্দ্ধ-বিত্ত মহাজনেরা অপরের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে করতে যান, তাদের প্রতি অনাগ্রহ-অসম দৃষ্টিপাত করতে

করতে। এদের বেশির ভাগেরই বাড়ি সুকুমার-বাংলোয়!

এদেরই বিপরীত বর্গকে দেখতে পাবেন কামরাগুলোর মেঝেতে। একটা ময়লা কাপড়ের পোটলা বা ঝুড়ি বা ব্যাগ পাশে নিয়ে কামরায় ঢোকার একেবারে দ্বন্দ্ব-মধ্যিখানে দেয়ালের ধার ঘেঁষে এরা বসে যায়, বসে থাকে। এদের মধ্যে বিভিন্ন প্রকারের ভিখারীরা আছে, দুঃস্থ মহিলারা আছেন, চাল-চালানকারী মেয়েরা আছে। এরা পারতপক্ষে অফিস-সময়টুকুতে গাড়িতে চড়ে না, অনেকের মতেই এরাও অফিস-নিত্যযাত্রীদের সমীহ করে চলে!

আর আছে আপন মনে যাতায়াতকারী যাত্রীরা। এরা দল পছন্দ করে না, দলের শক্তি-কেন্দ্রকে এড়িয়ে চলতে চায়। এরা চুপচাপ একপাশে দাঁড়ায়, দু'চারটে ধাক্কা অবলীলায় সহ্য করে নেয়, পা-মাড়িয়ে দিলেও শুধু পা-টাকে বাঁচানোর মতো করে কষ্টকে ব্যক্ত করে। ক্ষীণ প্রতিবাদ করে মাত্র। ঝামেলা এরা পছন্দ করে না। এরা দরজার কাছে দাঁড়ানোর জায়গা পেলেও সরতে সরতে দূরে সরে যায়, ভিতরে পরিবাহিত হয়। এরা, বলা যায়, গো-বেচারা, অত্যন্ত ভালমানুষের দল।

কিন্তু এদেরই 'কাউন্টার-পার্ট' আছে, এবং তারা অত্যন্ত বিক্রমেই ট্রেনের মুখ, দরজার কাছটায়, অধিষ্ঠিত থাকে। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে প্রায় সারা বছরই দরজার ধারের প্রবহমান তীব্র-ক্ষীণ হাওয়াটুকু পরম তৃপ্তিদায়ক। এরা সেই হাওয়া-ভুক নিত্যযাত্রী অথবা নৈমিত্তিক যাত্রী কিন্তু গায়ের জোর সীমাহীন! অন্তত দেখায় সেরকম।

ট্রেন যাত্রীদের ওঠানামাই যদি বিবৃত না করলাম তা হলে কি আর করা হল? ট্রেনে ওঠাটা অনেকটাই কুরুক্ষেত্র নতুন এবং নামাটা তীর্থদর্শন সমতুল! কলকাতার আসে পাশে যে কোনও 'সাব-আর্বান' স্টেশন প্লাটফরমে আসুন এবং একটু দূরে দাঁড়িয়ে চার দিকে নজর ফেলুন। কলকাতা মুখী যে ট্রেনটা দেখলেন, ওটা স্টেশন ছেড়ে চলে গেল। সেই শকট-সরীসৃপের আগমন, স্থির অবস্থান এবং নির্গমনটি আপনি দেখতে পান নি, প্লাটফরম পেরিয়ে গেছে এমন অবস্থায় দেখছেন ধরে নেওয়া যাক। প্লাটফরম প্রায় ফাঁকা, দু'চারজন ঘর্মাক্ত কলেবর কিয়ৎ পূর্ব-ধাবমান-কিন্তু-এখন-বিফলতার তিক্ত সেবন মুখ করে ধীর পদক্ষেপে সিঁড়ি বেয়ে উপরে উঠছেন। পরের ট্রেন ছাড়া গতি নেই। সম্ভাব্য লাল কালির দগদগে দাগ দেখতে পাচ্ছেন কল্পনার চোখে। অবশ্যই জানবেন এঁরা কোনও না কোন প্রাইভেট সংস্থায় কাজ করেন, মাড়োয়ারী সংস্থা হবার সম্ভাবনাই সর্বাধিক। আর এঁদের পাশাপাশি ঐ যাদের দেখে দুলে তর্জনীর ডগায় লাগেজটা চুলের শির-চুম্বন করতে করতে বন্ধু সমভিব্যাহারে প্লাটফরম মুখী গতিকে মরাল নিন্দিত ভঙ্গি দিতে সক্ষম হয়েছেন ওঁরা অবশ্যই কোনও সরকারী দপ্তরের উজ্জ্বল আধিকারিক হবেন। 'মাইনাসে' 'মাইনাসে' প্লাস হয়, ছোট বেলার স্কুলের অঙ্কের শিক্ষকের কাছে জেনেছি। এখন জানি লালের দাগের ক্ষেত্রেও অনুরূপ নিয়ম, 'লেট' হয় না!

আপন মনে এই সব ভাবতে ভাবতে আর দেখতে দেখতে কখন যেন প্লাটফরমে আবার জন-সমাগম বেশ ভিড় ভিড় আকার নিয়ে ফেলেছে। তাই দেখতে দেখতে শাড়ির নিচে, ঘরের আড়ালে আর সেডের অভ্যন্তরে দলে দলে বিভক্ত লোকেদের আলাপ চলতে শুরু করে। একটা গয়ংগচ্ছ ভাব যেন গোটা প্লাটফরমে ছড়িয়ে ছিটিয়ে পরিব্যাপ্ত। আপনি ভাবছেন এতো লোক কিন্তু কোনও গোলমাল নেই, কলহ নেই, কেমন যেন বেশ সুশৃঙ্খল একটা বাতাবরণ। ঠিকই, কিন্তু ঐ দেখুন!

ট্রেন আসার সংকেত-বাতিটি জ্বলে উঠলো। আপনি কিন্তু বোঝার আগেই কেমন যেন সব তোলপাড় হয়ে গেল। যাত্রীরা মোর্চা নিয়ে নিল। সকলের দরজা-গুলোর অবস্থান, জেনারেল-কামরা কোথায় তা তাঁদের জানা। দেখলেই বুঝে যাবেন, আর মহিলা-কামরা? রং-বেরং এর সমাহার কেমন উড়িয়ে ওড়না-আঁচলে তা আপনাকে জানিয়ে দেবে। জোটবদ্ধ যাত্রী-সেনারা এখন যাকে বলে সঙিন উঁচিয়ে, ব্যাগ বাগিয়ে, কোঁচা সামলিয়ে নিজেদের সম্ভাব্য যুদ্ধের জন্যে প্রস্তুত করে নিচ্ছে। প্রতিপক্ষকে একেবারে ধরবে, এবং সুতরাং ট্রেনের দরজার (যখন ট্রেন থামবে) যথাসম্ভব কাছে থাকার জন্যে যে সুপ্ত ধাক্কা-যুদ্ধ চলে তা দূরের লোকের পক্ষে বোঝা সম্ভব নয়, কিন্তু অনিবার্যভাবেই সেই 'কোল্ড-ওয়ার' চলতে থাকে। যার সকলের দৃষ্টি আগত-ট্রেনটির ধাবমান নম্বরেদের পরিমাপ পরিমাপে ব্যস্ত থাকে। বাইরে থেকে জহুরীর চোখ না হলে বুঝতেই পারবেন না সেই আষ্টেপৃষ্ঠে থাকা পাঠের নয়, নম্বরেদের 'বগি' এর মধ্যে ফাঁক এবং ফাঁকি কোথায় এবং কতটুকু।

তিনটি মানসিকতা এবং দুটি স্রোত। যে মুহূর্তে ট্রেনটি থেমেছে তখনই জানবেন কিছু লোক নামতে চাইছে, বহুলোক উঠতে উদ্যত। এই বিপরীতমুখী স্রোতের সংঘাত, ঠেলাঠেলি, ঝগড়া এবং ঘাত-প্রতিঘাত। ক্ষণস্থায়ী সেই যুদ্ধ। কিন্তু সকল যুদ্ধই যখন মুখ-খোলা। কেবল মুখ খোলে না ট্রেনের দরজার কারণ সেখানে জগদ্দল-অটল দাঁড়িয়ে থাকেন একদল যাত্রী যাঁরা নামবেন না এবং উঠবেনও না, কিন্তু দরজার কাছের হাওয়া-প্রবাহটুকুকে আঁকড়ে থাকার জন্যে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ। তাঁদের পায়ের শক্তি, দাঁড়ানোর প্রকৃতি এবং সর্বংসহা মানসিকতা আরোহী-অবরোহীদের পেষণ-তাড়নায়ও যেমন অটল, যুক্তি-বিজ্ঞানের নিয়মের ক্ষেত্রেও তেমনি অক্ষম!

ট্রেন ছেড়ে দিলেই যে শান্তি তা নয়, যুদ্ধ চলতেই থাকে। কারো চপ্পল চলে গেছে ট্রেনের তলায়, কারো চশমা ছিটকে চলে গেছে অদৃশ্য স্থানে, কারো পকেট ছিঁড়ে গেছে কারো বা ব্যাগের হাতল। ক্ষোভ, চিৎকার, প্রতিচিৎকার চলতে থাকবে। তার মধ্যে 'সোজা হয়ে দাঁড়ান' আর 'সরে দাঁড়ান', 'আমার পা মাড়াবেন না' আর 'হাতটা কেন আনেন!' ইত্যাদি রুক্ষ-কঠিন নির্দেশ, উপদেশ জমজমাট করে তোলে সেই সদ্য তোলপাড় করা নব-নর্মবিন্যাস। পরের স্টেশন আসার আগেই আগের স্টেশনের যুদ্ধ শান্তিতে রূপান্তরিত। এবারে তাঁরাই দরজার মুখ আটকে আছেন যাঁরা আগের স্টেশনে এঁদেরকে অন্যায় বলে ধিক্কার দিয়েছেন। এই রং বদল মন-বদল নিত্য এবং নৈমিত্তিক উভয় শ্রেণীর যাত্রীদেরই প্রকৃতি। প্রত্যেক স্টেশনে এই প্রতিপক্ষের স্বপক্ষে চলে আসাটা এতোই সুবিধাবাদী যে এটা কারোরই বিবেকদংশনের কারণ হয় না। সময়, সুযোগ এবং সুবিধা লোভের বাড়ুক্তির আঘাতে আঘাতে আমাদের নিত্যজীবনের স্ববিরোধ বোধগুলো গুঁড়িয়ে সমান ও সমান্তরাল করে দিয়েছে। যাঁরা ট্রেনে যান না কিন্তু রোজ বাসে-ট্রামে-মিনিতে করে অফিসে যাতায়াত করেন সেই শহরবাসী বন্ধুরাও এই বিবেক-সরলীকরণ-প্রক্রিয়াটির অঙ্কুরের নমুনা রোজ ঠিক পাবেন বাসে-ট্রামে-মিনিতে উঠতে-নামতে।

এবারে আপনাকে কল্পনার দৃষ্টিতে ট্রেনের এবং বাসের ইত্যাদির অভ্যন্তরে একটু নজর বুলিয়ে নিতে বলব। দরজার কাছে যাঁরা অতি কষ্টে পায়ের 'টো' টা রাখতে পেরেছেন এবং সার্কাসের কুশলতায় শরীরটাকে ঠ-একরকম করে ট্রেনের গতির সঙ্গে সামিল করে রেখেছেন, তাঁরা ক্রমান্বয়ে 'একটু ভেতরে চলুন', 'এগিয়ে যান', 'ভিতরে জায়গা থাকতে কেন দরজার কাছে ভিড় করছেন' ইত্যাদি বলে উত্তর-স্টেশন যাত্রীদের অনুরোধ করছেন, ঠেলে দিচ্ছেন অথবা গায়ের জোরে পথ করে

নিতে চেষ্টা করছেন। কেবলমাত্র দরজার মুখটিতেই এই ঝুঁকি-বিপদ-সার্কাসের প্রভাবে একটু-আধটু-নড়াচড়া ছাড়া দেখবেন ভিতরের দিকে দার্শনিক নৈর্ব্যক্তিকতা কেমন টান টান অনড় স্থির হয়ে আছে। ওঁরা যে একই ট্রেনের যাত্রী, ওঁদেরও যে কোনও দিন অনুরূপ অবস্থায় ঝুলতে হতে পারে এবং একই রকম 'এস্-ও-এস্' প্রার্থনার প্রয়োজন দেখা দিতে পারে তা যেন স্বপ্নের সম্ভাবনাও নয়! ভিতরের দু-চারজন, যাঁদের বিবেকবোধ এবং স্বাভাবিক মানসিকতা ট্রেনীয়-সরলীকরণের চাপে এবং তাপে সমান্তরাল হয়ে যায় নি, তাঁরা দু'চার পা সামনে-পাশে ঢুকে যাবেন এবং সেই সামান্য ভিড়-সঙ্কোচনের ফলে যতটুকু স্থানের সঙ্কুলান হয়ে ওঠে তা গড়াতে গড়াতে অনেকটাই হারিয়ে গিয়ে বিন্দু-পরিমাণ গেট পর্যন্ত পৌঁছোবে মাত্র। এবং পরের স্টেশনে এই একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি! [অথবা পরের স্টেশনে!]

কলকাতার সাবার্বান ট্রেনগুলোর চরিত্র এক হলেও ভিড়ের স্বরূপ কিন্তু একরকম নয়। হাওড়া মেন, হাওড়া-সাউথ থেকে আলাদা, আবার এরা আলাদা শিয়ালদহ মেন ও সাউথ থেকে। আর সব থেকে আলাদা বনগাঁ লাইন। বনগাঁর বিপরীত ডানকুনী লাইন। এই প্রভেদের মূলে অনেক কারণ আছে; নিত্যযাত্রীরা কোথায় যান, কেন যান, এবং তাঁদের শতকরা হিসাব আলাদা। তাঁদের বিশ্বাস, মানসিকতা, প্রতিবেশ-প্রীতি, তাঁদের ধৈর্যের সীমা, মেজাজের গভীর-অথবা-ঠুনকো অবস্থা, গতির-এবং-সময়ের হিসেব এবং সব শেষে সামাজিক-পারিবারিক ভাল-মন্দ বোধ, মূল্য বোধ। "আধুনিক সভ্যতা দিয়েছে বেগ, কেড়ে নিয়েছে আবেগ" বলে কোনও সাহিত্যিক মতপ্রকাশ করেছিলেন অনেক দিন আগে। তখন যে পরিমাণ 'বেগ' দেখে অমন বলেছিলেন, আজ সেই বেগ বহুগুণ বেড়েছে, তাই হয়তো প্রভেদের আদিম ঘাটই তীব্র সব আবেগ আবার এসে পড়েছে। বিশ্বাস না হয় বনগাঁ লাইনের কোনও ট্রেনের ভেতরে প্রাত্যহিক কুরুক্ষেত্র দেখে অথবা শিয়ালদহের সাউথ ট্রেনের মধ্যে যে ঝুড়ি-মানুষ, বস্তা-যাত্রীতে তাণ্ডব চলে তা একবার দেখে আসুন। আবেগ কেড়ে তো নেয়ই নি বরং বন্যা বইয়ে দিয়েছে।

আপনারা বলবেন, এবং ঠিকই বলবেন, বেগ-এর জন্যে নয়, ভিড়ের জন্যে এ-সব ঘটছে। জন-বিস্ফোরণ আমাদের মাথা গোঁজার স্থানেই টান ফেলে নি, মনের ধৈর্যে চিড় ধরিয়েছে অনেক অনেক বেশি। সব ভরী ওলোটই অত্যন্ত ছোট হয়ে গেছে। ট্রেনের সংখ্যা, রাস্তার পরিসর, অফিসের চেয়ার, শ্বাস-নেবার বাতাস—সব, সবই ছোট্ট হয়ে গেছে। আপেক্ষিকতার চাপে। কোথাও তাই ঠাঁই নেই। সর্বত্রই অনটন। এই অনটনের চাবুক খেয়ে খেয়ে আমরা ছটফট করছি। আর অকারণ উত্তেজনার ভুল প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে চলেছি। ঝুড়ি-বস্তা আমাদের প্রতিপক্ষ নয়, আমরা যাঁরা অফিস-কাছারি করি তাঁরাও নই ওদের প্রতিপক্ষ। ফুট বোর্ডে যিনি ঝুলছেন আর ভিতরে সিটে যিনি বসে আছেন এঁরা দুজনেই যাত্রী, সকলেই নিজ-নিজ কাজে যাত্রী। সমগোত্রীয়। তা সত্ত্বেও এঁরা অন্যের প্রতিপক্ষ হয়ে, ক্ষণিক হলেও, দিন-দিন-প্রতিদিনই ঝগড়া-সংগ্রাম-যুদ্ধ করে শক্তিক্ষয়, রক্তক্ষয় এবং বিবেকের সরলীকরণ করে চলেছেন। প্রকৃত প্রতিপক্ষ আছেন দূরে, নিশ্চিন্তে, নীরবে। কখনও কোনো লাল বাড়িতে, কখনও কোন শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত কক্ষে, কখনও আরও দূরে, দলে-দলে বিভক্ত হয়ে। পাঁচ বছর অন্তর এঁরা রোদ মাথায় করে, হাত জোড় করে, মাইক্রোফোনের জোরালো কণ্ঠে আমাদের কাছে আসেন, আসবেন। তখন জানাবেন মাছ কাঁটাকে মুড়ো দেবো, কলিজ ডুবিয়ে দুধ খাওয়াবো, রাস্তা চৌরাস্তা করে যাতায়াত ভূমিকম্পহীন করে দেবো,

আর দেবো রাজ-পুত্র বা রাজকন্যা। চাকরির জন্য অফিস দেবো, ব্যবসার জন্যে টাকা দেবো, বাড়ির জন্যে জমি দেবো, এবং দেবো আর দেবের সচন্দন পুষ্প মালা। যে পুজোর যে বিধি। জ্যোতিষী দিলেন এবং তাঁরা অমনি নিরুদ্দেশ হলেন। বর্তমান আমরা সময়যাত্রী-সহযাত্রীগণ। ছোটাছুটির উগ্র-তীক্ষ্ণ-রুক্ষ জীবন। আমরা রাস্তায় একে অপরকে ধাক্কা দেবো। পা মাড়িয়ে দেবো বাসে-ট্রামের ফুট বোর্ডে আর কাকের মতো গলা ফুলিয়ে ঝগড়া করতে থাকব ট্রেনের কামরায় কামরায়। ভাবার আমাদের সময় নেই, না-ভাবতে-ভাবতে আমরা ভাবার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলেছি। যে প্রকৃতির অস্বীকারের ভিত্তিতে আমাদের সভ্যতার পত্তন, আমরা ফিরে চলেছি আবার সেই প্রকৃতির খাসমহলে। সভ্যতার এক প্রকাশ যে বস্তুতান্ত্রিক উন্নতি, সুবিধা সুযোগ, সেখানে প্রভূত পরিবর্তন আর রং-বেরং-এর উপচার সংযোজিত হচ্ছে, কিন্তু সভ্যতার আর এক প্রকাশ যে শীলিত মানসিকতা, ধৈর্য আর সহানুভূতি, সেখানে আমরা ক্রমশই নিঃস্ব, রিক্ত হতে চলেছি।

সোজা কথা বলতে গিয়ে কেন এবং কখন যেন কঠিন বিষয়ে ঢুকে পড়েছি। রণে ভঙ্গ দিয়ে সরে পড়া যাক। আমার বন্ধুটি ঐ অদূরে ফ্যাল ফ্যাল করে আমার এই 'মুড'-পরিবর্তনে হকচকিয়ে গিয়ে থাকবেন। আসুন এবারে আমরা হাওড়া-শিয়ালদহে এই নিত্যযাত্রীদের অবতরণ প্রক্রিয়া এবং হয়রানি প্রত্যক্ষ করি।

ট্রেন সবে প্লাটফরমে ঢুকেছে তো ভেতর থেকে হাঁক উঠবে 'নেমে পড়ুন' 'নামুন দাদা নামুন'! এবং ভিতরের নরগোষ্ঠীর চাপে দরজার ধারে দাঁড়ানো নর-নারীর সেলাইটুকু প্রায় ছিঁড়ে ছিটকে বেরিয়ে যাবার দাখিল! বলুন তো কেন? কিসের তাগিদ, কিসের অভাব? সময়ের? ধৈর্যের? সুস্থ মানসিকতার? অথবা এর সবগুলোই এক সঙ্গে গুঁতো মেরে মেরে আমাদের প্রবৃত্তি-তাড়িত করে তোলে?

দু'রকমের দৃশ্য দেখতে পাবেন। প্রথম, যদি ঐ ট্রেনটিই আবার এখুনি 'আপ'-ট্রেন হয়ে বাইরে যায়। তাহলে তো নরক গুলজার! ভিতরের ক'একশো লোক আর বাইরের কএকশো অপেক্ষারত একই সঙ্গে টাগ-অব-ওয়ার শুরু হয়ে যাবে। প্রথম দলের সময় নেই, অফিস-কাছারিতে দেরি; দ্বিতীয় দলের অপেক্ষার সময় নেই সুবিধামতো বসার আসনটি প্রত্যেকেরই যে চাই! কিছুক্ষণের জন্য চলবে একটু 'ফ্রী-ফর-অল' স্পোর্টস। মাথা এবং কনুই এর সুচারু ব্যবহার, কঠিন 'এ্যাটাচি কেসের' রুক্ষ আঘাত, হাত এবং পায়ের মোক্ষম কায়দা। নহ-মাতা-নহ-কন্যা-নহ-পিতা-নহ-বন্ধু—সে এক অভিনব জন-প্লাবন, জন-জাল, জন-জট। দুপ-দাপ, ধুপ-ধাপ শব্দ, কলরব, ধুলো আর খবরের কাগজ যুদ্ধ সময়ের রেশন দোকানের লাইনের কথা স্মরণ করিয়ে দেবে। কয়েকটি মুহূর্ত, তার পরেই ভিতরের চেহারা শান্ত। কিন্তু বাইরে? প্লাটফরমে? ট্রেনের কামরাগুলো যেন 'কারখানার' জল-মুখ-খোলা হয়ে মানুষের বন্যা বইয়ে দিয়েছে সেখানে। ঢেউ-ঢেউ নর-নারী ঊর্ধ্বমুখ ছুটে যেতে চায় সাবওয়ের দিকে, বাসস্টান্ড তাদের অনেকের লক্ষ্য, কারো বা ফেরি ঘাট। কিন্তু ছুটে যেতে চাইলেই তো যাওয়া যাবে না, বিপরীত মুখী জনস্রোত আছে, আছেন রেলের অন্দর মহলের নিজস্ব বাসিন্দা হকাররা, ভেণ্ডাররা। ওঁরা আছেন চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মতো সব সুবিধার স্থানগুলো জোড় দখলী স্বত্বে! প্রতি পদে বাধা হয়ে, নিষেধের ডোর হয়ে, বসে আছেন অনেক ছোট-পরিবার সুখি পরিবার। কিন্তু ষ্টেশন তাদের সুখের কারণ হলেও, এই সব সদ্য-ট্রেন-গর্ভ-উদ্গীরিত নিত্যযাত্রীদের তো প্রাণান্ত। তাই সুদীর্ঘ-প্লাটফরমে ছোট ছোট দল, বড় বড় ঝাঁক-

প্রতিঘাত, হাতের গুঁতো আর কনুই এর ধাক্কা। পথ করে নেবার, আগে বেরিয়ে যাবার অক্লান্ত প্রচেষ্টা। বিশৃঙ্খল-উশৃঙ্খল কার-আগে-কে-পরে এগিয়ে যেতে তার প্রতিযোগিতা। মানুষের প্রতি শ্রদ্ধাকে বাড়ায় না, বিশ্বাসকে অটুট রাখতে সাহায্য করে না। তবুও এটা ঘটে, ঘটছে এবং প্রতিপক্ষ নির্বাচনে নিশ্চয় না হলে, ঘটবেও। এটা তাই নিত্য ঘটনা, নিত্যযাত্রীদের রোজ-নামচা। এবং আমরাই একদিন আমাদের নিজেদের পিষে মেরে ফেলব যদি অন্য কাউকে সময় মত পিষ্ট করে বাঁচার রসদ আদায় করে নিতে না পারি।

নিত্যযাত্রীরা মাছের মুড়ো চায় না, আরও বেশি ট্রেন চায়, কাদিতে ডুবিয়ে দুধ খেতে আগ্রহী নয়, বসে বসে পরিচ্ছন্ন বাতাসে শ্বাস নিতে নিতে যাতায়াত করতে চায়। অন্যথা একদিন আসবে যখন এই সব লোকাল ট্রেনের স্থান হবে কোনও মিউজিয়ামে, লেখা থাকবে: এই সেই বৈদ্যুতিক বাহন যাতে করে এক ধরনের প্রাণী, নিত্যযাত্রী, যাতায়াত করতো বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত।

বক্তব্য আবার ভারি হয়ে পড়েছিল। এবারে দূর পাল্লার ট্রেন যাত্রায় একবার উঁকি দেওয়ার আগে কিছু কিছু প্রানাত্ত দশা এবং অবরে-সবরের একান্ত নাটকীয় দশা দেখে নেওয়া যাক।

একটু বেলা হতে না হতেই বেরিয়ে পড়বে হকার ভাইরা। ওদের জীবন সংগ্রাম। পরিমাণমত দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করতে না পারলে ওদের মুখ-চোখে ফুটে পড়বে নিকৃতির ছাপ আর গৃহে ধিককারের বাতাবরণ। তাই ওরা মরিয়া হয়ে কামরা থেকে কামরাতে ওঠা নামা ক'রে নিজ-নিজ দ্রব্যসামগ্রী বিক্রি করে বেড়ায়। ভিড়? ওদের কাছে কোনও ব্যাপারই নয়। ওদের কনুই-এর ধাক্কা, ঝুড়ির আঘাতে আর ব্যাগ-বাক্স-ইত্যাদির গুঁতোয় পথ করে দিতে যাত্রী সাধারণের কাঁধ-মাথা-ভুঁড়ি এদিক-ওদিক সরে-ছিটকে যাবে। যাক্! ওরা কিন্তু 'নন চ্যালেঞ্জিং' কণ্ঠের ওঠানামায়, শব্দের ঝংকারে আর বক্তব্যের নাটকীয়তায় সকলকেই মাত করে ভাসিয়ে নিয়ে যেতে চায়। তখন যাত্রীদের প্রকৃতি পাল্টে গেছে, অফিসযাত্রী নয় আর। এখন ছোট-বড় ব্যবসায়ীরা, উমেদাররা, আর তদবিরকারকরা ভিড় করে থাকে। ধাক্কা ধাক্কি, গুঁতো গুঁতি, চেঁচামেচি, গোলমাল লেগেই থাকে কামরায় কামরায়। সে এক অপূর্ব 'ক্যাকোফোনি'। পরিবার-পরিজন নিয়ে, ভিড় এড়িয়ে আত্মীয়-বন্ধুর বাড়িতে যাতায়াতেরও এটাই সময়। পড়ানো বেলায় এই সব যাত্রীরা বেখাপ্পা প্রতিযোজনে অক্ষম। শিশুরা চিৎকার করে কাঁদবে, কিশোর-কিশোরীরা ঘটনাকে গিলবে, আর বড়রা নিমপাতা-মুখ করে জানালা-মুখী-দৃষ্টি ফেলে সবই হজম করে চলবেন। এটাই নিত্যকার ঘটনা। বিক্রিও যেমন প্রচুর বিকৃতিও তেমনি বিচিত্র।

ট্রেনে হাফ-টিকিটের ব্যবস্থা আছে বিশেষ বয়সের নিচের বালক-বালিকাদের জন্যে। কেন করা হয়েছিল এই ব্যবস্থা? যে কারণেই করা হোক না কেন সেই কারণ বা কারণসমূহ বিবেচনা করার সময় কি বিবেচকদের মাথায় আর একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা খেলে নি? যে কামরায় আমরা পঞ্চাশজন অনায়াসে যেতে পারি, সেই কামরাতেই ওরা, যাদের বপু এবং পরিসর উভয়ই আমাদের দ্বিগুণ বা ত্রিগুণ, তারা মাত্র কুড়িজন থেকে পঁচিশ জন অনায়াসে আঁটতে পারে। তাহলে ডবল-টিকিটের ব্যবস্থা করলেন না কেন। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দেখা যায় ট্রেন থেকে এক দুই জন লোক নেমে গেলে সেখানে স্থানের সংকুলান নজরে পড়ে না, ওরা যে নেমে গেলেন তার কোনও প্রভাব

পড়ে না ভিড়ের মন-কুনাই। আবার দেখুন যেমন যেমন এক জন নেমে গেলেই মনে হয় এক কাঠা মতো স্থান ফাঁকা হয়ে গেল! তাহলে রেলের [এবং বাসের] কর্তাব্যক্তিরা ডবল-ট্রিপল টিকিটের সংস্থান রাখেন নি কেন?

আবার জ্যাম-প্যাকড ট্রেনের কামরার কাবার্ডে দেখবেন কোণ-ঘেঁসে সব জোগানো তাসের আসর বসে গেছে। জীবন-সংগ্রামে উত্তাল তরঙ্গাঘাতে ট্রেনের-জীবন যখন গেট থেকে ভিতর পর্যন্ত উথাল-পাথাল তখনও এঁরা চতুর্বর্গ বেষ্টনীতে সমাধিস্থ হয়ে থাকেন। জগৎ ও জীবন এঁদের কাছে গতিহীন, ম্লান; একমাত্র গড়বাই এঁদের মধ্যে জীবনের সাড়া জাগাতে সক্ষম। জগৎ নয় তাসের নিজস্ব 'গড়' এদের সকল ধৈর্যের আর সমস্ত একাগ্রিকতার ধারক ও বাহক। কখনও একখণ্ড জানালায়, কখনও সংবাদ প্রতিদিনখানা আবার কখনও স্রেফ রুমালটুকুই এদের কাছে টেবিল-এর ভূমিকা। এঁরা অবশ্য অপর যাত্রীদের বিরক্ত করেন না, অনেককেই আকর্ষণ করেন। কিন্তু এঁদেরই আত্মার আত্মীয় যারা দরজার মুখে দণ্ডায়মান অবস্থায় একটি আবর্ত তৈরি করে হাতে হাতেই সব ক্রিয়া-প্রক্রিয়া সম্পাদন করে তারা কিন্তু এগোবেও-না-পথও-ছাড়বে-না স্বভাবের। সরতে গেলে চতুর্বর্ণ সংহতি বিনষ্ট হবার সমূহ সম্ভাবনা এবং সুতরাং সুচাগ্র মেদিনীও এরা ত্যাগ করতে রাজি নহে! বহু বিবাদ, প্রভূত বিতণ্ডা এবং ভুরি ভুরি শান্তিভঙ্গের সম্ভাবনাকে এরা নিত্য বলে মেনে নিয়েছে। চলছে-চলবের প্রকৃষ্ট নিদর্শন!

এ-ছাড়া আছে কিছু 'ওয়েসিস', গঙ্গা-ধারের বাতাবরণ। ট্রেনের মধ্যেই তা আপনি দেখতে পাবেন। কল্পনায় সবই সম্ভব, মনে করে নিলেই তো হয়! ট্রেনের কামরার মধ্যের ঠাসাঠাসি ভিড়ের মধ্যেও কোথাও এদের হারিয়ে যাবার নেই মানা, একান্ত, একেবারে যেন একা-একা দুজনা। ছোট-ছোট কথা, মৃদু-মৃদু হাসি আর 'সাব-ভোকাল' আবেগ এদের রুদ্ধদ্বার বক্ষ-ভেদ করে অন্তরে-অন্তরে ছবি ছবি প্রকাশ পায়। শালীনতার গণ্ডিবদ্ধ বৃত্তের মধ্যে ওদের মন পাখি ঘুরে ঘুরে সময়টুকুর যথাসম্ভব সদ্ব্যবহার করে নিতে চায়। আধুনিক জীবনের তীব্র গতি আর সুতীব্র-ভিড় আমাদের সব আবেগকে যে নিঃশেষে কেড়ে নিতে পারে নি তার জন্য আমরা কাদের কাছে ধন্যবাদ জানাবো? বহু অতীত বিবৃত হয় এই ট্রেনের ভিড়-বিস্মৃত কোণে, পর্যালোচিত হয় বাস্তব বর্তমান আর একে একে একা-একা দিনের কল্পনার-ফুলে গ্রথিত হতে থাকে অনন্ত ভবিষ্যতের অনাগত দিনগুলো। উচ্চ-বৃক্ষ-চূড়ে নয়, কপোত-কপোতী যথা ট্রেনের কামরার কোণ-কেন্দ্রে! আমাদের ধড়ফড়ানিতে ভরা, যান্ত্রিক জীবন পথে এই ট্রেনের কোণ গুলিই কবিতা হয়ে ফুটে ওঠে, ছোট গল্পের আমেজ বয়ে আনে। কথা শেষ হয় না, যাত্রায় ছেদ পড়ে। ট্রেনও চলে, মনও চলে; ট্রেন থামে কিন্তু ফিরে ফিরে কল্পনা নিশ্চয়ই পাখা মেলে! যাত্রাপথ শেষ হয়ে যায়, কথা কিন্তু হইল না শেষ!

ট্রেনযাত্রী-লড় ঃ

দূরের ট্রেন গতিতে আলাদা, প্রকৃতিতে স্বতন্ত্র। তেমনি যাত্রীদেরও স্বরূপ আলাদা, চরিত্র ভিন্ন। ব্যতিক্রম বাদ দিলে এই ট্রেনের যাত্রীরা দৌড়ে এসে গাড়ি চাপেন না, হাওয়ার লোভে দরজার মুখ আগলে দাঁড়াবেনও না। এঁরা অনেক সময় কম্বিকতে বেঁধে প্রস্তুত হন আর ট্রেনের প্ল্যাটফরম

প্রবেশের আগেই বাক্স-পেঁট্রা সমভিব্যাহারে প্রতীক্ষা করেন। যাত্রীদের ক্রম-আগমনে প্লাটফরমের মেঝেটুকু ক্রমশই অদৃশ্য হতে থাকে। এঁদের ধৈর্য অনেক, অপেক্ষার তীব্রতাকে এরা একাত্ম করে ট্রেনের গর্ভে স্ব স্ব স্থানের অধিকার উদ্দেশ্য একাগ্র করে তোলেন। দল-প্রধান অমরনাথের যথাবিহিত নির্দেশ উপদেশ আগেই বিস্তারিত দিয়ে রাখেন। অপেক্ষার দীর্ঘ সময়টুকুকে এঁরা পরিপূর্ণ করেই ব্যবহার করেন। পথের খাবার সংগ্রহ, জলের বোতল থেকে শুরু করে যারা 'সি-অফ' করতে এসেছেন তাঁদের প্রতি শেষ উপদেশ-নির্দেশ অনুরোধ-উপরোধ পর্যন্ত সুচারুভাবেই সম্পন্ন করে ফেলেন। এঁরা অনেক দূরে যাবেন এবং সম্ভবত অনেক দিনের জন্যই যাবেন।

সময় যতই এগিয়ে আসবে ততই দেখবেন আর এক প্রকৃতির যাত্রীরা অপেক্ষাকৃত দ্রুত পায়ে এগিয়ে আসবেন। এরা দূরের গাড়ির ভুক্ত-ভুক্ত-যাত্রী। হাতে এটাচি, কাঁধে ঝোলা ব্যাগ নিয়ে এঁরা একবারে প্রস্তুত হয়ে সহযাত্রী বন্ধু-স্বজনদের ইতি-উতি দৃষ্টি ফেলে ফেলে এগিয়ে আসবেন। 'সিটিং-পয়েন্ট' মোটামুটি সকলেরই জানা। যে সব কামরায় সিটিং একোমোডেশন থাকে তারই কাছে পিঠে এঁরা এসে দাঁড়িয়ে পড়বেন। এঁদের মধ্যে আবার কেউ কেউ বেশ চতুর চৌখোস। তাঁরা পাইলট-এর কাজ করেন। ট্রেন প্লাটফরমে ঢুকলেই এঁরা রুমাল, কাগজ, ব্যাগ ম্যাগাজিন এমন কি চিরুনি ছুঁড়ে দিয়েও সিট-রিজার্ভেশন করে ফেলবেন। রেলের বিজ্ঞাপন দেখে আর প্লাটফরমের বাস্তব অভিজ্ঞতাকে মনে রেখে আমরা বলতে পারি যে সিট রিজার্ভেশন ত্রিবিধঃ এক, রেলকে যথাসময়ে প্রয়োজনীয় দর্শনী দিয়ে আগে থেকেই সিট রিজার্ভ করা যায়। দুই, প্লাটফরমে দাঁড়িয়ে হাতের যে কোনও 'হ্যান্ডি' দ্রব্য-নিক্ষেপণে সিট-দখল করার পদ্ধতি, এবং তিন, এটা মোক্ষম পথ, জোর-যার-মুলুক তার পদ্ধতি। যে স্থান আপনার রুমাল অধিকার করে রেখেছিল সেই স্থান, ট্রেনের মধ্যে যখন ঢুকতে পারলেন তখন দেখলেন, অন্য কোনও যাত্রীর পশ্চাদ্দেশ-তলে অবলুপ্ত হয়ে গেছে, আপনার রুমাল হয় মেঝেতে গড়াগড়ি দিয়ে কাঁদছে অথবা তার পিঠ-ঠেসের উপর চড়ে বসে আছে, অথবা একেবারেই বেপাত্তা! আপনার সামনে দুটি পথ খোলা আছে: যুদ্ধ অথবা শান্তি! আপনার অভিজ্ঞতা, অপরের ব্যক্তিত্ব এবং প্রকৃতি নির্ণয়ের তাৎক্ষণিক ক্ষমতা এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার দিক্-নির্দেশ অনুধাবন ক্ষমতা আপনার একমাত্র সিদ্ধান্ত গ্রহণ চতুরতায় সহায়ক হবে। যুদ্ধ? শান্তি? আপনি জানেন সর্বোত্তম, আপনি বোঝেন সর্বোত্তম! রণে ভঙ্গ দেবেন না মরণে ঝাঁপ দেবেন তা আপনিই জানেন। ফলাফল? রুমাল যেমন ফেরত পেতে পারেন স্থানের দখল সহ, যদি আপনার দল-শক্তি প্রতিপক্ষের তুলনায় সর্বাধিক হয়, অন্যথা রুমালের সঙ্গে নাক, নাকের সঙ্গে দু'চার ফোঁটা রুধির এবং অভূত অসম্মান আপনার ঝোলায়—অভিজ্ঞতায় এবং দেহের—সংগ্রহ হবে মাত্র। এটা মরণ তুল্য মনে হবে তখন! তাই সহজেই বলা যায় যাত্রীর 'বর্ণ' নিশ্চয় করে দেখে যুদ্ধ না শান্তি কাম্য।

এই ত্রিস্তর রিজার্ভেশন পদ্ধতির জন্যে ত্রিস্তর যাত্রীও আছেন। প্রথম দল সংসারী, হিসেবী এবং পরিবার-পরিজন-বাহি। তাই তারা 'ফেয়ার' পথে 'ফেয়ারলি' থেকে স্ব স্ব স্থানগুলো অনেক আগেই দ্বিতীয়ের তাৎক্ষণিক রুমাল-কাগজের আওতা থেকে সরিয়ে রাখতে চান এবং তৃতীয়ের 'মাইটি'-অভিযানের কেন্দ্র-বিন্দু থেকে বাঁচিয়ে রাখেন। দ্বিতীয় বর্গের যাত্রীরা নিত্যযাত্রী অথবা দেখে-শুনে নিত্যযাত্রীর মতো ব্যবহার করতে চান। এঁদের সঙ্গে থাকে মাসিক বা ত্রৈমাসিক টিকিট অথবা দৈনিক। এঁরা খড়্গপুর, কাড়গ্রাম, দুর্গাপুর, আসানসোল, বোলপুরের যাত্রী। প্রথম পদ্ধতিতে

রোজ রোজ সিট রিজার্ভেশন বাস্তবও নয় সম্ভবও নয়। তাই এঁরা অভিজ্ঞতার সাহায্যে কামরা নির্ধারণ করেন আর গাড়ি প্ল্যাটফর্মে ঢুকলে কামরা-কম্পার্টমেন্টকে 'মিসাইল' করে টার্গেট স্থির করেন। এবং বেশ 'প্র্যাকটিসড্' হলেই এঁরা এটা করতে পারেন। এবারে দেখা যাক তৃতীয় বর্গের যাত্রীদের প্রকৃতি, দৃষ্টিভঙ্গি এবং চরিত্র।

এঁরা হলেন প্রধানত 'হার্ড-ইনহিবিটেড'। নিত্য অফিস-দপ্তর-কলেজমুখী যাত্রীদের কাছে তা অবশ্যই 'হার্ড' হয়ে প্রকাশ পায়। এই তৃতীয় বর্গীরা প্রধানতই ছোট-বড় ব্যবসার সঙ্গে যুক্ত। বাজারে আসেন কলকাতায়, কেনা-বেচা করতে। ছিট কাপড়, পি-স্ট্রীর প্যাকেট আর বিচিত্র-বিভিন্ন প্রকার বান্ডিল এঁদের সঙ্গী। এঁদের যাতায়াত দলবদ্ধ, গোষ্ঠীবৃত্তে সংহত। এঁদের জোর পায়ের জোর, কণ্ঠের অনভিধানিক ভাষা এবং চোখের রক্তাভ চাহনি বিচিত্র অঙ্গ ভঙ্গি এবং প্রত্যক্ষ সক্রিয়তার নাটকীয়তায় এঁরা বাজি মাত করেন। ঘরের খেয়ে অন্যান্য যাত্রীরা এই স্ট্রেনের মহিষ তাড়াতে আগ্রহ দেখান না। 'সব শেয়ালের এক রা' নীতিতে এঁদের একজন হুংকার ছাড়লে সবাই সামিল হয়ে পড়েন। বন্যেরা বনে সুন্দর, 'স্ট্রেঞ্জার্স'-রা অবশ্যই স্ট্রেনের অসুন্দরের তাণ্ডব কেন্দ্র। এঁরা অন্যের ঘাড়ের উপর দিয়ে হাত বাড়িয়ে ভাঁড়ের চা লুফে নেন, হঠাৎ কোনও সহযাত্রীর জামা-প্যান্ট নষ্ট করলে 'সরি' বলেন এবং ভাবখানা এমন করেন যেন ঐ 'সরি'-টুকুই জাদু-শব্দ! সব যেন সরিতেই বিলীন হয়ে যাবার কথা। হয়ত তাই, কারণ সাপের লেজে কেউ সজ্ঞানে পা রাখতে রাজি নন! এই সব প্রভূত কাঁচা-পয়সা-পকেট যাত্রীরা বারে বারেই সিট ছেড়ে উঠে পড়েন, কাঁধ আর কনুই-এর পর্যাপ্ত ব্যবহার করবেন আগে-পিছে যাতায়াতের অতীব সংকীর্ণ পথে, আর বন্ধু-বান্ধবের সঙ্গে পিঠ-চাপড়িয়ে পেট-খুসি হেসে দুম ঘেঁষে দিয়ে আড্ডা মারবেন। এঁদের কাছে দূরযাত্রার জন্যে সময়-তরানকারী কাগজ-জার্নাল, বই-পুস্তক যেমন থাকে না তেমনি আলোচনা করার মতো বিষয়েরও অভাব থাকে। তাই এরা সুযোগ পেলে তাসের বান্ডিল বার করে দল বাঁধেন, অন্যথা সিনেমার হিরোইন বা পাড়ার 'ঝামেলা' নিয়ে মশগুল হয়ে পড়েন। অন্যের রুচির প্রতি সম্মান এঁদের ভাবনার মধ্যে কেন যেন কারুও ঠাঁই পায় না। এঁরা দুর্বার, এরা বিদ্রোহী, এরা ছন্নছাড়া, প্রকৃতির একেবারে অতীত-সম্ভব অন্দর মহলের প্রাণী হিসেবে এদের প্রয়োজন এবং উপভোগের সীমা নিরূপণেই রত। বৃহৎ-এর জন্য এঁদের কোনও আসক্তিও নেই অনুভবও নেই।

ঐ সব দূরপাল্লার এক্সপ্রেস ট্রেনগুলোতে তাই বিচিত্র রকমের মানসিকতা প্রকাশ পায়। [illegible] যাত্রীদের [illegible] সময় চলে যায় বাচ্চাকাচ্চা আর মহিলাদের জন্যে নানাবিধ [illegible] বাক্স পেটরা গুছিয়ে রাখতে আর আদর-আবদার রাখতে রাখতে। [illegible] ঠিক সঠিক বলা হয়েছিল কিনা আর ঐ যাঃ ভুলে [illegible] নিয়ে বসে পেছনে সরে সরে যায়। [illegible] যাওয়া করেন। খাবার, পুতুল, অন্যান্য খেলনা। ছেলে-মেয়েদের মন টানে, কান্না-কাটা মুখগুলোই এদের '[illegible]'। তাদের কান্নার ধারায় ক্রয়-বিক্রয় শুরু হয়, ক্রন্দন রোল তাকে অবিলম্বে করে [illegible] চোখ-মুখে অনুরোধ ফুটে ওঠে, বাবাদের চোখে-মুখে বিরক্তি আর শোষিত হবার [illegible] কেমন যেন আড়কোনে প্রকাশ পেয়ে যায়। নির্লিপ্ত-নিরপেক্ষ মুখ করে [illegible] সম্যক দশা-দশককে অন্বেষণ করতে থাকে! আশেপাশেই

মুড়িওয়ালার টিনের কৌটোর সঙ্গে কৌটোর বুলন্ত যুকতিগুলোর 'সিম্ফনি'। অপেক্ষাকৃত বড় একটা কৌটোর মধ্যে মুড়ির সঙ্গে বিভিন্ন উপাদানের মিলন-সংগীত চামচের দ্রুত-ছন্দিত ঘর্ষণে মুখর। অনেকের মনেই 'নেবো-কি-নেবো-না'-র দ্বন্দ্ব। তেলের পবিত্রতা, ঝালের প্রকৃতি আর পেঁয়াজের গন্ধ দ্বন্দ্বকে বাড়িয়ে তুলবে। মহিলাদের চোখ চক্-চক্ করে উঠবে, অভিভাবকরা তখন বাইরে জানলা দিয়ে প্রাকৃতিক দৃশ্যে মুগ্ধ হবেন। এই মুগ্ধতা সহজে কাটতে চাইবে না, কারণ সঙ্গে সন্তানই ছেলে-মেয়েদের জন্য অনেকটাই পকেট হাল্কা হয়ে গেছে! অনেকেই একেবারে জিভের ডগায় উঠে আসা বাসনাকে গলা টিপে আবার ভিতরে পাঠাবেন। অনেকে, যারা একটু বেশি স্বাধীনতা ভোগ করে অভ্যস্ত, দু'ই ঠোঙা চেয়ে বসবেন। 'অনেক ঝামেলা গেল, এখন একটু ঝাল খারাপ লাগবে না'—বলে 'ফ্রি কনসাল্টেন্সি সার্ভিস' দেবেন স্বামীকে! বেচারি তখন চারপাশের দৃষ্টি-অবস্থানের কথা ভেবে 'কত দাম?' বলে পকেট থেকে সদা-অপুষ্টি-আক্রান্ত মানিব্যাগটি বার করবেন।

কিন্তু যাঁরা ঘি-দুধে অভ্যস্ত, যাঁরা তেলের বিরোধী, তাঁরা সময় পেলেই মোটা সোটা বড়-সড় 'টিফিন-কারিয়ার' ইস্পাত-ফ্লাস্ক, নয় স্টিলের বা কাগজের প্লেট বার করে বসে পড়েন। এঁদের সঙ্গে চাটনি বা আচার জাতীয় একটা অনুপান অবশ্যই থাকবে। চারদিক গন্ধে ম' ম' করে উঠবে হাঁই-চাঁই পুষ্ট-দেহে ঢেকুর তুলে এঁরা ত্রিভুবন বিস্মৃত হয়ে উদরের তৃপ্তিতে মনঃসংযোগ করবেন। একটা বৃহৎ অনুষ্ঠান কেমন অনায়াসে ক্ষুদ্রতম স্থানের পরিধিতে সমাপন করা যায় তা এঁদের সুচারু দৃষ্টিতে আর সুপরিসর আসন-পিঁড়ি-বসা-কোলের টেবিলে না দেখলে বিশ্বাস করা শক্ত।

পাশাপাশি চলবে একেবারে মডার্ন ব্যবস্থা। ট্রেনের নিজস্ব ক্যাটারিং আছে। পরিশীলিত, সুটেড্-বুটেড্ যাত্রীরাও আছেন। গত-সপ্তাহে ধোলাই করা ইউনিফর্ম পরিহিত কেটারিং-এর বেয়ারারা। ব্যবস্থা আছে সব কিছুরই কিন্তু দেখাশুনোর ব্যাপারটাই উবে গেছে দেশীয় কমানায়! ডিউটিতে হয়তো এই সার্ভারেরা আসেন টেরি বাগিয়ে টেরিলিন চাপিয়ে; কিন্তু নিয়ম 'ইউনিফর্মের'। তাই বাক্স, ড্রয়ার বা ব্যাগ-থেকে বার করে গায়ে চড়িয়ে এঁরা খাবার নিয়ে বেরিয়ে পড়েন! কেউ বলার নেই, কেউ বলতে ভরসা পান না। যাত্রীদের বলায় কিছুই এসে যায় না, কারণ আজ যিনি বলবেন, কাল তিনি দেখবেন না যে! এ-যেমন বিসদৃশ্যের একদিক, এর অন্যদিকে আছে আকাশ ছোঁয়া দামে মাটি-ছোঁয়া খাবারের লেনদেন। চলছে চলবে! আপনি তো মাত্র একদিন বা একবেলা দিচ্ছেন-খাচ্ছেন-চলে যাচ্ছেন। দুর্ব্যবহার করার আর যাচ্ছেতাই খাবার দেবার জন্য ওদের ট্রেন-গর্ভে অনন্ত-অফুরন্ত খদ্দেরের প্রবাহ আছে। একই লোককে দুদিন ঠকাতে হবে না ওদের। প্রত্যেকেই ওদের কাছে একবার ঠকতে পেলে মুশকিল পার হয়ে যাবে যে! ট্রেনে ক্যাটারিং আর স্টেশনের বাইরের ফেরিওলা-ট্যাক্সিওলা-কুলিদের একই নীতিতে রমরমা বাজার : একই জনকে দুবার ঠকাবো না, কিন্তু প্রত্যেককেই একবার করে ঠকাবো মাত্র! এই নীতিতে পুরুষানুক্রমে ধরে আমাদের ব্যবসা চলবে। আর আপনি, যাত্রী? রূপোলী রাংতায় মোড়া 'সফিস্টিকেটেড' খাবারের প্যাকেটটিতে একই দামে দ্বিবিধ তৃপ্তি পেলেন : জঠরের ক্ষুধার প্রশমন আর ব্যক্তিত্ব-জাহিরের প্রকাশন। মন্দ কি?

আর ঐ কামরা-প্রান্তের দরজা-উপচে আগমনমান 'গরম-চা' আর 'কফি'-র কথা না বললে তো এই ট্রেন-পুরাণ অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। ওরা অবশ্যই আমাদের বর্ণিত তৃতীয়-বর্গের যাত্রী-গোষ্ঠীর গোষ্ঠীয়। কিন্তু এরা উপস্থিতিতে যেমন সর্বভৌম পরিবেশনেও তেমনি সাযুজ্য, সার্বিক। পয়সা ফেলে

গুণে দেখে নিয়ে একটু হিসেব করে নিয়ে ট্রেনের ভিখারীও যেমন ভুকাপে বোধ করে তেমনি শিলভার-কোট-প্যাকেট, জোসে দিয়ে টাই টাকে ঠিক-ঠাক করে সাহেবসুবোও তেমন হাঁক পাড়েন। একটি জেলো-টিনের মধ্যে উনুনের ব্যবস্থা, তার উপরে চওড়া সাইজের একটি কেটলি, কেটলির মুখ জাওতার এক ফিলি পানের মতো গরম-নিরোধক ছিপি। সবার উপরে দু'পাশ থেকে উর্ধ্ববাহু হয়ে দুটি হাতলের একত্র মিলন। এটাই হল গর্ম-চা-এর চলন-বলন। একদিকে এক হাতে ঝুলিয়ে কাঁধে ব্যাগ আর সেই ব্যাগের মধ্যে সুসজ্জিত থরে-থরে সাজানো মাটির ভাঁড় অথবা পোর্সিলিনের কাপ-ডিস। খাকড়াচুল, রাঙ্গা-চোখ হাসে-নিন্দিত কণ্ঠ চলবে আপ-ডাউন হাঁক 'চা-আ-আ, গর্ম চা-আ'। যাত্রীদের চলাচলেরও যেখানে পথ নেই, আপনি যেখানে শতবার 'প্লীজ' 'প্লীজ' বলে দৈবিক প্রয়োজনে সামনে বা পিছনে যেতে বাধা, সেখানে দেখবেন ওদের চলাচল কেমন অনায়াস! আমরা সকলেই সরে গিয়ে, নানান 'এ্যাক্রোবেটিকস' করে ওদের জন্য পথ করে দিয়ে থাকি। ওরা যে রেলের খাস তালুকের প্রজা সে আপনি 'হি হি' এলেই বুঝে যাবেন। কথা বলে-বলে আর না-বলে-বলে ওদের ডোকান আর সাব-ডোকান কর্তে মাঠ পড়ে যায়, ঢুকিয়ে যায়। ঐ টি টি দের কথা বলছি। লেনা দিলি ওঁরা টিকিট পরীক্ষার চাইতে টিকিট-হীনদের জন্যে সর্বক্ষণই তো হন্যে হয়ে থাকেন। কামরার উপর-কোণে এলেই ওঁদের কণ্ঠ-শুষ্কতা নিঃশেষে দূরে যায়। ক্ষণকাল বিশ্রাম এর সঙ্গে 'গর্ম চা' বা 'কফি' ওদের পরিষ্কার করে দেয়। 'কফি'র ব্যাপার একেবারে চা-এর মতোই। তফাত দুটি ক্ষেত্রে। এক, এদের ব্যাগে ভাঁড় থাকে না, থাকে কাগজের বা প্লাস্টিকের 'কাপ' আর দুই, এদের গলা ফুট-গজ-মিটারে মাপা যায় না—জল গরম হতেই থাকে, তার আর দু'ফুট তিন ফুট কি হবে? চা'এর ক্ষেত্রে তাই হিসেবীর ফুট-গজ চালু রসিকতা। কারণ তৈরি চা-ই কেটলিতে থাকে। গরম হয় আর গরম হয়, কোটান হয় আর গরম রাখা হয়। আর একটা মজার ব্যাপার এদের পণ্যের মূল্য নির্ধারণ প্রক্রিয়া। নিত্যযাত্রীদের জন্য এদের মোজেসন রেট আছে, নৈমিত্তিক দের জন্য থাকে 'রিটেল'। এ-বিষয়ে ওদের সিদ্ধান্তই 'ফাইনাল'। সপ্তাহে পাঁচদিন-ছ'দিন যাতায়াত করেন যাঁরা তাঁদের এরা অবশ্যই চিনে ফেলে, আর তাছাড়া ওদের যেমন দলবদ্ধ-জীবন, হার্ড-ইনটিটিউট আছে ঠিক তেমনিই ওরা নিত্যযাত্রীদের মধ্যেও এক ধরনের গ্রুপ-লাইফ দেখে থাকে। সেখানে সেখানে মনে মনে মিত্র-মিত্র ভাব অঙ্কুরিত হতেই পারে! দু'পক্ষই অকারণ ঝামেলায় জড়াতে চায় না। সহাবস্থানের রেল-সংস্করণ আর কি!

যাঁদের কথা এতক্ষণ বলছিলাম তাঁরা অবশ্যই সাধারণ যাত্রী। এঁরা রিজার্ভ-সিট কামরাগুলোতে যাতায়াত করেন। বিন-পঞ্চাশজন অবশ্যই দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দূরত্বকে অতিক্রম করেন। সময় কাটানোর জন্যে দিনের খবরের কাগজ, সপ্তাহের ম্যাগাজিন, গল্প-উপন্যাসের পেজ-মার্ক করা কেতাব। এ-ছাড়া আর একটিই মাত্র বিষয় খোলা থাকে সময় কাটানোর জন্যে। প্রকৃতি। ট্রেনের বাইরে সদা পরিবর্তনশীল ল্যাণ্ডস্কেপ। অনেকেই তন্ময় হয়ে নিবিষ্ট চিত্তে সেই সবুজের হাতছানিতে, চাষাভুষোদের ক্রিয়াকলাপ দেখে দেখে আর শালিক, বক, গাং-চিলেদের জীবন-বৃত্তান্ত উপভোগ করতে থাকেন। এ-ছাড়া কিছু-কিছু যাত্রী অফিসের অনাচার-অবিচার-দুর্নীতি, সহকর্মীদের ছোট মনের ক্ষুদ্রতার পরিচয়বাহী ক্রিয়াকাণ্ড নিয়ে নিজেদের মধ্যে ঘনিষ্ঠ বৃত্ত রচনা করে সময়কে 'পি-এন-পি-সি' বা পরনিন্দা পরচর্চায় কাজে লাগান। 'কুইক ফিক্সড' আড্ডার মতো নিজেরা বিষয়ে এঁটে থাকেন এবং সময় সময় দু'চারজন অযুকদা তমুকদাকেও সঙ্গে, পাশে জড়িয়ে ধরেন।

সব থেকে আকর্ষণীয় বিষয় অবশ্যই সেই নিরবধি পরিক্রমা। রাজনীতির আলোচনায় সকল নাগরিকই এক একজন বিশেষজ্ঞ—একপর্ষ্ঠ। তাই বহুক্ষেত্রে মৃদু প্রতিক্রিয়া নয়, একেবারে গুরুতর প্রতিক্রিয়া পর্যন্ত পৌঁছতে পারে এই আলোচনা। যেমন প্রাণবন্ত হয় রাজনীতির আলোচনা, তেমনি কাণ্ডাপণ্ডের জ্ঞান উন্নতির অফুরন্ত অবকাশ থাকে এই সময়-অতিবাহী ব্যবস্থায়। নিন্দার অভাব ঘটে না, একাগ্রতার ঘাটতি দেখা যায় না, অনটন পড়ে না তথ্যের উদ্ঘাটনে আর তত্ত্বের উদ্‌গিরণে। আর বহু-জন একই সঙ্গে অংশগ্রহণ ক'রে একটি বিষয়-মাত্রকে কেন্দ্র করে পঞ্চাশ-একশো মাইল অবলীলায় পার করে দেওয়া যায়। সকলেই যে কণ্ঠ মিলিয়ে যোগ দেবেন তা নয়, নির্বাক অংশগ্রহণকারীর সংখ্যাও অনেক হয়ে দাঁড়ায়। সময় কাটানো থেকে শুরু করে সময়কে হত্যা পর্যন্ত অনায়াস সাফল্যে চলতে থাকে। এবং আর একটা সুবিধাও আছে। ট্রেনজার্নিটুকুর শেষে যে পথ এবং যে সময়টুকু পড়ে থাকে গন্তব্যে পৌঁছতে এবং অথবা ফিরতি পথের দীর্ঘ সময় এই রাজনৈতিক আলোচনার শবব্যবচ্ছেদ করে আবার সময় কাটানোর সুযোগ হাতে এসে যায়। যাঁরা তখন অংশগ্রহণ করেন নি, কিন্তু বলতে বলতে পারতেন অনেক কিছুই, সেই নির্বাক অংশগ্রহণকারীরা এই পরবর্তী পর্যায়ের শবব্যবচ্ছেদে অংশ নিতেই পারেন। নিয়েই থাকেন। যান্ত্রিক শকট-শব্দের লৌহ-কঠিন পরিবেশে, গরমের আর ভিড়ের মধ্যে নিত্য যাত্রার মিনিট-ঘণ্টাগুলো ছোটখাটো আরও অনেক বিষয়-ব্যাপার-ঘটনার আবর্তে পাক খেতে খেতে এগিয়ে চলে দিনান্ত থেকে সপ্তাহান্তে, মাসান্ত থেকে বৎসরান্তে। অনেকে একদিন বদলী হয়ে রেহাই পান, অনেকে অবসর নিয়ে মুক্ত পান। কিন্তু মধ্যেকার এই জীবন আবহমান বলে মনে হয়। ক্ষয়-ক্ষতি নেই, পর্ব-পরিবর্তন নেই, সমানে চলমান, ধাবমান, প্রবহমান। জীবন এবং ট্রেন, সময় এবং বিষয়। সব, সবই।

দূরের ট্রেনের যাত্রী বলতে এতক্ষণ একটা বৃহৎ অংশকে নিয়ে আমরা মশগুল ছিলাম। কিন্তু আছেন আরো দু'ধরনের যাত্রী। এক, যাঁরা একই দূরত্ব অতিক্রম করে রেলকে অধিকতর পয়সা করে তুলেছেন সেই সব অত্যন্ত মূল্যবান প্রথম শ্রেণীর বা চেয়ার-কারের যাত্রীরা আছেন, আর, দুই, আছেন সেই সব অতিথি-অভ্যাগত-রবাহুত যাত্রীরা যারা নিজেদের ভিড়ে নিজেরাই পিষ্ট হয়ে ঐ দূরত্বটুকু অতিক্রম করেন শরীরের মেদ-মাংস-হাড়-মজ্জার অনেকখানি দক্ষিণা দিয়ে। প্রথম দল বাহিতে আবাহন পান, প্রত্যেকের জন্যে স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপনার সুপরিসর বন্দোবস্ত আছে। এঁরা আসন-বসন-এর দলে। আপন ঘরের বৈঠকখানাটি অথবা বেডরুমটির অনেকাংশই যেন এঁদের জন্যে ট্রেনের অভ্যন্তরে আগে থেকেই সুবিন্যস্ত করা থাকে। আবাহনে আর আপ্যায়নে এঁরা হৃষ্ট-বক্ষ তুষ্ট-চিত্ত হয়ে যাত্রা করেন। এঁদের মধ্যে অনেকেই ব্যবসায়ের যন্ত্রণা মাথার মধ্যে বয়ে বেড়ান তাই শরীর-যন্ত্রটুকু পয়সার মূল্যে ক্রয় করেন। অনেকে অনায়াস জীবনে অভ্যস্ত বলে ট্রেনের মধ্যে বিপর্যস্ত হতে চান না। অনেকে একান্ত করে নিকটা লাভের আশায় এই দীর্ঘপথকে কাজে লাগান। এঁদের যাত্রাপথকে সুন্দর আর সাবলীল করার জন্যে ট্রেনের ব্যবস্থাপনায় প্রচেষ্টার অভাব নেই। খিদমতগাররা আছেন, সজাগ দৃষ্টি কালো কোট পরিহিত কেতা-দুরস্ত অফিসাররা আছেন আর সবার উপরে আছে এঁদের নিজ নিজ অভিমান, অহং, আর ব্যক্তিত্ব।

এবারে চলুন ওদের দেখি। ঐ দেখুন যারা চোখে মুখে দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনার মেঘ জমা করে প্লাটফর্মে বাক্স-পেঁটরা কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে অপেক্ষা করে আছে। কামরায় যতজনের স্থান আছে, যাত্রী

সংখ্যা সবসময়েই তার দ্বিগুণ চতুর্গুণ। কামরার মধ্যে এরা যখন সকলেই ঢুকে পড়বে তখন আর এদের যাত্রী বলে, মানুষ বলে চেনা যাবে না। কলকাতায় সি.এস.পি.সি-র আছে—পশুক্লেশ নিবারণ সংস্থা। ট্রেনে নেই, বাসে নেই, অন্য কোথাওই নেই। মালগাড়িতে কয়টা গরু বা মহিষ নেওয়া যাবে, একটা ঝুড়িতে কতগুলো মুরগী বহন করা বৈধ তার পরিমাণ আছে, আছে নিয়ম-কানুন। এদের বেলায় এ সবের বালাই নেই। ধার্যমতে এরা টিকিটের পয়সা দেবে, কিন্তু বিধিমতে এদের স্থানসংকুলানের দায় নেই রেল অথরিটির। তাই এই সব অবশিষ্ট যাত্রীরা মানুষের মতো নয়, যাত্রী বলে স্বীকৃত নয়, প্রাণীর অধিকারও এরা পায় না। এরা কি বস্তু? ডাউন ট্রেনের ব্যবস্থায় এরা ট্রেনের কামরায় লাগেজ হয়ে দীর্ঘপথ অতিক্রম করতে বাধ্য। এরা তাই নিজেদের মধ্যে ছোট খাট সুযোগ-সুবিধা নিয়ে ঝগড়া করে, পীড়িত-লাঞ্ছিত হয়ে তাণ্ডব বাধায়, একটুখানি স্থানের অধিকার নিয়ে তুলকালাম ঘটিয়ে ফেলে। নিশ্চিত ভাবে এরা কেউই তত ছোট নয় যত ছোট এরা নিজেদের প্রমাণিত করে, এতো স্বার্থপর নয় যতটা এরা অবস্থার চাপে পড়ে হয়ে পড়ে। সমস্যা এদের তাৎক্ষণিক তাই সমাধানের জন্য চিন্তা ভাবনার অবকাশ থাকে না, শরীরের জোর আর গলার দাপটেই এরা তাই তীব্র-তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। কার কাছে দাঁড়াবে বিচারের আশায়? কোথায় যাবে প্রতিকারের আবেদন নিয়ে? জীবন যুদ্ধে বিপর্যস্ত এই সব যাত্রীরা ট্রেনের মধ্যে স্থানের সংগ্রামে পর্যুদস্ত হয়, বিকৃত মানসিকতার তীব্র জ্বালায় এরা তাই তাণ্ডব ঝগড়া মারামারিকেই তাৎক্ষণিক সমাধান সূত্র বলে স্থির করে ফেলে।

কিন্তু যখন ট্রেন গতি পায়, দূরত্ব ক্রমশই কমে আসতে থাকে আর স্থানের সংস্থান আর অধিকারের মাত্রা ঐ-একরকম-করে কাজ চলা গোছের করে নিতে পারে তখন এই কামরাতেই মানসিক চাওয়া ঘটতে থাকে। আত্মীয়তার নৈকট্যে এরা একে অপরের অত্যন্ত কাছে চলে আসে। একে অপরের নিত্যদিনের খোঁজ খবর নেয়, সুখের আর দুঃখের ভাগ বাঁটোয়ারা করে পরস্পরের সামিল হয়ে ওঠে। ঠিক এই মানসিকতাটাও অনুপস্থিত অন্য দুই বর্গের যাত্রীদের মধ্যে। নিজেদের মধ্যে অথবা গোষ্ঠীর সীমায় তারা প্রত্যেকেই সীমা টেনে রাখে, বৃত্তের বাইরে মানবিক সংযোগের পথ তাদের কাছে কখনই খুলে যায় না। যদি কখনও কোনও কোনও ক্ষেত্রে যায়ও তাহলেও তা সমাজ-অফিস-শিক্ষার মাত্রায় বাঁধা থাকে। দৃশ্য-অদৃশ্য এই সব সুতোগুলোর বাঁধন খুলে এরা কখনই মনখোলা দক্ষিণে হাওয়ার আনাগোনা ঘটাতে পারে না। কিন্তু এই অবশিষ্ট-যাত্রীদের এ-ধরনের কোনও দ্বিধা সমস্যা নেই। এদের সকরুণ ক্ষুদ্র বৃহৎ পরিসরে মুক্তি পায় না বটে কিন্তু সংসার, সমাজ, পরিবার-পরিজন জোড়-মেলার ওত-প্রোতের বৃত্তে অত্যন্ত সহজ-স্বাভাবিক গতি পায়। প্রথম পর্বের যুদ্ধ-সংগ্রাম, ঝগড়া-বিবাদ কোনও দীর্ঘছায়া ফেলতে পারে না এদের দরজা-জানালা খোলা প্রকৃত জীবনে। সর্বংসহা, সকল কালিমা শোষণক্ষম এই সব অবশিষ্টের দল যাত্রী হিসেবেও যেমন, নিজ নিজ সমাজ-পরিবেশেও তেমনি সহজেই সহজ হতে পারে। কোনও প্রতিযোগিতার 'গ্ল্যাণ্ডুলার সিক্রেশন' এদের তাড়া করে না, কোনও বৃহৎ প্রাপ্তির অন্বেষণে এরা প্রতিনিয়তই অস্থির হয়ে পড়ে না। অতৃপ্ত কোনও বাসনা এদের মনের গভীরে সদাসর্বদা পীড়ন করে ফেরে না বলেই এরা ছোট-ছোট আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে সরল-স্বাভাবিক থাকতে পারে। এদের জীবনের হতাশা-নিরাশা ব্যথা-বিপত্তিগুলোকে এরা শরতের মেঘের মতো ক্ষণস্থায়ী করে নিতে পারে। এই মানসিকতাই এদের শীর্ণ-জীর্ণ জীবনে ফিউজের কাজ করে। গ্লানি আছে, তাপ ক্ষোভ

যায় না, কেননা আছে, মুষড়িয়ে পড়ে না, যুদ্ধ আছে, ভেঙে পড়ে না। এদের প্রাণের উৎস পুস্তকে-কেতাবে নয়, অফিসের পদাধিকারে নয়, ব্যাংকে ব্যালান্সের পুষ্ট অংকে নয়। চলমান জীবন থেকেই এরা প্রাণের উৎসটি খুঁজে নেয়, সংগ্রহ করে। তাই এরা অবর্ণিষ্ট যাত্রী হয়েও শিষ্ট আচরণ করতে পারে, সংগ্রাম শেষ হলে গ্রামের সকলের খোঁজ খবর নিতে পারে এবং সংঘর্ষ শেষ হলেই সহর্ষ আলাপ-আলোচনায় এক-অপরের সঙ্গে মিশে যেতে পারে।

ফাঁদ ঃ

যখন প্রথম জানলাম এই বিশ্বে এখানে-সেখানে সর্বত্রই প্রেমের ফাঁদ পাতা আছে, তখন একটু আশ্বস্ত হলাম। যাক বাঁচা গেল! ফাঁদ যখন আছে তখন সেই জালে জড়ানোর সুযোগও হয়তো একদিন আসবে। অবধারিতই আসবে। নিজে থেকে প্রেম? সে আমার জন্যে নয়। দেহে-মনে যে সব ফুল-শরের সম্ভার প্রেমের পথযাত্রীদের জন্যে আবশ্যিক তার কোনওটাই আমার দখলে ছিল না। এমন কি কোনও দিদিমাও ছিল না যে মিথ্যা করেও একটা 'রাঙা-বৌ' এনে দেবার স্বপ্ন আমার মনে গেঁথে দেবে!

তাই খুব ছোট বেলা থেকেই আমার পরিষ্কার জানা হয়ে গেছে যে আমার কপালে টুকটুকে রাঙা বৌ দূরের কথা কোনও কালো পেত্নীও জুটবে না। আর প্রেম? নৈব নৈব চ। যেমন দেখতে তেমনি শুনতে, স্বভাবে চরিত্রে একটা লাগুলহীন বাঁদর বলেই নিজের 'প্রাইভেসিটি' বাল্যেই বেশ লব্ধ-প্রতিষ্ঠা পেয়ে গেছিল। লক লক করে সর্পিল বেড়ে উঠা শরীর, কোটরে বসা দু'টি চোখ যেন কেবলমাত্র দেখার বস্তু, তেলহীন চুলের জঙ্গলে চিরুনির অব্যবহার, খড়ি-ওঠা খসা-ত্বক আর সদাসর্বদা মাঠে-ঘাটে বনে-বাদাড়ে ঘুরে ফিরে যে দেহ-সৌষ্ঠবটির আমি মালিক, সেই ছোটবেলা থেকেই, তাতে ঠাকুমা-দিদিমা থাকলেও তাদের কল্পনার লাগামটি খুলে যেতো না। আমার এক ঠাকুরদাকে আমার দেখা হয় নি। তিনি কেমন ছিলেন তা জানাও হয় নি। তবে এটা জেনেছিলাম যে ঠাকুমা-দিদিমার রূপকথা ছাড়াই তার এক রাঙা টুকটুকে বৌ জুটেছিল। কারণ সেই বৌ যখন বৃদ্ধ হয়ে আমাদের ঠাকুমা তখনও তার নাম ছিল রাঙা ঠাকুমা।

আর আমার উপর এই রাঙা ঠাকুমারই রাগ ছিল সব চাইতে বেশি। বামুনের ঘরে চাঁড়াল। তিনিই বলতেন। অন্য কাউকে বলতে শুনিনি। মনে মনে অন্য কেউ সে রকম ভাবতেন কিনা তা জানি না। তবে এটা বেশ পরিষ্কার বুঝে গেছিলাম যে আমার জন্যে যতো ফাঁদই পাতা থাক না কেন প্রেমের ফাঁদ কোথাও ওৎ পেতে থাকার নয়।

ফাঁদে পড়তে পারি আর নাই পারি প্রত্যেক প্রাণীর মতো যোগাযোগটা তো প্রকৃতির নিয়মেই তৈরি হবার কথা। বাল্য এবং কৈশোর থাকলে প্রৌঢ়ত্বে যাবার তো যৌবন ছাড়া আর কোনও পথ নেই, স্টেশন নেই। কিন্তু সেই স্টেশনে পৌঁছানোটা অনিবার্য হলেই যে গ্রহণযোগ্য, প্রাপ্তিযোগ্য গন্তব্য স্টেশনটি পাওয়া যাবে তার নিশ্চয়তা তো আর প্রকৃতি দেবে না। আমি যদিও বা ছট-ফট করতে পারি, পারি একটি ফাঁদের মধ্যে ঝাঁপ দিয়ে পড়ার জন্যে আঁকু পাঁকু করতে। কিন্তু ফাঁদ পাব কোথায়? এক-আধবার যে ফাঁদের দেখা পাইনি তা ঠিক নয়। দেখেওছি যেমন তেমনি মনে মনে সেই ফাঁদে পা দেবার জন্যে গুঁড়ি গুঁড়ি মনটাও এগিয়েছে। কিন্তু সেই যে বলে না অভাগা যেখানে যায় সাগর

শুকিয়ে যায়। দূর থেকে আমাকে দেখলে ওপারের বনে ধরা পরি, সবুজে সবুজ। কিন্তু যেই কাছে আসা অমনি আমার ধূসর চিৎকার করে ওঠে। আর যারা আপন মনের মাধুরী মিশায়ে ফাঁদের মনোকলটি পেতেছিল তারা ভূত দেখে আঁৎকে উঠে ফাঁদ ভেঙে লোপাট হয়ে যায়। এই পলায়ন তাদের দোষে নয়, আমার গুণেই।

তবে আর একটু বলে নিতেই হয়। ছোট বেলা থেকেই ভালবাসাকে 'হৃদয় ভূপের তাপে ভরা ফানুস' বলে জেনে এসেছি। আমার কর্কশতার শিক্ষা শুরু হয়েছে বাড়ি থেকে। মাস্তিক না দিলে ছেলেরা বড় হয় না। এই নীতিতে আমরা স্বভাবতই সমবয়সীদের থেকে শরৎ-বঙ্কিম-রবীন্দ্রনাথের গল্প-উপন্যাসের জগতে পেছনে পড়ে থাকতাম। ওদের চোখের ভাষা আর মুখের কথা আমাদের কাছে অর্থহীন বলে মনে হত। কেমন যেন বোবা বোবা। প্রাণের জমিতে সাহিত্যের খোঁচা-খুঁচি হয় নি একেবারেই। তাই প্রেমের শিকড় ছাড়ে নি মোটেই। বোধশক্তি নিরেট হয়ে জড়ত্ব পাবার উপক্রম। সমবয়সীরা বাঁশ দেখলে সম্ভাব্য বাঁশরির জন্য কুড়ায় এবং সেই বাঁশি হতে অভিসার ভাবনায় তাড়িত হয়। আর আমরা সেই বাঁশেই নৌকার লগি আর ঠ্যাঙারের লাঠি দেখতে পাই। ওদের বাগানে পাখি গান গায় আমাদের জঙ্গলে সাপের বাসা। একেই বোধহয় বলে মেরু তফাত, সমুদ্র-প্রভেদ। ওরা 'বই' পেলে লুকিয়ে লুকিয়ে পড়ে। আমরা লুকিয়ে পড়ি, পালিয়ে যাই। তখন বুঝতে পারিনি যে সব বইই এক বই নয়। বই-এর ভুবনেও যে প্রেমের ফাঁদ পাতা আছে তা বুঝেছি সময়টা পার করে দিয়ে। যে বই মনকে টানে সে সব বই আমাদের পাতে পড়ে নি, যে সব বই চোখের জলকে নাকের করে প্রবাহিত করে সে সব বই না-চাইতেও সামনে এসেছে।

অথচ ব্যাপারটা এমনতো হবার কথা নয়। খিদে আছে বলেই তো পৃথিবীতে খাদ্যের ব্যবস্থা আছে, অন্ধকার আছে তাই আলো অনিবার্য হয়েছে। চাঁদিমার সঙ্গে জোয়ারের, আকাশের সঙ্গে বাতাসের আর মাটির সঙ্গে জলের স্বাভাবিক সংযোগ সত্য হয়েছে। তাহলে এমন কেন হল যে প্রাণের মধ্যে তাপ আছে কিন্তু শীতল করার মতো বারির সেচন হল না? অন্তরে আগ্রহের আভাস আছে কিন্তু তৃপ্ত হবার মতো প্রাপ্তি নেই!

হল না তার দ্বিতীয় কারণ বোধহয় গুরুপ্রাপ্তি। এই গুরু-প্রাপ্তির কথা অন্যত্রও বোধহয় বলেছি। সকলেরই গুরু জোটে। আকাশ গুরু, বাতাস গুরু এবং সিনেমার নায়কও আমার গুরু। সেই গুরুকুলের প্রথম গুরু যিনি জুটেছিলেন তিনি বেরসিকের শিরোমণি। রসিক জুটি দেখলেই তার ভেতরের শার্লক হোমস্ চেয়ারে হেলান দিয়ে পাইপের ধোঁয়া ছাড়তো। চারধার অন্ধকার করে সেই ধোঁয়া বুদ্ধির গোড়ায় পৌঁছে যেতো বোধহয়। আমাদের গুরু-মশাই 'হাইপোথেসিস' করতেন, হোমসের মতো 'ডিডাকশনও' করতেন এবং আমরা তার 'ওয়াটসন' হয়ে তাকে অনুসরণ করতাম। এর ফলে যারা আলেয়ার ফাঁদে 'শ্যামা' হয়ে হন্যে হয়ে উঠতো সেই সব ফাঁদে পড়া প্রাণীদের জাল থেকে উদ্ধারের জন্যে আমরা আমাদের ভেতরের 'মায়া'-কে নির্বাসন দিয়ে বসে ছিলাম। তখন থেকেই কেমন মনে হত যেন প্রেম ব্যাপারটাই একটা বিপরীত মেরুর 'বুবি ট্র্যাপ'। পা দিলেই শেষ, একেবারেই ট্র্যাপড্ হয়ে যাবে।

তা বললে কি হবে? রোদ যখন ওঠে তাপ তখন অনুভূত হবেই। মন যখন আমি থেকে তুমিতে ডুব দিতে চায়, তার তখন মন-মন ভাব হয়, অপরের আয়নায় নিজেকে খুঁজে পেতে চায়। তখন তো আর পর-আপন বোধ থাকে না। তেমন তেমন অবস্থায় তো শুনেছি সাপের লেজ ধরেও

দেয়াল টপকাতে চায়, মৃত শবদেহ আঁকড়ে ধরে নদী পার হতে চায়। মন থইও পায় না! তার মানেই তো নেশা।

আর এই নেশার একটা শুরু আছে একটা মধ্যগগন আছে এবং আছে একটা শীর্ষ। এই শীর্ষেই বোধি লাভ হয়, মুক্ত পুরুষের অনুভব আসে। শুরুতে যে ললিত-লবঙ্গ-লতা ভাবটি মনকে পাতলা পাতলা করে দেয় তখন যদি হুঁশিয়ার না হওয়া যায় তাহলে আর হলোই না। বাইরে থেকে যাকে ফাঁদ বলে মনে হয় সেই ফাঁদই তখন আপন-ঘর হয়ে যায়, আর বাইরেটাই পর-দেশ। এটাও মনে হয় সেই 'এপার-ওপারের' চিরায়ত দীর্ঘশ্বাস!

প্রথম বার 'পাতলা-পাতলা' বোধ হয়ে পেতেই সেই যে পা তুলে সরে পড়েছিলাম সেই থেকে ছায়া দেখলেই ভূত দেখি। আসলে আমিই সরে-ছিটকে এসেছিলাম না কাছে থেকে আমাকে দেখে সেই 'ফাঁদ' আমার রাঙা ঠাকুমা হয়ে গেছিল তা কে জানে! আমার চোখে 'প্যারালাক্স' দৃষ্টি ছিল এমনও তো হতে পারে। যাকে সরে সরে যেতে দেখেছিলাম সেই হয়তো স্থির ছিল আর স্থির-প্রাজ্ঞ আমিই হয়তো চলনশীল ছিলাম। যাই ঘটে থাকুক না কেন মোট ফলাফল ছিল শূন্য।

তবে একথাও ঠিক যে ভূত যেমন প্রতিটি পাতার আড়ালে, ঝোপের পেছনে আর প্রত্যেকটি পরিত্যক্ত ঘনকালো বাড়ির একাকিত্বে ওত পেতে বসে থাকে না, তেমনি প্রেমের ফাঁদও পাতা নেই প্রতিটি পথের মোড়ে, রকের কার্নিশে আর স্কুল-কলেজের ক্যানটিনে। তবুও সে আছে। আছে সর্বত্রই। আছে আগে-পিছে, ডাইনে-বাঁয়ে, উপরে-নিচে, স্কুল-কলেজের করিডোরে আর লাইব্রেরিতে। উর্ণনাভ পরনির্ভরশীল নয়। সে জাল বোনে আপন খেয়ালে, মন্ত্র-তন্ত্র, নিজের দেহ-নিঃসৃত মসৃণ-সূক্ষ্ম সুতোয়। মানুষের জন্যে জালের সুতোটির সন্ধান পাওয়া ভার। তবে চোখের চাহনিতে, ভ্রূ-এর ভঙ্গিমায়, চলনের ছন্দে আর বাহুর দোলনে প্রকৃতি যেমন সহজেই পুরুষকে অবশ করে অদৃশ্য বন্ধনে বাঁধতে পারে, তেমনিই পুরুষের আছে অসীম ধৈর্য, অনন্ত অপেক্ষা আর অফুরন্ত সময়। একজন যেমন মসৃণ সুতোর জালের জন্যে ফাঁদটি পেতে চলে, অন্যজন তেমনি পৌরুষের দড়িতে খাঁচাটি তৈরি করে তোলে। কম নয় কেউই। তবে ঐশ্বরিক বরপ্রাপ্তিতে প্রকৃতিই কুশলী, অঘটন ঘটন পটীয়সী। চোখের একটি মাত্র কটাক্ষে পুরুষের কটি-ভঙ্গ হতে পারে, ভ্রূ-যুগলের একটি মাত্র বঙ্কিম মটকানিতে মট্ করে শিরদাঁড়া ভেঙে যেতে পারে যে কোনও পুরুষের। এ-ক্ষমতা প্রকৃতি ঠাকরুন পুরুষকে দেন নি, দিয়েছেন তাঁর অন্দরমহলের আপন আত্মজাকেই।

স্কুল-কলেজের পথে ঐ দেখুন সকাল-বিকেল অবস্থান-সাধনায় কতো জনে দিনের পর দিন অপেক্ষা করে বসে আছে। ছাত্রীরা কলকাকলি-উচ্ছল চলেছে সেই পথে, ফিরেও আসবে সেই পথে। পথের ধারে, পথের বাঁকে-বাঁকে এই সব অবস্থান সব সময়ে চোখের দৃষ্টির প্রসাদে অথবা মুখের অস্ফুট ভাষায় অভিসিঞ্চিত হয় না, হচ্ছে না। তবুও। তবুও অপেক্ষার একাগ্রতা কি একটুও কমে? ফাঁদে পড়বে বলে এই আকুতি, এতো করুণ অপেক্ষা, অথচ সেই ফাঁদের দেখা নেই! হঠাৎ একদিন দেখতে পাবেন এদের একজোড়া দল-মধ্যে আর নেই, কখন যেন দু'জনে দু'জনের মধ্যে এক হয়ে হারিয়ে গেছে। অবাক হবেন না। এই নিরুদ্দেশের পথে যাত্রায় থানা-পুলিশের কিছুই করণীয় নেই, জানতে পারলে অভিভাবকদের অন্তর্জ্বালা আছে। বাড়ি থেকে দলবদ্ধ বিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়ে গমন শুধু ধোঁকা, অন্যসকলকেই বোকা বানানোর মন্ত্র। পথিমধ্যে দলত্যাগ দলের অজানা নয়। কিন্তু সমর্থনের কর্ণধারটি নোতুন দ্বি-দ দল গঠনে প্রবহমান। দুটি একটি চকোলেট-চুইংগামের

কখনও সময় করে নেওয়া, কখনও বা রেস্টুরেন্টের পর্দার আড়ালে ক্ষণিক সান্নিধ্যের সুযোগ পাওয়া।

যারা স্কুল কলেজের পথ পায় না তারা? পাড়ার মোড়ে ল্যাম্পপোস্টের ভাঙা বাতির তলায়, পড়ো শিব মন্দিরের দালানে আর গঙ্গার অপ্রচলিত ঘাটে এদের ফাঁদে পড়ার প্রশস্ত ব্যবস্থা। সিনেমা হলের জনবহুল একাকিত্বে, হাওড়া স্টেশনের ভিড়-ভিড়াক্কার প্ল্যাটফর্মের নির্জনতায় অথবা পাড়ার মুদিখানায় চা-পাতা চিনি অথবা দেশলাই কেনার সুযোগে এরা আপন-আপন ফাঁদকে নিজের নিজের বেড়ি বানাতে উর্ণনাভের নিশ্চয়তায় ধীরগতি এগিয়ে চলে।

আগে ভেবেছিলাম যে কোনও এক বগা ফাঁদে পড়ে অসম্ভব কাঁদছে। ছোটবেলায় বগাকে চিনি নি। এই ফাঁদটিই বা কি, কিসের তৈরি তাও পরিষ্কার ছিল না। তবে বগার কান্না শুনে, কান্নার কষ্টের কথা ভেবে অশেষ দুঃখ হত। আহারে! বেচারি বগা কতো অসহায়। মনে হত একটা সরলমতি প্রাণ কুটিল চক্রব্যূহের অভ্যন্তরে অনন্ত দুঃখে কেঁদে চলেছে। অনেক পরে বুঝেছি যে এই বগা আমরা প্রত্যেকেই। ফাঁদটি দিল্লির লাড্ডু। আর আমরা যে ফাঁদে পড়ে কাঁদি সেটা ফাঁদের জন্যে নয়, আটকা পড়েছি বলেও নয়। আমরা কাঁদি তার কারণ কান্নাটাই একমাত্র 'নীট' পাওনা বলে। প্রেমের আগুন যেমন জ্বলে না জ্বালায়, প্রেমের ফাঁদ-ও তেমনি কাঁদে না কাঁদায়।

আরও পরে, অনেক ভেবেচিন্তে, এখন বুঝেছি যে আসলে এই ফাঁদটা কোনও বাইরের বস্তু নয়, একটা ভেতরের ব্যাপার। জীবনের আয়নায় এই ফাঁদ-টা আসলে আমাদের ভেতরটারই প্রতিবিম্ব। সময় হলে ফাঁদটাকে আমরা তৈরি করি, বাইরে ছুঁড়ে দিই আর তার মধ্যে পা-গলিয়ে দিয়ে প্রথমে শিহরণ, পরে নিজেকে অনুশোচনায় জড়িয়ে পড়ি। অনেকটা সেই সরীসৃপটির মতো যে নিজের ল্যাজটিকে পরের মনে করে মনের আনন্দে খেতে শুরু করে! আমরাও প্রেম-বৃত্তে ঢুকে পড়ে নিজেদের তৈরি ফাঁদে নিজেদের মাথাটিকে অবলীলায় গলিয়ে দিই। তার পরে আমার অহংকে প্রতিদ্বন্দ্বী-অস্তিত্ব দিয়ে চক্রাকারে ঘুরপাক খেতে থাকি স্বসৃষ্ট প্রেম-ব্যূহের বৃত্তে। আমাদের খাদ্য নিজের ল্যাজটি নয়, সময়। যৌবনে প্রেমের ফাঁদে পড়ে সময়ের চর্বণ যখন শেষ হয় তখন হঠাৎই একদিন আবিষ্কার করি যে সময় শেষ হয়ে গেছে, বার্ধক্য শুরু হয়ে গেছে। আর সেই নিঃশেষিত সময়ের গর্ভে জন্ম নেয় আমাদের অনুশোচনা। অনেকাংশে এই অনুশোচনারা আমাদের নিজেদের মতোই দেখতে হয়, চিনতে পারি আত্মজ বলে। রাগ করবেন না। এই হল বগার ইতিহাস, ইতিহাস যা 'রিপিটস ইটসেলফ'। বগা যে কাঁদে—ফাঁদে পড়িয়া বগা কান্দেরে—সে অনেক কষ্টেই কাঁদে, অনেক দেখেশুনেই কান্দে।

আবার, ফাঁদে পড়লেও যেমন কাঁদি, না পড়তে পারলেও তো কাঁদি। এটাই তো অদৃষ্টের পরিহাস। দিল্লির লাড্ডু। যাদের 'আমি'-টির কাছে প্রেমের ফাঁদ বেয়ে একজন 'তুমি'-র আবির্ভাব হল না তারা নিজেদের অক্ষম-অভাজন হা-হতোস্মির পর্যায়ে ফেলে হাহুতাশ করে। তারা কষ্ট পায় এই ভেবে যে তাদের হৃদয় ডালির পানের পসরা ব্যর্থ হয়ে গেল। কারণ জীবনে-জীবন যোগ করাই হল না। তারা তাই জানতেই পারল না যে জীবনে জীবন যোগের ব্যাপারই নয়, বিয়োগের বিষয়। এই জীবনটা একটা নিজের ব্যাপার, সম্পূর্ণ নিজের মধ্যেই সে ছিল-আছে-এবং-থাকে। যেই আর একজনের সঙ্গে 'যুক্ত' হল অমনি কিয়দংশে 'বিযুক্তই' হল। এই বিয়োগ বা ভাগ করে না নিলে দুই-এ মিলে এক হবে কি করে? ভেবেই দেখুন একটি অহং মার না খেলে অন্য অহং তুষ্ট হয় না।

জীবনে জীবন যোগ করতে তাই বিয়োগ অনিবার্য। আর তখনই তো বন্যার ক্রন্দন রোল গানের মন্ত্রণায় জমা পায় ভাটিয়ালি সুরে, মেঠো পথে আর অনুশোচনার বিশাল প্রান্তরে।

তাই যদি বয়স কম হয় তাহলে সামনে দেখুন, যদি ওপারের দিকেই এগিয়ে গিয়ে থাকেন তাহলে পিছনের দিকে তাকান। দেখবেন ধাপে ধাপে যত ফাঁদ দেখা যাচ্ছে তার সবগুলোই যেন রাংতার বেষ্টনে মোড়া তিক্ত বড়ি! তরুণ বয়সে ফাঁদে পা দিয়েছেন তো মা-বাবার কানমলা, গৃহ-বন্দি চোখের জলের ধারা। অথবা কুড়িতেই বুড়ি, যদি ফাঁক তালে 'গোল' দিয়ে ফেলতে পারেন বম্বের উপকণ্ঠে অথবা কলকাতার কোনও অচিন-কোণে। যদি যৌবনে কুখ্যাত-ফাঁদ-সলিলে নিমজ্জিত 'হয়েন' তাহলে একদিকে 'কান-খোলকর-শুন-লেও' এর হুংকার অন্যদিকে 'ম্যায় কৈ বাচ্চি নেহি হুঁ'-র ঘাড়-শক্ত উচ্চারণে মাঝখানে আপনি উলুখড়ের কৈবল্য পেয়ে যাবেন। স্বতন্ত্র জীবন যাপনের নৈকট্যে প্রথম প্রথম শাখিতে শাখিতে কোকিলের কুহু, ফুলে ফুলে ভ্রমরের গুঞ্জন, নদীর স্রোতে স্রোতে জলের কলতান শুনতে পারেন। কিন্তু অচিরেই জেনে যাবেন যে যাপন একটি সংগ্রামের বিষয় এবং তাতে পয়সা লাগে, শয়নে বিছানা লাগে, প্রেমের জন্য খাদ্য অনাবশ্যক হয়ে যায় না। ফাঁসটি ক্রমশই ফাঁস হয়ে চেপে বসতে চাইবে। অনেক ক্ষেত্রেই প্রেমিক-প্রেমিকা স্বতন্ত্রভাবেই এই ফাঁসির দড়িটি হয়ে দেখা দেয়, অনেক ক্ষেত্রে পুত্র-কন্যারাই মাধ্যম। অন্য-পরে আর কি কথা? সে তো সব সামাজিক দায়, পারিবারিক দায়িত্ব, ব্যক্তিগত কর্তব্যাকর্তব্য সমূহ আছেই। বোঝার উপর শাকের আঁটি না শাকের আঁটির সঙ্গে সংসারের বোঝা সে বোঝা বুঝতে গভীর জ্ঞানের দরকার হবে না!

আর প্রৌঢ়ত্বে পৌঁছে যদি ইচ্ছা হয় সেই ফাঁদের কোমলতা পরীক্ষা করে দেখতে? অনেকেরই তো হয়ে থাকে। তাহলে? এই তাহলের উত্তর বড় সহজ নয়। ততদিনে জীবনের রোদ-জলে রুক্ষ-দেহ, শুষ্ক মন প্রায় নির্জীব হয়ে পড়ে। প্রাণের মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তার পশ্চিম গগনে হেলে পড়ে। জীবন তখন যৌবনের অঙ্ক আর কুড়ানোর আকাঙ্ক্ষা রাখে না, হিসেবের পঙ্ক আকণ্ঠ হয়। ভরা ডুবি বাঁচাতে তাই যদিও বা কোনও কোমল-প্রকল্প-অন্বেষণ-স্পৃহা উঁকি ঝুঁকি দেয়, তবুও তা শক্তির অভাবে, চাঞ্চল্যের অবসানে খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে বেতো রুগীর মতো কায়ক্লেশে অবশিষ্ট রক্ষার তাগিদে সন্তর্পণ হয়ে ওঠে। সেই অঙ্কের হিসেবে ঘড়ায় তোলা অবশিষ্ট প্রাণবারিটুকু মেপে মেপে খরচ করতে গিয়ে ফাঁদে পড়ার রহস্য-রোমাঞ্চটাই মার খেয়ে যায়। তখন আর কানের ভয় নেই সত্যি, বদ্ধ ঘরে দিনযাপনের ক্লেশও অনুপস্থিত, নেই গৃহ-বহিষ্কারের সম্ভাবনা, নেই অর্থ-সম্পদের অভাবের ভয়। কিন্তু এই সব নেই-নেই এর মধ্যে জীবন-বোধের স্বাদ-টাও যে কখন কোন ফাঁকে নেই হয়ে গেছে তা 'টাকে' হাত বুলোতে বুলোতে, অথবা পাকা চুল দু'চার গাছির উৎপাটনের মধ্যে বুঝে ওঠা ভার হয়ে পড়ে।

শুধু কি তাই? অদূরে দাঁড়ানো নিঃ বৃদ্ধ তখন তার ফোকলা দাঁতের আড়ালে আনমনে হাসছে, এদিকে সহযাত্রীরা ভবিষ্যতের সন্তান পালনের ভয় দেখাচ্ছে, বলছে 'কবে তাদের বড় করবি, মানুষ করবি?' সত্যিই তো প্রৌঢ়ত্বে ফাঁদে পা দিলে 'বাবা' ডাকার আগেই তো তার সন্তানের কাছে সে 'দাদু' হয়ে যাবে। নিজের সন্তান যখন 'পিতাকে' খুঁজতে এসে 'দাদু'-কে দেখবে তখন? প্রৌঢ়ত্বে ফাঁদটা আর প্রেমের থাকে না জর্জর হয়ে যায়। ফুলের সৌন্দর্যও পাওয়া গেল না, সৌরভটি রইল ধরা ছোঁয়ার বাইরে, শুধু যেন কাঁটাগুলোই আসল হয়ে হাজির হল। সব পাখিগুলোই যেন কাকের

কন্ঠে ডাক দিয়ে যায়। মৌমাছিদের নিয়েই সত্য তখন তাদের হলেই।

জীবনের জলস্রোত যখন সচল থাকে তখনই নদীগর্ভের বালি-বিছানাটি কলতা দেয় সেই বহমানতাকে। সুখের কর। জীবন নদীটি যখন শুকায়ে যায়? বালির বিছানাটি তখন গ্রীষ্মের খরতাপ প্রেমের 'হট-বেড' হয়ে বুক-পিঠে জ্বালা ধরায়। তাই ফাঁদের কুহক যত মধুরই মনে হোক না কেন সময় পার করে দিয়ে সময়কে ধরতে যেও না। সরস যন্ত্রণা, কানমলা, লাঞ্ছিত হওয়া, তবুও সওয়া যায়, যৌবনের হিহিকার ধিক্কার তবুও সহনীয়। উপায়ে পৌঁছোনোর আগেই তাই সময়ে চলা বিধেয়। ফাঁদ-কে এড়িয়ে চলতে গিয়েই প্রকৃত ফাঁদে পা দিয়ে ফেলা সহজ। প্রেমের ফাঁদে ট্রাজেডি আছে। তার থেকে বড় ট্রাজেডি হল সেই ট্রাজেডিকে এড়িয়ে যাবার ট্রাজেডি। প্রথমটা সর্বজনীন বলেই সাহিত্যের, এবং সুতরাং জীবনের নিজস্ব সম্পদ, দ্বিতীয়টা ব্যক্তিনির্ভর বলেই বাস্তবের, এবং সুতরাং সংসারের একান্তিক ট্রাজিক।

আমাদের স্লোগান - সময় থাকতে ফাঁদে পা দাও।

ঘরের টান আর মনের ডাক :

সকাল বেলার চায়ের ট্রে সাজিয়ে মেয়ে আসে আমার বেড রুমে। মৃদু কন্ঠে হাঁক দেয় 'চা, উঠে পড়।' এই ভোর বেলাটায় আমি জেগেও থাকি ঘুমিয়েও থাকি—অনেকটা যেন একটা 'নো ম্যানস ল্যান্ড'-এ পদচারণা। পদচারণা? না, চেতনের আনাগোনা? রাতের নিদ্রাদেবী তাঁর অধিকার নিঃশর্ত ছেড়ে দিতে অনিচ্ছুক আবার দিনের আলো জানালাপথে প্রবেশ করে স্বাধিকার ঘোষণায় নাছোড়বান্দা! এই দোটানা উষালগ্নের সন্ধিকালটা একটা মন মাতানো নেশা নেশা অনুভবে যেন একান্ত আপন। একজনকে ছেড়ে দিতে মনে বাধা লাগে অন্যজনকে আবাহন না করলে চেতনার উষ্ণতার ছোঁয়া পাই না! তাই নড়ে চড়ে উঠতেই হয়, শরীকে জ্বরের টিকা পরিয়ে অবসন্ন শরীরকে দিনমানের যোগ্য করে তুলতে আড়মোড়া ভেঙে কন্যার ডাকে সাড়া দিতে হয়।

পট থেকে কাপে চা ঢালতে ঢালতে কন্যার অনেক কথক কথা শুনি। রোজই। মেয়ে আমার অনেক ভোরে ওঠে। ওর দৃষ্টিতে পূর্ব দিগন্তের অরুণ কিরণ, গবাক্ষ পথে নয় দিক-পথে স্পর্শ বোলাতে সুযোগ পায়। তাই বোধহয় উষালগ্নে ওর মনটা থাকে সরল। সরল আর গভীর। বলল, 'জান বাপি, আমি ভীষণ 'হোমসিক'! আগে বুঝিনি। এখন এই দূরে গিয়ে বুঝেছি।' মেয়েটি আমার অনেক দূরের একটা মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপিকা। সপ্তাহান্তে ঘরে ফেরে। আমার কাছে আসে। বাড়ি ওকে টানে, ডাকে। উষ্ণ চায়ের চুমুকের সঙ্গে যেন একটা উষ্ণমনের অনুভব মিশে গেল। বললাম, 'তা তো হবেই। বাড়ি বা গৃহ তো সকলকেই টানে। এটাই তো গৃহ-টান, হোমসিকনেস। স্বাভাবিক।'

দক্ষিণের জানালাপথে অনেকক্ষণ তাকিয়ে রইল। মনে হল যেন স্মরণের পাখায় ভর দিয়ে অনেক দূর পাড়ি দিচ্ছে। বোধহয় যেন কিছু একটা খুঁজছে। বাইরের বৃষ্টি-স্নাত সবুজ পাতাগুলো তাদের রাতভোর জলপানের তৃপ্তিটুকু চিকন শ্যামলিমায় সর্বাঙ্গে মেখে আছে। মৃদুমন্দ বাতাসের হিল্লোল আর শিশুরবির চিক চিক আলপনা সেই সবুজকে মনোমুগ্ধকর করে তুলেছে। আমার দৃষ্টি সেই বর্তমানে। কিন্তু মেয়ের চোখে বোধহয় প্রকৃতির নয়, নিজের অতীতপ্রায় সবুজের পরে পড়বে

ঘুরে ঘুরে ফিরছিল। বলল, 'আগে তো কখনও এমন গৃহ-টান বোধ করিনি! যদি এই ঘরের ডাকটি স্বাভাবিক হত তাহলে তা এতদিন শুনি নি কেন? এখন যেমন ডাকটা পরিষ্কার শুনতে পাই, যেমন তীব্র করে অনুভব করি, যেমন ধাঁকু পাঁকু করে নাড়া দেয় তেমনটি তো কৈ আগে ঘটে নি?'

পট থেকে এবারে নিজের হাতেই দ্বিতীয় কাপ ঢেলে নিলাম। এ কাজটি আমার মেয়েরা এক্তিয়ারে পড়ে। আজ কিন্তু সে নিজের অতলে হারিয়ে গেছে তাই তার দৃষ্টি পটের স্পাউট থেকে স্বর্ণবর্ণ প্রবাহের দিকে নিবদ্ধ থাকলেও দেখাটা নিশ্চিতভাবেই অন্তরের অনুভবের প্রবাহের দিকে নিমগ্ন ছিল। বললাম, 'স্থান-কাল-পাত্র বলে একটা কথা সকলেই বলেন। অতি ব্যবহারে যেমন বস্তুর আকার ক্ষয়ে ক্ষয়ে যায়, অতি ব্যবহারে তেমনি বোধহয় কথার অন্তর্নিহিত তাৎপর্যও যায় খেয়ে যায়। দার্শনিক কান্ট তো এই স্থান-কালকে অনিবার্য চশমা বলেই মত প্রকাশ করেছেন। তুমি তা জান। পাত্রকে জানতে গেলে তার জানাটাকেই আগে জানতে হয়। আর আমাদের সকলের, এবং প্রত্যেকের, সেই জানাটা স্থান-কালের প্রকৃতি প্রোথিত কনট্যাক্ট লেনস মারফৎ-ই তো হয়ে থাকে।'

'একেবারে সাদামাঠা কথাকেও তুমি কেমন অবলীলায় কঠিন-দুর্জ্ঞেয় করে ফেলতে পার তার নমুনা আমার থলিতে অজস্র অক্তস্র!' সকালের চায়ের তরল-উষ্ণ আসরকে দর্শনের দোরগোড়ায় টেনে নিতে দেখে মেয়ে যেন একটু রাগই প্রকাশ করে বসল। বলল, 'কঠিন কথাকে সোজা করে বলার জন্য দরাজ প্রতিভা লাগে, কিন্তু একটা সহজ কথাকে সহজ করে বলতে কি লাগে? খুব জোর একটু সহজ উপলব্ধির সরল ভাষা! সে কি তোমার ঝুড়িতে একেবারেই বাড়ন্ত?'

বিপাকে পড়লে আত্মসমর্পন সহজতম বিধি বলে মানা। আর যদি প্রতিপক্ষ নিজের কন্যা হয় তবে কাল বিলম্ব মহাভারত সৃষ্টি করতে পারে! তাই দু'টি নীতিকেই একসঙ্গে প্রয়োগ করে বলে উঠলাম, 'নিজের ঝুড়িতে এত কথা আছে যে যোগানের আধিক্যে তারা নিজেরাই নিজেদের ভিড়ে মার খাচ্ছে, হারিয়ে যাচ্ছে। তাদের বাজার দর বিষয়ে যথেষ্ট আশাবাদী হতে পারি কৈ? সে সব কথা বলতে বিশেষ ভরসা পাই না, পাছে লোকে শুনেই ফস্ করে বলে বসে লোকটা কিছুই জানে না! তাই কথার মাঝে মাঝে যতি চিহ্নের মত, দেশের নয়, বিদেশের গণ্য-মান্যদের হাজির করে দিতে পারলে বক্তব্যের মাত্রা যেমন বাড়ে ওজনটাও তেমনি ভারি হয়ে ওঠে।'

মেয়ে বলল, 'তা, এই সাত সকালে বক্তব্যের মাত্রা আর ওজন নিয়ে না ভেবে একটু সহজ-সত্য নিয়েই না হয় ভাবলে। কথাটা ছিল গৃহ-টানের, হোমসিকনেস্ নিয়ে। তাই সেই ঘরের ঘরোয়া কথাটাকে গ্রীক্-জার্মান ইংল্যাণ্ড-আমেরিকার ঘোল না খাইয়ে নিজের কথায় একেবারে নিজের মত করেই বল না!'

ইংরেজি অনুভবটা নিয়ে তাহলে মাথা ঘামাব না। কারণ যারা হোম ছেড়ে নেটিভদের দেশে নানা কারণে এসেছে, আসতে বাধ্য হয়েছে তাদের সেই দিনও নেই সেই অনুভবটাও তাই নেই। থেকে গেল ঐ প্রকাশটা, হোম সিকনেস্ শব্দ-প্রকরণটা। এখন এই নতুন দিনের নব্যপ্রজন্মে এই প্রকাশটাই, আমাদের প্রবাসী ভারতীয়রা ব্যবহার করে থাকেন। তাঁরা ঘরোয়া মনে গৃহ-টান বোধ করেন আর পার্টিতে মিটিং-এ হোম সিক্‌নেস্ প্রকাশ করেন। দেশ ছাড়লেই দেশের টান বাড়ে, দেশ ছাড়া হলেও বাড়ে। আমরা অনেকেই তো একসময়ে দেশ ছাড়া হয়ে বারা পাড়া জীবনের দুর্ভোগ

খেয়ে খেয়ে কালক্রমে মাধ্যাকর্ষণের মত ঠাঁই পেয়েছি, সেই ঠাঁইতেই ঘর বানিয়ে সুখ-দুখ নিয়ে থেকেছি। কিন্তু হলে কি হবে, এই গৃহ দীর্ঘদিনেও তো সেই পুরের টানটি তৈরি করতে পারে নি?

'এই গৃহ আর সেই গৃহ ব্যাপারটাতো বেশ বুঝতে পারলাম না! তোমরা যারা বাস্তুহারা হয়ে এই দেশে এসেছিলে তারা সকলেই একটা গৃহ ছেড়ে অন্য একটা গৃহের অংশ হয়েছ। তাতে কি হল? টানের হেরফের কি করে হয়?'

এই দ্বিখণ্ড হয়ে গিয়েই আমাদের হয়েছে জ্বালা। সেই জ্বালা সময়ের পলি পড়ে পড়ে অনেকটাই আবছা অনুভবে চলে এসেছে ঠিকই কিন্তু একেবারেই নেই এ কথা বলা যায় না। গৃহের টানটা তাই আমাদের দিনে একরকম আর রাতে অন্যরকম করে বুঝেছি। দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। তোমাদের বেলায় দিনরাত্রি একাকার হয়ে গেছে। তোমরা তো একই গৃহে জন্ম থেকে থেকে গেলে। তাই তোমরা গৃহের বাইরে গেলে গৃহকে দিনের চেতনে আর রাতের অবচেতনে সমানভাবেই খুঁজে বেড়াও, খুঁজে পাও। একটা টানেই তোমাদের মন টন টন করে। আর আমাদের বেলায়?

'তোমাদের বেলায় তফাতটা কোথায়? বাড়ি থেকে বাইরে গেলে তোমাদের বেলাতেও তো সেই গৃহটান দিনের চেতনায় আর রাতের অবচেতনায় টান ধরায়। তাহলে?'

'এই তাহলের উত্তর আছে আমাদের সর্বচেতনায়, অস্তিত্বের পরতে পরতে। আমরা যখন এই গৃহে থাকি তখন আমরা ফেলে আসা গৃহের ডাক শুনি, টান অনুভব করি। মন আনচান করে। রাত্রে নিজেদের অগোচরে, নিজেরাই মনের টানে আমরা চলে যাই সেই টানে সাড়া দিতে। ফেলে আসা গৃহের প্রাঙ্গণে। সেই জল-জঙ্গল, সেই মাঠ-ঘাট, সেই পথ-প্রান্তর, স্কুল-বাজার, হাট-গঞ্জ—সেই সব, সবই আমাদের ডেকে নিয়ে গেছে, কাছে পেয়ে উদ্দাম আনন্দে মেতে উঠেছি। প্রতি রাতের এই গৃহ-অভিযানের কোনও ব্যতিক্রম ছিল না, দীর্ঘদিনই—দীর্ঘরাত্রিই—আমাদের গৃহের ডাকে সাড়া দিতে হয়েছে। জেগে উঠে বিরস মুখে বর্তমানের তিক্ত স্বাদ বোধ করেছি। মনে হয়েছে বর্তমানটাই স্বপ্ন, অসত্য। আর প্রত্যয়ে স্থির হতে চেয়েছি স্বপ্নটাই সত্য, স্বপ্নটাই বাস্তব। তারই বোধ গৃহের টান আর ঘরের ডাক আমাদের বড়ই উতলা করেছে।'

'এ রকম তো আমাদেরও হয়। আমরা যখন বাড়ির বাইরে পাহাড়ের দেশে বা সমুদ্রের পাড়ে বেড়াতে যাই এবং বেশ কিছুদিন গৃহ ছাড়া থাকি তখন আমাদের এই সব ঘর-গেরস্থালী, লোকজন, রাস্তাঘাট, বন্ধুবান্ধব মাঝে মাঝেই রাতের স্বপ্নে আর দিনের অনুভব ভাবনায় দেখা দেয়। তফাতটা সঠিক বুঝলাম না তো!'

'তফাতটা তো এই এখানেই। আমরা আর তোমরা যখন একই সঙ্গে বাইরে যাই, যাই সেই একই পাহাড় বা সমুদ্রের ধারে তখন কিন্তু তোমাদের গৃহ টানের উৎস থাকে একটি মাত্র ফেলে আসা গৃহের অঙ্গনে সীমাবদ্ধ, আর আমাদের বেলায় সেই উৎস থাকে দুইটি বা আরও বেশি। তোমরা যে ঘরের ডাক শোন তার মধ্যে ভেসে আসে প্রবাসীকে কাছে টানার সুর। আমাদের কাছে সেই ডাকটি বিচ্ছিন্নতার, চিরবিচ্ছেদের বেদনা হয়ে ভারি হয়ে ওঠে কারণ জেগে উঠেই আমরা আহত বোধ করি ছেলেবেলার গৃহ-কোণটিকে ভেবে। সে যে আর আমাদের নেই যেমন আছে তোমাদের বেলায় শৈশবের গৃহকোণের ডাক! সেই একই সুরের ডাক আমাদেরও আছে, কিন্তু তা

শৈশবের নয়। আর এটা তোমাকে মানতেই হবে যে সে-স্মৃতি শৈশবের অনাবিল আনন্দের স্পর্শে জীবন্ত নয় তা তেমন করে নাড়া দেয় না, দিতে পারে না। বাল্যকালটা আর তরুণ বেলাটা সব-কিছুকেই স্পর্শ করে, যেখানে সেখানে মনের ছোঁয়াটি রেখে রেখে যায় সেই সব কিছুই হয়ে ওঠে সজীব, সরস, প্রাণবন্ত। তাই সেই স্মৃতি সুখস্মৃতি। সেই স্বপ্ন সুখস্বপ্ন। তোমাদের সুখস্বপ্ন আছে, আমাদের হারিয়ে গেছে। তোমরা তোমাদের 'হিয়ারো রি-ভিজিট' করতে পার, আমাদের 'হিয়ারো' যে হারিয়েই গেল!'

'কিন্তু তোমাদের তো আর একটা 'হিয়ারো' আছে, আর একটা গৃহ। এই বর্তমানের ঘরগৃহস্থালী সেও তো বহুস্মৃতি বিজড়িত! এবং সেই গৃহ তোমাদের বেলাতেও যা আমাদের ক্ষেত্রেও তাই। তাহলে আর সেই ফেলে আসা সুদূর, মৃতপ্রায় অতীতের গৃহকোণের প্রয়োজনই বা কি! একই বর্তমানের টানে আমরা তো একইভাবে পীড়নকে বা আনন্দকে অনুভব করতে পারি—বিরহের পীড়ন আর মিলনের আনন্দ! মনের গভীরে আর একটা গৃহের টানকে অন্তরের অর্গলবদ্ধ সুরক্ষায় সদাসর্বদা বাঁচিয়ে রাখার চেষ্টার মধ্যে একটা আবেগের অকারণ পোষণ ঘটছে বলে মনে হয় না কি? একটু যেন 'ম্যাসোকিস্টিক'? বেদনার আরোপ নিজের অন্তরে আত্মতৃপ্তির, এক ধরনের আনন্দ বোধের অনুভব জাগায়, সেই বেদনা মধুর আনন্দই যেন তোমরা পান করতে চাও! অপরাধ নিও না, আঘাত করা আমার উদ্দেশ্য নয়, জানার আকাঙ্ক্ষায় প্রশ্ন মাত্র!'

'নিজেকে আহত করে যে আনন্দ বোধ, যাকে ঐ 'ম্যাসোকিজম' বলা হয়, আমাদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা দেখতে অনেকটা সেরকম হলেও কিন্তু আসলে তা নয়। তা যে নয় তা বুঝতে গেলে একটা সংবেদনশীল মনের দরকার। আর সেই রকম একটা মন, তুমি জান কি না জানি না, এই প্রজন্মের সন্তানদের বেলায় স্বাভাবিক গড়ে ওঠে না, অনেক যত্ন এবং কষ্টে তৈরি করতে হয়, করে নিতে হয়। এখনকার ছেলে মেয়েদের দোষ দেওয়া আমার উদ্দেশ্য নয়, অবস্থার বিবরণ দেওয়াটাই অভিপ্রায়। জীবন একটা সংগ্রামের নাম। তোমাদেরই কথা। সেই সংগ্রাম অতীতেও ছিল বর্তমানেও আছে। থাকবে ভবিষ্যতেও কিন্তু সেই সংগ্রামের বাতাবরণ, চরিত্র, উদ্দেশ্য এবং ঠিকানা যেন কেমন অন্য রকম হয়ে গেছে। আর তাই ঊর্ধ্বশ্বাস প্রতিযোগিতা, অকারণ হানাহানি, অকরুণ আত্মনিধনও, কঠোর কঠিন পরপীড়ন এবং অদ্ভুত অর্থ-স্বার্থ-সম্পদের মধ্যে হাবুডুবু খাওয়াটাই যেন বর্তমানের নাগপাশ হয়ে উঠেছে। আমাদের শৈশবটা ছিল একটা সুদীর্ঘ ক্রীড়াভূমি, জীবনের পুষ্টি সংগ্রহের সুপ্রশস্ত ক্ষেত্র। শৈশব তারুণ্যের চারণভূমি থেকে আমরা সারাজীবন রসদ সংগ্রহ করে চলার মত অফুরন্ত যোগান উৎসটি খুঁজে পাই। আর সেই আনন্দটি বোধহয় তোমাদের শৈশব বলতে বিশেষ কিছু আর বাকি রাখে না, তরুণ মনটাকে সবুজের স্পর্শ আর শান্তির ছোঁয়ার চাইতে সম্ভাব্য একটা কাল্পনিক ভবিষ্যতের দাঁড়িপাল্লার দোদুল্যমান সমৃদ্ধির সাফল্য ব্যর্থের কাঁপনকালে, গুঁড়িয়ে, নষ্ট করে দিই!'

মেয়ে বলে, 'তোমাদের শৈশবের সঙ্গে আমাদের শৈশবের তুলনা তোমরা হয়ত অনেকটাই করতে পার। আমাদের পক্ষে তা অসম্ভব। কিন্তু গৃহের টানটা তো আমরা আমাদের মত করেই অনুভব করি। করতে বাধ্য। সেই টানটাই তো এখন এই প্রায় মধ্য জীবনে এসে অত্যন্ত তীব্র বলেই মনে হয়। আমিও এই অনুভবটা করেছি। যখন প্রায় মাসখানেক পাহাড় চড়া শিখতে বাড়ির বাইরে ছিলাম তখন যেন দিনের বহু সময়ে, একান্ত সময়ে, আর রাতের প্রায় সবটা সময়েই, আমার

মধ্যে, বাড়ির ডাকটা মনের অতল থেকে সমতলে যোরাফেরা করত, উঠানামা করত। তবেই তো আমরা বিকল বোধ করেছি। আমরা বড়রা সেই নিয়ে নিজেদের মধ্যে রস-রসিকতাও করেছি। ডাকটা আমরা সকলেই কমবেশি শুনেছি, এখনও শুনি। কিন্তু কে ডাকে তা তেমন করে ভেবে দেখিনি।'

বলি, 'আমার মনে হয় সেই ডাকটা আসে স্মরণের সায়র থেকে। স্থির অচঞ্চল অতীত আমাদের অস্থির চঞ্চল শৈশবের, তারুণ্যের সজীব শত শত ছোঁয়া গায়ে মেখে কারো উপেক্ষিতাদের মত বাস্তু-বাস্তব জীবনের উপেক্ষিত হয়ে করুণ নয়নে আমাদের ধেয়ে চলা ঊর্ধ্বশ্বাস বর্তমানের দিকে অপলক তাকিয়ে থাকে। আমাদের নজর দেবার ফুরসত হয় না। কর্মব্যস্ত ভবিষ্যৎ-দৃষ্টি সংসারের সন্তান সন্ততিরা যখন উদ্দেশ্য আর লক্ষ্যের টানে ছুটোছুটি করে তখন সেই সংসারেরই একান্ত নির্জনে অর্ধ-নির্মীলিত-দৃষ্টি স্নেহধন্যা মায়ের মতই সেই স্মৃতির সায়রটি আমাদের জীবনের মূল দৌড়ঝাঁপের পাশটিতে বোধহয় শান্ত সময়ের অপেক্ষায় বসে থাকে। তাই বোধহয় চলমান সংগ্রাম মুখর নিত্যদিনের ঝকমারি থেকে একটুকু সময় পেলেই আমরা ফিরে তাকাই সেই শান্ত সায়রের অনাবিল অতীতে। টানটা আসে সেখান থেকেই, সেই অপেক্ষমাণ অতীত স্মরণ জননীই আমাদের ডাকে, ডাক দেয়। স্নেহের নিটোল স্পর্শটি সেই ডাকের মধ্যে ধ্বনিময় হয়ে ওঠে, শিশু বয়সের ছোট ছোট আঙুলে মায়ের আঁচলের সন্তর্পণ টানটুকুর মত রিন রিন বেজে ওঠে সেই টান।'

'তাহলে কি ঘর বাড়ি নয়, গাছ-পালা, লতা গুল্ম, বাগ-বাগিচা, পথ-ঘাট নয়, কিন্তু এই সকলের স্মৃতি? মনের লেনদেনে, অন্তরের যোগাযোগে আর হৃদয়ের ছোঁয়ায় যে অনুভব সকল চারদিকের বস্তু-বস্তুতে জড়িয়ে থাকে ছড়িয়ে থাকে তাই? সেই সব অনুভবই আমাদের টানে? ডাকে?'

'আমার তো মনে হয় তাই। বনবালা আজন্ম অরণ্যাশ্রমবাসী শকুন্তলার বিদায় ক্ষণটি মনে কর না কেন? পৃথিবীর কতভাগ সঠিক জানি না, আমাদের দেশের আশি ভাগ গ্রাম-সবুজের পরিবেশে বেড়ে ওঠা শকুন্তলারা প্রকৃতির অভাবে অভুক্ত নয়। যে কোনও বৃক্ষলতা যে কোনও প্রাণীই কিন্তু শকুন্তলার মনে অনুরূপ বিরহ বেদনার তীক্ষ্ণ করুণ স্বরটি ধ্বনিত করত না। আশৈশব পরিচয়টিই আসল। পরিচয় প্রাণপ্রতিষ্ঠায় প্রকৃতিকে সজীব করে তোলে, আবেগ বিধুর নৈকট্য দেয়, অন্তরের ছোঁয়াটুকু প্রতিটি কিশলয়ে, প্রতিটি লতাদেহে বৃক্ষকাণ্ডে পত্রপল্লবে ছড়িয়ে ছড়িয়ে দেয়। হৃদয়ের সংবেদনশীল স্পর্শটিতে প্রতিটি গৃহ-প্রাঙ্গণ পথ ঘাট মাঠ প্রান্তর মনের বুনোট পেয়ে পেয়ে আপন হয়ে ওঠে। তাই তো সেই সব সমৃদ্ধ স্মরণরা সায়রের শান্ত প্রশস্ততা নিয়ে আমাদের টানে, টেনে ধরে, ডাক দেয়।'

'শৈশবের স্মৃতিতে স্বার্থের কাঁটা থাকে না, তাই কি তারা এতো অনাবিল, এত মন কেমন করা মত আপন?'

'অনেকটাই তাই। পরবর্তী জীবনের সংগ্রাম সংগ্রহ প্রাপ্তির পরিসরে আমরা যা চাই তা পাচ্ছি, একটু নিশ্চিন্ততা, একটু অবকাশের সুখ। সেখানেও গৃহ আমাদের টানে, ডাকে। শত-আনন্দ সহস্র দুঃখ নিয়ে আমরা প্রতিনিয়ত বাঁচি। সেই আনন্দ-বেদনার বুনোটে আমাদের বর্তমানগুলো আমাদের ছিন্ন-ভিন্ন একাকী জীবনে ব্যক্তিকে, স্বতন্ত্র স্বনাম ব্যক্তিটিকে, সত্য করে তোলে। গৃহের বাইরে

আমরা এক একজন লোক মাত্র, ইনডিভিজুয়াল মাত্র, হয়ত বা সংখ্যা মাত্রও। একমাত্র গৃহের অভ্যন্তরেই আমরা ব্যক্তি, আমরা মানুষ, পার্সন হয়ে উঠতে পারি। সকলের মধ্যে হারিয়ে যাওয়া আমিটাকে আমরা খুঁজে পাই গৃহের বাতাবরণে—স্বামী হয়ে পুত্র হয়ে পিতা হয়ে, মা-দিদি-কন্যা হয়ে। এই পাওয়াটাই আমাদের টানে, ডাকে।'

'তাহলে কি আমরা নিজেকে খুঁজে পেতেই গৃহের উষ্ণতাকে অন্বেষণ করি? অতীতের স্মরণ-সাগরে অবগাহন করে স্নিগ্ধ শান্তি পেতেই আমাদের আনচান, আমাদের উদগ্রীব গৃহমুখী জীবন? তা যদি হয় তাহলে গৃহের বেদনা-যন্ত্রণা-বিবাদ-বিসম্বাদ মতবিরোধ-মতানৈক্য সব ভুলি কি করে? সে সকলও তো কম বাস্তব নয়, কম সত্য নয়! এখানে একটা বিরোধ দেখা যাচ্ছে না?'

'প্রগাঢ় অন্ধকারের অসীম ব্যাপ্তির মধ্যে একটি মাত্র প্রদীপের ক্ষুদ্র আলোটুকু, শিখাটুকু অধিকতর সত্য হয় না কি? দিক-গ্রাসী অন্ধকার প্রসারে তীব্রতায় এবং অনুভবে সহস্রগুণ পরিমাণ হওয়া সত্ত্বেও তো সে ঐ অতটুকু আলোর কাছে মার খেয়ে যায়, পরাভূত হয়ে পড়ে। ঠিক তেমনি প্রবাসী জীবনে, গৃহ থেকে দূরে সমগ্রের অন্ধকারে হারিয়ে যাওয়া আমাদের অন্তর, আমাদের আত্মঅনুসন্ধান গৃহের আপন প্রদীপখানির ডাক শুনে প্রদীপ্ত হতে চায়, টান অনুভব করে সংখ্যার মিথ্যা থেকে ব্যক্তির সত্যে ফিরে আসার। পিতা-পুত্র মাতা-কন্যা ভাই-বোন হতে মনটা ছট ফট করে ওঠে। পোষা বিনি, প্রিয় বাগান, আর অন্যান্য প্রিয়-প্রিয়াদের প্রতীক্ষা দিয়ে এই ডাকটা দূরদূরান্তে ছুটে যায়।'

'মানে দা অনেকটা বুঝেছি। কিন্তু খটকা লাগছে অন্যত্র। বিজ্ঞানীরা দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, মাস পেরিয়ে বছর, বছরের পর বছর বিদেশ বিভুঁই-এ জীবন কাটায়, সন্ন্যাসীরা পাহাড়ে পর্বতে, বনে জঙ্গলে, সমুদ্রের ধারে বা নির্জনে যে যুগযুগান্ত কাটিয়ে দেয় আর গৃহ ছাড়া বাউল-বৈরাগীরা যে ঘর ছেড়ে পথকেই সম্বল করে তাদের মনে কি স্মৃতির সাগর, গৃহের নৈকট্য বা ব্যক্তিতে উত্তরণের জন্যে ডাক আসে না? তারা কি শান্ত সুখের টান বোধ করে না? শৈশব স্মৃতি বিজড়িত পত্র-পল্লব লতাগুল্ম পথ ঘাট কি তাদের অন্তরের গভীরে ডাক দিয়ে যায় না? গৃহের টানটুকুকে বিশ্বের এপ্রান্তে ওপ্রান্তে ছড়িয়ে দেয় না?'

'প্রত্যেকটি ব্যক্তিই তো সারাজীবন বহু কিছুর ডাক শোনে। ডাক আসে ক্ষেত্র থেকে—কর্মের ক্ষেত্র, কর্তব্যের ক্ষেত্র, জ্ঞানের ক্ষেত্র। তাছাড়া আছে আপনজনের ডাক, মনের গভীর থেকে লক্ষ্য-উদ্দেশ্য-আদর্শের ডাক। আছে মায়ের ডাক, জন্মভূমির ডাক এবং মাতৃ-পিতৃ-সন্তাপুরুষের ডাক। অনেকের কাছে শিল্পের, সৃষ্টির আর ঈশ্বরের ডাক তাদের সারাটা জীবনকেই ধ্বনিময় বর্ণময় করে রাখে। আবার দেখ টানটা আসে প্রধানত বাসনা থেকে, আকাঙ্ক্ষার উৎস থেকে, কামনার গভীর থেকে। ডাকটা প্রধানত বাইরে থেকে আসে। টানটা আসে ভিতর থেকে। কিন্তু সবক্ষেত্রেই ব্যক্তিটি থাকে মূল বিন্দু হয়ে। এই ডাকটা যত বড়, যত ব্যাপক আর যত তীব্র হয় ব্যক্তি ততই বিন্দু থেকে বৃহত্তর দিকে প্রসার পায়। ছোট ছোট ডাকগুলো বড় বড় ডাকের আড়ালে হারিয়ে যায়। টানের বেলাতেও এই একই কথা সত্য। গৃহের টান যত বড়ই হোক না কেন যে ব্যক্তির জীবনে আরও বড়, আরও তীব্র কোনও ডাক হাজির হয় সেই ব্যক্তি সেই বৃহৎ ডাকের হাতছানিতে জীবনের পথকে নির্ধারণ করে ফেলে। আমরা যারা শতসহস্র গৃহ-ব্যক্তি-তুচ্ছ, জন্ম-মৃত্যু সারাৎসার,

আহ্নিক-বার্ষিক-গতি জীবন যাপন করি তাতে বড় কোনও ডাক যেমন শুনতে পাই না, তেমনি বৃহৎ কোনও টানের শক্তিকেও অন্তরের মধ্যে অনুভব করি না। তাই সক্রন্দন জীবনযাত্রা শুরু করে আমরা পঞ্চভূতে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করি মাত্র। মধ্যের যাঁতায় আমাদের শৈশবের টান, সংসারের নিত্যকর্মে আমাদের জীবনের ডাক আর শেষ জীবনে অহেতুক বেঁচে থাকা এক একটা অনির্বচনীয় জীবন-উপান্তে দাঁড়িয়ে আমরা অন্য একটা অবাঙমানসগোচর অস্তিত্বের ডাকের অপেক্ষা করে থাকি। সেই অপেক্ষা কতটা সার্থক হয় তা আমরা দেখে-বুঝে যেতে পারি না অর্থাৎ পরের বাইরেটা আমাদের তেমন করে কোনও ডাক দেয় না বলেই বোধহয় আমরা শূন্যের মধ্যেই সেই ডাকটাকে খুঁজে মরি। কিন্তু আত্মা আমাদের টানে না বলেই বোধহয় আশা-বাসনা-কামনার টানটাই সারাজীবন অনুভব করতে থাকি। এটাকি আমাদের ভাগ্যলিপি না বিধিলিপি?'

তোমার কথায় একটা নৈরাশ্যের সুর যেন রিন রিন করে চলেছে। এটা কেন? সকলেই তো আর কুমার অন্বেষী হতে পারে না? কোথায় যেন পড়েছিলাম যে দেশের বা বিশ্বের সকল লোকই যদি দার্শনিক বা কবি বা বিজ্ঞানী বা শিল্পী হয়ে যায় তাহলে প্রকৃতি তার প্রতিশোধ নিতে ছাড়বে না। সিঁড়ির সব ধাপগুলোর পক্ষে কি শেষ ধাপ হওয়া সম্ভব? সভ্যতার প্রথম যুগ থেকেই তো সমাজের অস্তিত্বে দুস্তর জ্ঞানের অসমতার বাঁধ তৈরি হয়ে এসেছে। অস্থি মানের মধ্যেই তাদের সার্থকতা ঘটেছে। যে ধাপটি আছে মাটির একেবারে কাছে সেই ধাপের পর ধাপ নির্ভর করেই তো শেষ ধাপটির সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণতা। কিন্তু চেতনা বা দর্শনভাবনা যদি সমাজের মনে স্পন্দন না তুলতে পারত তাহলে কোনও শিল্পী-দার্শনিক আদৌ সম্ভব হত কি? সকলে অবশ্যই কবি হতে পারে না। কিন্তু কোনও কবিই কি কবি হতে পারত যদি সমাজের মনে সেই কাব্য চেতনা আর রস বোধটি অনুভবের আকারে তেমন জন্মগ্রাহী হয়ে না থাকত?'

'তোমার কথা মেনে নিতেই হয়। কিন্তু সহস্র তো আর লক্ষ বা কোটি নয়। আমার ইশারা ছিল সেই অবশিষ্ট লক্ষ-কোটির দিকে। বাংলা আকাদেমির প্রবেশদ্বারে লেখা আছে একটি প্রশ্ন—আজ আপনি কি বই পড়েছেন? লেখা আছে সচেতন করার জন্যে, পরিসংখ্যান সংগ্রহের মাধ্যমে সত্য নির্ধারণের জন্যে নয়। জীবন যদি কঠিন হয় সত্য তাহলে কঠিনতর!'

'তুমি কি বলতে চাও যে আমাদের মধ্যেই শত সহস্র আমরা আছি যারা অস্থি প্রমাণেও অক্ষম? যারা কবি শিল্পীদের জন্যে প্রথম ধাপটি হতেও অনুপযুক্ত? অথবা, যারা বিজ্ঞান-দর্শনের পিরামিডের একটি পাথর খণ্ড হতেও প্রস্তুত নয়? অধিকাংশ সেই আমরা কি প্রবৃত্তির বাসনা কামনায়, সংসারের হৈচৈ হট্টগোলে আর সস্তা ইন্দ্রিয়সুখের তাড়নায় জীবনকে অনুভূতিক যাপন করি? অপরে যতদিন না আমাদের চোখে-মুখের মাছি তাড়ায় ততদিন কি আমরা আশৈশব নিজেরা নিজেরাই ইন্দ্রিয়ের মাছি তাড়াই?'

'তোমার প্রশ্নের মধ্যে যে খোঁচা আছে আমি সেই রক্তঝরা কণ্টকের বিষয়ে কিছুই বলতে চাই না। তবে অনেকের জীবনেই যে সংবেদনশীলতার কিশলয় কম্বলক পাতা ছাড়ে না, হৃদয়ের গভীরে যে স্মৃতিসমাহরণ অর্ঘ্যখানি অন্তরের ছোঁয়ায় প্রাণ পায়, প্রাণ পাবার কথা, তা যেন অঙ্কুরিত হবার অবকাশই পায় না। এটাই রূঢ় বাস্তব। এই ক্লৈব চেতনার অন্তর্বর্তী শতসহস্রের পাশবিক অস্তিত্বের কথাই বোধহয় তুমি বলতে চেয়েছ। এই বাস্তব জগতে এই বাস্তব জীবনও তো বাস্তব। তাই এদের নিয়ে খেদের তো কারণ দেখি না। যা নেই তা কেন নেই তা নিয়ে বেদনা বোধ করার

চাইতে যা আছে তাকে নিয়ে সন্তুষ্ট হবার আনন্দ বোধ কি কম সুন্দর?'

'এক্ষেত্রে আশাবাদীর মত শোনায়। ভক্তের ডাক আর অন্তরের টান। দুটোকেই সমান মূল্য দিয়ে বৃহতের প্রতি দৃষ্টি রাখলেই তো তাহলে মিটে যায়!'

'তা যায়। তবে সেই বৃহতের ডাক আর অন্তর প্রকৃতিতে সঞ্চিত প্রবাহিত সুললিত ধ্বনির টান যে যতটা শুনতে পায় সে ততটাই তার জীবনতরীতে মঙ্গলের সম্ভার সাজিয়ে নিতে পারে। গৃহমুখ মানসিকতার যার শুরু, যে ঊর্ধ্বমুখ, অন্তত একটি ডাকে সাড়া দিতে পারলে তার সর্বাঙ্গ সুন্দরের স্পর্শ পায়। সেই স্পর্শটাই নানা ভাবে ব্যক্তিকে দীর্ঘজীবী করে তোলে। ঐ ডাকটাই প্রথম সোপান, ঐ স্পর্শটাই উত্তরণের পাথেয়।'

আমার মেয়ে চায়ের সরঞ্জাম গুছিয়ে নিয়ে হঠাৎই বেরিয়ে গেল। আমি পুবের জানালা পথে দিনের তারুণ্য প্রত্যক্ষ করে উঠে পড়লাম। একটা ডাক যেন পরিষ্কার শুনতে পেলাম। আমার টেবিল আমাকে ডাকছে।

হারানোর ভয়ঃ

সারাটা জীবনই তো আমরা ভয়ে ভয়ে কাটাই। সেই ছোটবেলা থেকে শুরু হয় ভয়ের সাম্রাজ্য গঠন। দিনে দিনে, ধাপে ধাপে চলতে থাকে সেই সাম্রাজ্যের প্রসার আর বাড়তে থাকে প্রতিপত্তি। প্রথমে প্রথম জুজুর ভয় দিয়ে যে শৈশবের শুরু হয় ক্রমশই সেখানে আগমন ঘটে সাপ-খোপের, ভূত-প্রেতের, দৈত্য-দানোর, রাক্ষস-খোক্কসের। জন্তু-জানোয়াররাও বাদ যায় না। বাঘ-সিংহ, হুলোবেড়াল-পাগলাকুকুর, শিং-তোলা-ষাঁড় আর দাঁতাল-কুমির সেই ভয়ের সাম্রাজ্যের অধিবাসী হয়ে সদাসর্বদাই আমাদের তেড়ে আসার জন্য ওত পেতে থাকে। আমরা যেমন বারবার মরি না এবং মরি নিয়ে ঘর করি তেমনি এতো সব ভয়েও আমরা মরি না বরং এই সব ভয় নিয়েই ঘর করি, জীবন যাপন করি।

এই সব ভাবতে ভাবতে মনে একটা খটকা লেগে গেল। এতো সব ভয়ের মধ্যে কোনও ভয়ই কি নেই যা আমাদের জীবনে সারা জীবনই আঠার মতো লেগে থাকে? যে ভয় সামনে এসে শিং নাড়ে আর পেছন থেকে লেজের ঝাপটা মারে? এমন ভয় কি কেউ আছে যে নানা ভাবে আমাদের 'কাঁটা' করে তোলে? মনে মনে সেই প্রকৃত ভয়ের অন্বেষণ করতে করতে হঠাৎই যেন সত্যদর্শন ঘটে গেল—হারানোর ভয়?

কিছুক্ষণ থমকে যেতে হল। মনের মধ্যে একটা থমথমে ভাব যেন আসন-পিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল। নড়তে-চড়তে চায় না। বুঝলাম এইটিই 'তিনি'—সেই ভয়, যা কখনও সঙ্গ ছাড়ে না। ছোট বেলার ছবিগুলো চোখের সামনে ভেসে উঠলো। শত কাজে ব্যস্ত মায়ের আঁচলটি ছাড়তে চাই না, পাশে পাশে সারাদিন ঘুর ঘুর করি, ঘুমের মধ্যে তাঁর কাপড়ের খুঁটটুকু হাতের মুঠোয় পুরে নিশ্চিন্ত হই। কেন? হারাতে চাই না। মা-হারা হয়ে সর্বহারা হওয়াটাকে যেন তখনই বুঝে যাই। মাকে হারানোর ভয়ে মাঝরাতে তীক্ষ্ণ-কণ্ঠ চিৎকারে আকাশ ফাটাই। তাঁকে ক্ষণমাত্র খুঁজে না পেলে বুকের বাতাসকে কান্নার চাবুক মেরে মেরে সচকিত করে তুলি। হারিয়ে যাওয়া মাকে খুঁজে পেয়ে শান্ত হই। সেই কি তবে হারানোর ভয়-এর জন্মক্ষণ?

মাকে হারানোর ভয় থেকেই কি নিজেকে হারানোর ভয়? মাঠে-ময়দানে, হাটে-বাজারে, মেলায়-উৎসবে, স্টেশনে-প্লাটফর্মে বারে বারেই যে হারিয়ে যাবার ভয় বারে বারেই মনের মধ্যে কাঁদুনি ধরিয়ে যায় সে তো শুধু মাকে হারানোই নয়, সে তো নিজেকে হারানোরও ভয়! তারপরে স্কুলে যেতে বাড়িকে হারাতে হয়েছে, শহরে যেতে গ্রামকে, বিদেশ যেতে দেশকে হারাতে হয়েছে অনেককেই। একটু ভেবে দেখলেই ধরা পড়বে যে আমাদের প্রত্যেকের জীবনটাই এক একটা হারানোর প্রসেশন।

শৈশবকালের অনন্ত শান্তি আর অসীম নৈকট্য হারিয়ে আমরা সকলেই পাঠশালায় যাই। পাঠশালা যেন পান্থশালা! ক'দিনের এই অবস্থান? মেলা-মেশা খেলা আর পড়া-পড়া ঐকতান ছেড়ে আমরা বিদ্যালয়ের নীরস বাস্তবতায় প্রবেশ করে সেই শৈশবকেও হারাই, সেই পাঠশালার খেলাঘরকেও আর খুঁজে পাই না। বই-এর চাপ আর শিক্ষার চাপে আমরা শুকোতে শুকোতে একসময়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বার টপকে জীবনের এক-চতুর্থাংশ যে সবুজ-সতেজ প্রথমাংশ তাকেই হারিয়ে বসি। বাস্তব জগৎ বড় বড় গোল গোল চোখে আমাদের মুখে তাকায় আর সংসারের ঘানিতে জুড়ে দেবার জন্য দড়ি-দড়া নিয়ে নির্মম-কঠিন অপেক্ষা করে। তখনও কি সেই হারানোর যন্ত্রণা আমাদের মনে রিনি রিনি বাজে না? মনে হয় না কি যে হারিয়ে এলাম, হারিয়ে ফেললাম, সবুজ-শ্যামল কিশোর-তরুণ সময়টাই।

তবে একথা একশো বার সত্যি যে সব হারানোই একরকমের হারানো নয়। একটা দেখার ব্যাপার আছে। সামনে তাকালে যা পাওয়া বলে মনে হতে পারে, পেছনে তাকালে তাই হারালাম বলে বোধ হতে পারে। অতীতের নাম হারানো, ভবিষ্যতের নাম প্রাপ্তি। তাকানোটাই আসল ব্যাপার, দিশা বা দিকটা নির্ণায়ক। হারানোটা যখন একটা প্রাপ্তি তখন সে প্রাপ্তির মধ্যে সুদসমেত ফিরে আসার কথা। পাঠশালার খেলাঘরে যে শৈশব-শান্তি আর শৈশব-নৈকট্য হারাই তাই বহুগুণ হয়ে ফিরে আসে বিশ্ববিদ্যালয়ের সিংহদ্বারে জীবনের পাথেয় কড়ি হয়ে। যে শ্যামলকে হারাতে হয় তরুণ বয়সে সেই আবার ফিরে আসে আকাশের নীল হয়ে মধ্যজীবনে। এই সব হারানোতে তাই দুঃখ মুছে যায় আনন্দের হাতে।

কিন্তু যে হারানোতে শুধু হারানোই আছে প্রাপ্তি নেই, বিয়োগব্যথাই আছে যোগের চিহ্নমাত্র নেই? অনেকেই তো আমরা মাকে হারাই, হারাই বাবাকে, প্রিয়জনকে! অসময়েই? সেই হারানোতে তো আমরা প্রায় সকলেই পশ্চাদ্মুখী হয়ে পড়ি, মরণকে শমনতুল্য করে, সৃষ্টির বেদনায় অভিঘাত করে, উত্তরণের ভবিষ্যতে সর্বজনীন করে তুলতে পারি না! নিজের বেদনাবোধকে সর্বজনের করে তোলার মধ্যে যে শক্তির জন্ম সে তো সাধারণের জন্য নয়। আর যিনি তা পারেন তিনিই নিজের হারানোটুকুকে সকলের প্রাপ্তিতে পূর্ণতা দান করেন। অবশ্যই, কিন্তু তাতে হারানোর বেদনাটুকু মিথ্যা হয়ে যায় কি? সত্যতর হয়, এই সত্য।

আমরা যারা সাধারণের দলে তারা হারানোকে স্মরণের মলম লাগিয়ে ভরাট করার আপ্রাণ চেষ্টা করতে পারি মাত্র। অর্পিত চিত্তে আমরা তর্পণ করি, অতীতমুখী অনুধ্যানে বেদনাকে বর্তমান রাখি মাত্র। আর তাইই বা আমরা বেশিদিন পারি কৈ? শত-সহস্র আরও হারানোর ভয় ঢেউ ঢেউ আমাদের বর্তমানকে আচ্ছন্ন করে রেখে নোতুন নোতুন হারানোর ভয়কে সতেজ-তীব্র করে তোলে যে। ভয়টা থেকে যায়, হারানোটা একদিন কখন যেন অজান্তেই হারিয়ে যায়!

আবার কিছু কিছু হারানো আছে যা হারালেই প্রিয়-নৈকট্য পায়। স্মরণ যোগ্য শৈশব এমন একটি হারানো। বাল্যের দূর্বাশ্যামল মাঠ-প্রান্তর পাখিডাকা সকাল সন্ধ্যা, শিশির ভেজা মসুর-মটরের ক্ষেত, পুকুরের মাঝমধ্যিখানে ডুব-ডুব পানকৌড়ি, মৃদু হাওয়ায় দোল-দোলা বাবুই-এর মসৃণ বাসা, প্রাণের গুন্-গুঞ্জনে সদা চঞ্চল মৌমাছির চাক, দুটো-তিনটে পাড়ার আড়ালকে একাকার-করা পিঁপড়ের গৃহযাত্রী—এ-সবই প্রত্যেকের জীবন থেকে হারিয়ে যায়। কিন্তু বেলা পড়ে এলে এ-সবই যেন হাজার-আলোর ঝলমল হয়ে স্মরণকে খুঁজে পায়, আপন হয়ে দেখা দেয়।

ছোটবেলার বন্ধুত্বও এমন এক হারানো। যে বন্ধুত্বে স্বার্থের পঙ্ক-থাকে না, যে নৈকট্য প্রাণের চঞ্চল আবেগেই গড়ে ওঠে, বাল্যের সেই বন্ধুত্ব হারিয়ে গেলেও ফিরে ফিরে আসে। কখনও মনে মনে, কখনও সামনা-সামনি। তরুণ কালের পরিধিতে অনুভব আর চেতনার গঙ্গা যমুনা সরস্বতীর ধারা প্রবাহ অনেককেই কাছে টানে, আপন করে নেয়। জীবনের গতিপথে সেই সব আপনরা কে-কখন-কোথায় হারিয়ে যায়। হারিয়ে গেলেও তারা কোথায় যেন মনের কোনো গভীরে থেকেই যায়। তাই এই সব হারানো গুলোও সময় মতো অনায়াসে ফিরে আসে, ফিরে আসতে পারে।

যৌবন অতি মধুর কাল, অতি নিষ্ঠুর কাল। জীবন সমুদ্রের মন্থনের সময় এই যৌবন। অনেক অমৃত, অনেক গরল উত্থিত হয়। স্বার্থ এই প্রথম জীবনের সব চাওয়া-পাওয়া, সকল আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত দর্শন-প্রত্যক্ষে নিজের ছাপ মেরে দিতে থাকে। সারল্যই যৌবনের প্রথম 'কাজুয়ালটি', আর সেই সূত্রে প্রথমেই তাই আমরা হারিয়ে ফেলি আমাদের খেলা-পাগল মনটিকে, অকারণ হাসি-আনন্দের উৎসটিকে। বিষয় ছেড়ে আমরা বিষয়ী হয়ে উঠি, উদ্দেশ্য আর উদ্দেশ্য-পূরণের তাগিদ আমাদের স্বাভাবিকতাকে প্রতি পদে পথরোধ করে দাঁড়ায়। টাকা-আনা-পাই থেকে সংসারের যাবতীয় খড়-কুটো সংগ্রহে মন দিই। এই হারানোর হাট আর অন্ত ঘটে না, হারানোটা তাই তখন সম্পূর্ণ করেই ঘটে যায়। কারণ জীবনের শেষ পর্বে পৌঁছেও, বৈতরণীর পাড়ে দাঁড়িয়েও, আমরা হিসেবের খাতাখানা খুলেই বসে থাকি। মনের পাখনা বন্ধ হয়ে এলেও দেনা-পাওনার পঙ্কতাড়না আমাদের চারদিকেই যেন অহরহ আলোড়ন সৃষ্টি করেই চলে।

এই সময়ের যা কিছু হারানো তা সবেরই একটা আলাদা রূপ আছে। সেই রূপটি বেদনার। অবশ্য সব হারানোই তো বেদনার। হারিয়ে ফিরে পাওয়াটাই আনন্দের। কিন্তু ফিরে আমরা কি পাই? কাকে পাই? কজনে পাই?

এই সময়ে চাকরি করতে গিয়ে স্বাধীনতা হারাই, ব্যবসা করতে গিয়ে ভালমন্দ বোধকে হারাই, কলেকারখানায় মজুর হয়ে স্বাস্থ্য হারাই, আর যারা বিদেশ-বিভূঁই-এ পাড়ি দিয়ে সম্পদ-উন্নতি খুঁজতে যাই তারা স্বদেশকে হারাই, আপনজনকে হারাই আর রসের যোগানটি হারাই। এবং সব থেকে বড় কথা সংসার করতে গিয়ে সংসারকেই হারিয়ে ফেলি!

এই সংসারের কথাটা একটু জটিল। ছেলে-মেয়েরা বিয়ে করে সংসার করতে চায়। এই করতে গিয়ে মেয়েরা পিতৃগৃহ হারায়। এই হারানোটা সানাইয়ের মধুর-করুণ সুরের আড়ালে, শঙ্খের গম্ভীর নিনাদে আর উলুধ্বনির ঘন ঘন মূর্ছনাতেও ঢাকা পড়ে না। নোতুন বাক্স-পাঁটরার সঙ্গে সুসজ্জিত থরে-বিথরে ভাঁজকরা শাড়ি, সর্বাঙ্গে মোহন-দ্যুতি গহনার ঝকমকা আর চন্দন চর্চিত কপাল, কাজল টানা চোখ—এ-সবই কনে-বর্তমান, বধূ-ভবিষ্যতের দোলনায়, ফল্গুধারার মতো,

মিলন-বিরহের হারানোর ভূমিকা মাত্র। বর্তমানটা ক্ষণস্থায়ী, হারানোটা দীর্ঘায়ত। 'সুখের কোটিং' বর্তমানের দুর্দিনের মোড়কে অতীত হারানোর 'দুর্দিনটুকু' সযত্নে আবরিত।

এদিকে ছেলেরা? মনে মনে ছেলেরা ও-পারের আজন্ম থেকে এ-পারের প্রাপ্তিকে বড়ো করে দেখে। জীবন নদী, আমাদের সমাজ ব্যবস্থায়, ও-পার ছেড়ে যেন সবাই এ-পারই গড়ছে। ও-প্রান্তের হারানোটুকুকে মাত্রে সংযুক্ত করে এ-প্রান্তের সম্ভারকে উপভোগ করতে চায় ছেলেরা। কিন্তু প্রকৃতির অমোঘ বিধানে এ-প্রান্তের হারানোটা বিবিধ, বিস্তারিত হয়ে, ভিতরে ভিতরে সংসারের হারানোটাকেই বাড়িয়ে তোলে। মেয়েরা অতীত হারায়, ছেলেরা তাদের সবকিছুই নবাগতার মধ্যে হারিয়ে ফেলে! অর্থাৎ 'নিজেকেই' হারায়। এই নিজেকে হারানোটা দৈহিক না হয়ে মানসিক ভাবে হয়। তাই ছেলেরা নিজের সংসার থেকে, মা-বাবা থেকে হারায় এবং, দ্বিতীয়ত, নিজেই হারায়। আর যদি মায়েরা পুত্রকে 'হারাতে' না চান তাহলে 'সবই' হারানোর পথে পা বাড়ান। তাই বর্তমান সংসার করতে সংসার হারানোটা বেশ একটু জটিল ব্যাপার।

এই সংসার হারানোটা যদিও অত্যন্ত বেদনার, তবুও সময়ের টানে, বর্তমানের মাদকতায়, একে প্রাপ্তি বলেই মনে হয়। যে হারানোতে হারানোর বেদনা নেই, প্রাপ্তির আনন্দ-বোধ মোড়কের মতো জড়িয়ে থাকে সেই হারানো অবশ্যই 'ট্রাজিক'। কিন্তু আমার কথা এই যে এটা সার্বিক, অনিবার্য। 'মানুষ মরণশীল' এই সামান্য-সত্য জেনে মৃতপ্রায় ব্যক্তি যেমন বাঁচতেও সান্ত্বনা পেতে পারে, এই হারানোর সামান্যত্ব জেনেও তেমনি আমরা, সংসারীরা, মনের সান্ত্বনা খুঁজে নিতে পারি।

এ-বারে মানব জীবনের সব থেকে বড় হারানোর কথাটা বলি। সময়। সব হারানোর বেলায় গোঁজামিল গোছের একটা ব্যবস্থা করে নিতে পারি। কিন্তু সময় হারানোতে কোনও গোঁজামিল চলে না। তাছাড়া অন্যান্য সকল বিষয় হারানোর পাশাপাশি একটা পাওয়ার ব্যাপার খুঁজে পাওয়া সম্ভব কিন্তু সময় হারানোতে নিছক হারানোটাই অবশিষ্ট পড়ে থাকে। হিসেবটা সরল অঙ্কের মতোই সরল। জীবনের সব অঙ্কে-অঙ্কে, পর্বে-পর্বে, দৃশ্যে-দৃশ্যে আমরা হারাতে হারাতেও কোনও না কোনও উত্তরের প্রান্তরে পৌঁছোই, শেষ দৃশ্য শূন্য আসে না। কিন্তু সময় চলে গেলে শূন্যই হাতে থাকে, সময়কে তো আর খুঁজে পাওয়া যায়ই না, বরং সময় তখন পিছন থেকে মুখ ভ্যাংচাতে থাকে। সব কিছুই বার বার আসে, যায়, অপেক্ষাও করে। কিন্তু সময় একবারই আসে, এবং যখন সে চলে যায় তখন আর শত চেষ্টাতেও তাকে ধরা যায় কি?

কিন্তু এত কান্না! বিদ্যুৎ শিখার দ্রুতগতি ঘটে আমাদের অন্তরের গভীরে। সমাজ সংসারে হারানো-প্রাপ্তি বেদনার, কিন্তু মৃত্যুতুল্য নয়। আমরা প্রত্যেকেই নিজের অন্তরের অমৃত-বিন্দুটিকে যখন হারাই তখনই সে-হারানো সিন্ধুতুল্য, মৃত্যুতুল্য হয়ে ওঠে। সম্ভাবনার মৃত্যু। প্রকৃতি মানুষের মধ্যে, প্রত্যেক মানুষের মধ্যেই একটি, অন্তত একটি, সম্ভাবনাকে গুপ্ত করে দিয়ে থাকেন। অজ্ঞানে অবহেলায় আমরা যখন সেই সম্ভাবনার উৎসটিকে হারিয়ে বসি, বোধনা মুখী করে তাকে প্রাণের উজ্জীবনী স্রোত ধারায় প্রবাহ দিতে অক্ষম হয়ে পড়ি, তখনই তো তা হারিয়ে ফেলি। মানব জমিন পতিত থেকে যায়, সোনা ফলানোর অবকাশ ঘটে না। এই হারানোর তুলনা কোথায়? এই ট্র্যাজেডির সীমা?

আমি, তুমি এবং সে ঃ

আমি, তুমি আর সে। এই নিয়েই তো আমরা সকলেই। আমাদের পরিবার, সমাজ, এবং পাড়া-প্রতিবেশী। আমি আর তুমি মিলে যে আমরা তা কখনই প্রকাশ পায় না, ফুটে ওঠে না যদি সে না থাকত। এই বহু সে একসঙ্গে মিলে আমাদের বাস্তব ছবিটির, অস্তিত্বের, যথার্থতা দেয়। অথচ এই সব বহু অপরিচিত-অর্ধপরিচিত-পরিচিত সে বা তারা আমাদের আমি-তুমির অন্দর মহলে প্রবেশের ছাড়পত্র পায় না। কারণ যখনই প্রবেশের ছাড়পত্রটি পায় তখনই তার সে-ত্ব ঘুচে যায়, তুমি-ত্ব এসে যায়। আর এই সে-গণ যখন একেবারেই অপরিচয়ের গণ্ডির বাইরে থাকে তখন তারা শুধু চিহ্ন। না-হয় একটা ধারণা মাত্র। এ-দিক থেকে আমি-তুমির ঘনিষ্ঠতা সীতার গণ্ডি হয়ে সে-তারার রাবণকে দূরে রাখতে চায়।

আবার দেখ এই আমি আর ওই তুমির মধ্যেও তো কতো রকমের সম্পর্কের টানাপোড়েন থাকতে পারে। তুমি ছাড়া যেমন আমার জগৎ অন্ধকার, তুমি ছাড়া আমি বাঁচব না, তুমিই আমার ইহকাল-পরকাল, ঠিক তেমনি তুমি আমার দু'চক্ষের বিষ, তুমি আমার মরণ, আমার শত্রু, আমার কাল। এই দুই 'পজেটিভ' আর 'নেগেটিভ' তুমি-আমি-র বাইরেও তো একটা 'নিউট্রাল' আমি তুমি সম্পর্ক আছে। তুমি আমার কেউ নও, আমাকে ছাড়াও তোমার বেশ চলে যাবে, এখন আমার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে, তুমি আছ তোমাকে নিয়ে আর আমি থাকি আমাকে নিয়ে। তাই দেখা যায় যে যতোটা কাব্যিক মনে হয় এই তুমি-তুমি আর আমি-আমির একক বা যৌথ ভাবনা ততোটা কাব্যিক বোধহয় তারা নয়। অনেকটাই গাণিতিক হয়েও কপালের ফেরে হতে পারে!

অবশ্য আমার আমিটা যখন প্রথম নিজের আমিত্বের খোলস ভেঙে বাইরে এসে তোমার তুমিটিকে দেখতে পায় তখন গঙ্গার ধার, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বৃক্ষ-কুঞ্জ আর উদার আকাশ অনেক ভাবের সৌধ রচনা করে। তখন যেন মনে হয় আমিটা আসলে সৃষ্ট হয়েছে তোমার অসীমে হারিয়ে যাবার জন্যই। জীবনকে মনে হয় স্বপ্ন, পৃথিবীকে রমণীয় আর একাকিত্বের মিঠে নিঃসঙ্গতাকে মনে হয় মধুরের মৌচাক রচনার অবকাশ। প্রাণের জলাশয়ে ঝির ঝিরে হাওয়ার মৃদু তাড়নায় যে ছোট ছোট ঊর্মিমালা তির্‌-তির্‌ করে নড়ে-চড়ে এপ্রান্ত থেকে ওপ্রান্তের দিকে এগিয়ে যায় তাদের মনে হয় কবিতার উচ্চারণ, গানের কলিগুলো যেন জল-বিহারে মত্ত হংস। ভালবাসার কেন্দ্রবিন্দুতে আমি-তুমির এই ঘুর-পাক চলন যেন অনন্তের ডাক বলে মনে হয়। এই সব আমি-তুমিময় জীবনে সে যেন একটা ছন্দ-পতন, দৈত্য-সম আগমন, বিধ্বংসী উপস্থিতি। সে-র মৃত্যু দিয়ে তবে মুক্তি হবে 'মোর-তোমার'! তবেই দেখুন যে সব সময় আমি-তুমির প্রকাশের 'ক্যানভাস' নয়।

অথচ সে-রূপ অনসূয়া-প্রিয়ংবদা না থাকলে আমি-দুষ্মন্ত আর তুমি-শকুন্তলা কতোই না অসত্য হয়ে পড়ে! শব্দ বা ভাষার সে-তারা না থাকলে আমি-র অনুভব আর তোমার-কল্পনা মুক্তই হতে পারতো না। কবির প্রেম-ভালবাসা-ভক্তি শব্দে-শব্দের সেতুবন্ধনেই তো ওপারের প্রেমিকার কাছে, দেবতার পাশে, ঈশ্বরের সান্নিধ্যে পৌঁছতে পারে। সে-রূপ ঘটক এলেই আমি-তুমির মিলনাকাঙ্ক্ষা সম্পূর্ণ হয়। তাই সে শুধু ছন্দ-পতনই ঘটায় না ছন্দোবদ্ধও করে তোলে। সে আছে তাই তুমি আর আমি আছি। আমরা যখন প্রথম দর্শনের লজ্জা-খোলসে আটকা পড়ে কষ্ট পাই তখনই তো

বন্ধু-মিত্র-সুজন বেশে একজন সে এসে আমাদের মধ্যে জমে থাকা বরফকে গলিয়ে সুন্দর করে তোলে। আর সেই গলিত বরফের জলস্রোতে আমরা যখন উচ্ছল আমি-আর-তুমি হয়ে স্বর্গ খেলনা গড়তে চলেছি তখনই সেই সে'র জন্যে বিসর্জনের বাদ্যি বাজে। আমি আর তুমি অনন্তের পথিক, সে কেবলমাত্র জীবনের 'বটল্-নেক' খোলার প্রয়োজনীয় বস্তু!

কিন্তু জীবনে তো আপনারাও কম দেখেন নি। অনেক তুমিকেই তো শেষ পর্যন্ত সে হয়ে যেতে দেখেছেন এবং অনেক সে উঠে এসেছে তুমির স্তরে? তাই এক ধাপ এগিয়ে বলা যায় যে আমি-টাই নিরন্তর, অনন্ত। তুমি আর সে, সে আর তুমি আপেক্ষিক। কখনও বা তুমিই আমার সে হয়ে যাও আবার কখনও বা সে-ই আমার তুমি হয়ে আসো কালে আবার সুখে। তাই অনুসিদ্ধান্ত হিসেবে বলা যায় যে সে হয়ে কেউ যেন বাঁচতে না চায়, সব বাঁচাই তুমি হয়ে বাঁচা। আমি অমৃত, তুমি-ও অমৃত। একমাত্র অমৃত নয় সে। এখানেই সে-র মৃত্যু-চিহ্ন আঁকা। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন একা কেহ থাকিও না। আমার মনে হয় তার চাইতেও বড় নির্দেশ সে হয়ে কেউ বাঁচিও না।

অথচ 'ট্র্যাজেডি' এখানেই। আমরা সকলেই এক-একজন প্রকাণ্ড সে হয়ে বেঁচে থাকি। চাই না, কিন্তু অন্যথা হয় কৈ? আমি তুমির উন্মুক্ত গলার ধার বা মেমোরিয়ালের উদার পরিসর যখন সংসার-হিসেবের একটানে চার-দেওয়ালের সেরাটাইপে আটকা পড়ে যায় তখনই তো আমার যেমন 'সে' হওয়া শুরু তোমারও তেমনই সে হওয়ার শুরু। আমরা দুজনে দুজনকে বাস্তবের রচনায় ক্রমশ তালিম দিতে থাকি। প্রেম সূর্যের আলো ক্রমশ চাল-ডাল-রেশনের তাড়নায় হারিয়ে যায়, ভালবাসার চাঁদনী-কোমলতা টাওটিন-কাঞ্চনরঞ্জন-কোবরাসিংহের দুকূল-প্লাবি অর্থ-স্রোতে নরক-কুণ্ড হয়ে যায়। তখন মনে হতেই পারে যে স্বর্গ শুধু দেবতাদের অধিষ্ঠানে ধন্য নয়, অসুরের প্রতাপেও কম্পমান। ধরণীতে স্বর্গ রচনার দিন শেষ হলে সেই আবাসনে কারা বাসা বাঁধবে তা কে বলতে পারে? সেই হাসি সেই গান সেই প্রীত্যালাপ সমস্ত মৃদু-চোর্যনিষ্ট এখন আর যেমন 'তুমি-তুমি' করি প্রাণ-মাতায় না বরং মনে হতে পারে হাসিতে এখন বাজ, গানে অ-সুর আর মাড়ে যেন সাপের মতো ফণা তোলাই আছে। সংসারের যাঁতাকলে আমার আমি-টি হারিয়ে দিয়ে তোমার কাছে সে হয়ে গেছি। আর আমার কাছেও তুমি তোমার তুমিটি হারিয়ে সে হয়ে গেছ। এটাই সে-র ট্র্যাজেডি।

জীবনের অন্য প্রান্তে চলুন। মা-সন্তান। শিশুর কাছে মা-তো তার বিশ্ব ভুবনের আলো। মা'র কাছে তার সন্তানও তাই। সন্তানের আমি টি মায়ের কোলে তুমি-তুমি-র গভীরে অপার শান্তি পায়। মা জড়িয়ে ধরেন তার সন্তানকে নিজের বুকে, তার 'তুমি-আমার-সব'-কে। এখানেও দেখুন সন্তানের আমি আর মায়ের আমি পরস্পরের তুমিতে আকণ্ঠ অভিষিক্ত। (বেচারি পিতার অবস্থা অবশ্য তুমি থেকে সে-র উপরে কাই পরিক্রমণমান!!) তিল তিল করে রাতের ঘুম আর দিনের বিশ্রামের মূল্যে সন্তান বড় হয়ে উঠবে। সন্তানের কাছেও তার স্বর্গ এই ধরণীর ধরা ছোঁয়ার মধ্যে, তার মায়ের মধ্যে বাল্যের খেলাঘর, কৈশোরের উৎসব আর তারুণ্যের চেতনাকে অকুণ্ঠ-অতন্দ্র করে উপলব্ধি করছে, অন্যজন তার সন্তানের মধ্যে যৌবনের আশা প্রৌঢ়ত্বের তৃপ্তি আর বার্ধক্যের নির্ভরতাজনিত অতল-মধুর তৃপ্তিকে খুঁজে পাচ্ছে।

এমনি এই মাতৃস্নেহের খাঁচার স্নেহের শিকলে বাঁধা সন্তান-পাখিটি যখন অন্য পাখিটির সন্ধান পেল, বনে নয় মনে তার, তখনই শুরু হল পাখা ঝাপটানো। জীবনের সড়কে পা যেই পড়ল, অমনি মন উড়ু-উড়ু সেই খাঁচার পাখি অন্য পাখির কলতানে মাতোয়ারা হয়ে মা কে আর তুমির

আসন থেকে এক ঝটকায় না হলেও ধীরে ধীরে সে-র পিছনে নির্বাসন দিতে পা বাড়ালো। ভবিষ্যৎ ট্র্যাজেডির বীজ এখানেই উপ্ত। মায়ের হৃদয় ভাঙে, সন্তানের 'সংসার' গড়ে। মায়ের এতোদিনের এতো সাধের তুমিটি, তিলে তিলে গড়া তুমিটি, হারিয়ে যায় সেই তুমির সদ্য পাওয়া অন্য তুমিতে। এ-পারে সন্তান তার তুমিকে গড়ে তোলে, ওপারে মায়ের তুমির-পাড় ভাঙে। রীতি, প্রকৃতি!

বেচারি পিতা! আগেও একবার বলেছি 'বেচারি'। কেন? পুত্রের কাছে তো সব পিতাই তিনি, বা সে। মনোবিজ্ঞানীর পরিভাষায় 'ইডিপাস্ কমপ্লেক্স', সমাজ-বিজ্ঞানীর কথায়, 'ইগো-কনফ্লিক্‌ট্‌', জীবন বিজ্ঞানীর ভাষায় 'রিকশন'। পিতারা তো আর 'পিয়ম্ব করেছি দান, তোর লাগি পুত্র মোর জীবন করেছি পণ' বলতে পারে না! তাই পিতা আমিটির কাছে পুত্র তুমিটি এবং ভাইসভারসা সমান ভাবেই প্রায় সহজ 'সে'-তে পর্যবসিত। এই ট্র্যাজেডি তাই চলছে, চলবে।

তবে একটা অন্যতর বিন্যাসেও এই অন্তরঙ্গ সে আবদ্ধ হতে পারে। বিলিতি মিঃ এবং মিসেস যে নৈকট্য প্রকাশ করে ভারতীয় নারী-জীবনে তা এখনও পর্যন্ত সড়গড় হয় নি যদিও কোনও কোনও উচ্চকোটি জীবন-যাপনে স্বামীকে তার মূল নামে আর স্ত্রীকে তার নরম-নামে ডাকাটা ধীরে ধীরে প্রচলিত হচ্ছে। কিন্তু অধিকাংশ স্ত্রীর ডাকে নামের উচ্চারণ থাকে না। কাছে-কাছে যখন উঠা-বসা তখন নামটা প্রয়োজনের নয়। ওগো-হ্যাগো-র আন্তরিকতায় প্রত্যেক আমি তার তুমিকে কাছে পায়। সমস্যা হয় যখন দূরে থাকে। তখন 'ওকে একটু ডেকে দেবে?' 'তাকে একবার এখানে আসতে বল' করে সেই নিকটের তুমিকে দূরের সে করে দেওয়াটা কোন ব্যতিক্রম নয়, নিয়মই। কাছের 'তুমি' যখন দূরের সে হয়ে যায় তখন একটা নতুন প্রাণের গতি যেন সেই সে-তে আরোপিত হয়। তাই বলছিলাম, একই সে অন্যতর বিন্যাসে তুমি'রই পরিপূরক হয়ে ওঠে। ট্র্যাজেডি নয়, আবদ্ধ আনন্দের বাতাবরণটিই সে-কে দূর ঠেলে দেবার বদলে কাছে টেনে ধরে। এই সে সেই সে নয়। আমি-তুমির বৃত্তে এই সে তুমি'রই প্রতিভূ মাত্র।

কিন্তু অনেকের জীবনে তুমিও আসে না সে-ও প্রাণের স্পর্শ না পেয়ে কাছে আসে না। আমিটা একটা মরুভূমির কর্কশতায় দাঁড়িয়ে যায়। দাঁড়িয়ে থেকে থাকে। তুমি'র একটা সজল-শ্যামল উপত্যকায় যদি বিচরণ আদৌ সম্ভব না হয় তা হলে সেই আমিময় জীবন কোনও একটা সে-র জন্যে আকুল হয়ে ওঠে। অন্ততঃ একটা মরুদ্যানের শান্তি দিতেও তো একজন সে থাকাটা দরকার ছিল। এরা সেই জীবন-ট্র্যাজেডি-কে বরণ করে নেয় নিজেদের অহংপ্রাবল্যে। তুমিকে এরা পায় না সেই তুমির মধ্যে একটা আমি সতত প্রবল বলে, কোন সেই তার কাছে গ্রাহ্য নয় কারণ সে তো সেই, আমার আমি নয়! আমি-বোধের অহং-এর চারপাশে চিন্তা-অনুভব-চেতনার এমনই একটা বেড়া এরা তৈরি করে যে তা অলঙ্ঘ্য হয়ে ওঠে। এরা জীবনে জীবন যোগ করতে পারে না, অহং-এর বিষ এদের অহর্নিশ কেন্দ্র-চ্যুত করে রাখে। এরা অপরের মধ্যে নিজেদের খুঁজে না পেয়ে নিজের মধ্যেই হারিয়ে যায়। এরা সকলেই আত্মনরক অহং-পাথারে নিরুদ্দেশের যাত্রী। এদের ট্র্যাজেডি ঘটে তখনই যখন জীবনের হাতুড়িটি এদের অবসন্ন প্রাণের মেরুদণ্ডে আঘাত করে এবং এরা কেউ চৌচির হয়ে খান খান হয়ে ব্যর্থতার উদাহরণ হয়ে চারধারে ছড়িয়ে পড়ে। একাকিত্বের জীর্ণতাই এই আমিদের হাতুড়ি-পেটা অহং-এর পরিণতি।

আরও আগের কথা আছে। কৌমুদির অহং-আবাপ-বরম্, ওং-ডে-টেনি-স-টোন-এ সেই ছোটবেলার সুর্যাস্তে সোনার ছবি হয়ে চোখের সামনে বার ফিরবার আশ্রয় দেখা দিত। তখন তো জানার কথা নয় যে এই আমি-তুমি-আর-সে কত রূপে, কত ভঙ্গিতে আমাদের পরবর্তী জীবনে 'পুন-পুন' হয়ে প্রত্যেককেই জোড়-তোড়া করে ননী-মাখন-খোয় করে ছাড়বে! তখন যদি জানতাম যে এই আমি-তুমি-সে-র বাগানটি যথাযথ পরিপালন করতে পারলে ভবিষ্যতের অনেক আগাছা-জঞ্জালের হাত থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যাবে তা হলে পণ্ডিত মশাই-এর কিম্ভুত দুর আর ওসব কিম্ভুত হিকিটির দিকে নজর না দিয়ে কৌমুদিতেই চোখের নজর ধরে রাখতাম। বই-এর শিক্ষকেরা আমাদের মনকে 'বই'তে প্রবেশ করাতে পারেন না, পরে সারাজীবন সেই মনকেই বইতে হয়। ছোটবেলার আমিগুলো সবাই বাবার তুমি মায়ের তুমি হয়ে বেড়ে উঠতে উঠতে কখন যেন একদিন অন্য কারো তুমি হয়ে তাঁদের কাছে সে হয়ে যায়! ট্র্যাজেডির বীজটি তাই কৌমুদির সোনার আক্রমণে সতেজ বেড়ে ওঠে।

ইংরেজি আমাদের মাতৃভাষা নয়। তাই বেশি দোষ দেখি না তাদের গ্রামারের গম্ভীর চাহুনিতে। সেখানে 'আই'-এর সঙ্গে 'অ্যাম' তেমন ইউ-এর সঙ্গে 'আর' এবং হি-এর সঙ্গে যে প্রকৃত গোলমাল বাধে তা বুঝে যাই কচি-বয়সেই। সেখানে স্বাভাবিক 'ইজ'। আমি-তুমি-সে যে আলাদা, হাতে ধরাধরি করে যাবার নয়, একাসনে চলন-বলন-খাদা-খানা অচল তা আর অজানা থাকে কি। আবার আমিও খাই, তুমিও খাও কিন্তু তাই সে একা অমনি 'খায়'! কেন? সে যে পর, দূর, অনাপন। আসা-যাওয়া-খাওয়া-বসা সব ক্ষেত্রেই একটা আলাদা-আলাদা, পর-পর ভাব। একটা প্রান্তিক ব্যবস্থা। আমি-তুমি যদিও এক দাওয়ায়, এক বিছানায়, এক ঘরে থাকতে পারি সে কখনই নয়। আর কে না জানে যে ভাষা ভাবের বাহন। আমি-তুমির ঘনিষ্ঠ জীবনে সে অজ্ঞাত, অস্পৃশ্য। এখানেই তো সে-র ট্র্যাজেডি।

তাই তো দেখি অনন্তকাল ধরেই মানুষ একটি মাত্র বাসনা ব্যক্ত করে চলেছে: হে মহাজীবন, আমাকে তুমি সে করে দিও না। আমাকে তুমি তোমার করে নাও। তুমি যদি অসীমও হও তাহলে আমার আমিটিকে তোমার সেই অসীমে স্থান দাও। এই অনাদিকালের আকূতি। মানুষের জোড়হস্তের প্রার্থনা।

কিন্তু যখন দেখি সো-অহং, তৎ-ত্বম-অসি? সে তো অন্য ভাব, অন্য পৃথিবী, অন্য জীবন। মাটির ধরণী ছেড়ে যখন বৈদান্তিক অন্তরের জ্ঞান-পথে পদার্পণ করি তখনই তা সত্যি। তখন তো আর আমাদের আমি-তুমি-সে ওদের গায়ে মর্তের ধূলিকণা লেগে থাকে না, তখন যে আমাদের আত্মা অন্য কোনো বিশ্বআত্মার স্মরণে আমাদের চাল-ডাল-তেল-নুনের দৈনন্দিনতা থেকে ছিন্ন করে নেয়। তখন আমি-তুমি-সে-র চক্রব্যূহ ভেদ করে সত্য-শিব-সুন্দরের দিব্য-চক্রে আরোহণ সম্পূর্ণ হয়। সেই পথেও কি ট্র্যাজেডি নেই? আমি-তুমি-সে-র ভেদাভেদ জ্ঞান লোপ পেয়ে যাদের চোখের জল আসে, যাদের পৃথিবী শূন্য হয়ে যায় ট্র্যাজেডি তাদের। তারা বুদ্ধ-জননী, চৈতন্যের বিষ্ণুপ্রিয়া, কৃষ্ণের শ্রীরাধা।

আমরা তাই আলাদা থাকলেও ট্র্যাজেডি, মিলেমিশে একাকার হয়ে গেলেও ট্র্যাজেডি। আমি-তুমি-এবং-সে সেই ট্র্যাজেডির নাম। ট্র্যাজেডির নামাবলি।

ভূতের বেগার ঃ

দুপুর বেলায় ক্লান্ত পিঠটা বিছানায় দীর্ঘশ্বাসের চাদর মেলে দিয়ে ভাবেন, সারাজীবনই ভূতের বেগার খেটে মরলাম, রান্নাঘরের শেষ কাজটুকু সেরে পড়ন্ত দুপুরে গৃহিণী ঘরের ছিটকানি তুলে দিতে দিতে অস্ফুট বলে ওঠেন, হেঁসেল ঠেলে ঠেলেই জীবনটা গেল। বিকেল বেলায় স্কুল-কলেজ থেকে ছেলে মেয়ে ঘরে ফিরে হতাশ হয়ে টেবিলের উপর বই-খাতা-ব্যাগ ছুঁড়ে দিয়ে ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ে—ভবিষ্যতের তাড়নায় বর্তমানগুলোর একেবারেই জলাঞ্জলি হয়ে গেল। সারাদিন একা একা কাটিয়ে আর বার বার ঘরের অনাবশ্যক-আবশ্যক টুকিটাকি কাজে হাত লাগিয়ে লাগিয়ে ক্লান্ত পুত্রবধূ সন্ধ্যের প্রসাধন সেরে অফিস-ফেরত স্বামীর প্রতীক্ষায় বসে বসে মনে মনে নিজের ভাগ্যকে ধিককার দেন, পরের জন্যে অপেক্ষা করে করেই কি জীবনটা যাবে! ওদিকে আর একটি কর্মপীড়িত দিনের শেষে পথক্লান্ত-শ্রম-শ্রান্ত মনে অবসন্ন তার স্বামীটি ঘরে ফিরে বুকের দুটো বোতাম খুলতে খুলতে খাটের কোণে বসে, অথবা টাই-এর গিঁট ঢিলা করতে করতে সোফায় এলিয়ে পড়ে বলে উঠবেন, আর পারি না, তোমাদের জন্যে জীবনটাই নষ্ট হতে বসেছে!

তাহলে আমরা কি সবাই মুটে মজুর? অপরের বোঝা বয়ে বয়ে মরছি? পিতা পুত্র-কন্যার বোঝা, পুত্র-কন্যারা পিতা-মাতার বোঝা বইছে, স্বামী স্ত্রীর বোঝা আর স্ত্রী স্বামীর, ভাই বোনের বোঝা, বোন ভাইয়ের। যে চাকরি করছে সে বেকারের বোঝা, অফিসের বোঝা, পূর্বপুরুষের রেখে যাওয়া দেনার বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। ঘরের গিন্নী সংসারের বোঝা, কর্তা পরিবারের বোঝা, ছেলে-মেয়েরা যার যার স্ত্রী আর স্বামীর বোঝা বইছে। মা সন্তান মানুষ করার দায় আর বাবা অর্থ উপার্জনের দায়িত্বের বোঝা টেনে বেড়াচ্ছে। এ-সবের বাইরে যাদের সভাসমিতি আছে, রাস্তা-ঘাট সংস্কারের কাজ আছে, পূজো-উৎসব-অনুষ্ঠানের দায়িত্ব আছে তারাও সকলে অপরের বোঝা বয়ে বেড়াচ্ছে। ছোট থেকে বড় বড় নেতারা দেশের কাজ, সমাজের উদ্ধার আর দশের সেবা ব্রত ঘাড়ে নিয়ে খাওয়া নাওয়া ভুলে যায়। এবং মাঝে মাঝেই, বার-বারই এদের মনে হয় এরা সকলেই বেগার খাটছে, ভূতের বেগার। মনে হয় প্রত্যেকেই মুটে মজুর। নিজের উপর রাগ হয়, অপরের উপর বিরক্ত হয়, জীবনের উপর অসন্তুষ্ট হয়ে ওঠে। এ-সব হয় ঠিকই কিন্তু অচিরেই আবার জীবন প্রত্যেকের কানেই কিছু একটা মন্ত্র দেয়। প্রত্যেকেই আবার সেই বোঝা বইবার জন্যে উঠে পড়ে, উঠে-পড়ে লেগে যায়। মা রান্না ঘরে যান, বাবা বাগানের দেখভালে লেগে পড়েন, ছেলে মেয়েরা বইখাতা গুছিয়ে স্কুল-কলেজে রওনা হয়। স্ত্রী ঘরের টুকিটাকিতে মন দেয়, স্বামী অফিসমুখো যাত্রা করেন।

এই দ্বৈত কেন? এই দ্বৈধ কেন? একদিকে 'আর পারি না!'-র জ্বালা, অন্যদিকে 'আবার পাবার আশা—এই দ্বৈত ভাব, বিরোধ প্রকৃতি, সর্বজনীন। অন্যদিকে জীবনের প্রতি পদে পদে, প্রতিটি সিদ্ধান্তের সামনে একটা 'টুবি অর নট টুবি'-র দ্বিধা—এটা করব না ওটা করা ঠিক হবে—এমন একটা অনিশ্চয়তা বোধও তো কোনো একা-একা অনুভব নয়। এই দ্বি-ত্ব, এই দ্বিধা-উচাটন দৈত্যের মতোই আমাদের প্রত্যেককে চালিয়ে নিয়ে বেড়ায়। মহাজীবনের প্রবাহের ঢেউয়ে ঢেউয়ে আমরা ব্যক্তি জীবন নিয়ে নোঙর খোলার মতো ভাসতে থাকি, ডুবতে থাকি আবার ভেসে উঠি। জীবনের এই প্রতিনিয়তের ওঠা-পড়ার সাথে সাথে আমাদের ভাব-অনুভব-আবেগ যুক্ত

হয়ে যায়। সচেতনে-অচেতনে-অবচেতনে। চিন্তা-ভাবনা, ভালবাসা-বঞ্চনায়, আশা-প্রত্যাশায়, অতীত-ভবিষ্যৎ এবং বর্তমানে। সব সময়েই আমরা কিছুটা স্বাধীন, কিছুটা পরাধীন। জন্ম মুহূর্ত থেকে মৃত্যুক্ষণ পর্যন্ত এই অবস্থা, এই স্বাধীনতা-পরাধীনতার অবস্থাটি সমান টানা। নবজাত শিশু চিৎকারে আর চির-বিদায়ী ব্যক্তি বিদায় বেলার উৎশ্বাসে তাদের এই অবস্থার প্রমাণ দিয়ে থাকে। আমরা তাই সারাজীবন কখনই পূর্ণ স্বাধীনতা ভোগ করি না, পূর্ণ পরাধীনতাও ভোগ করি না। কিন্তু দুবার সম্পূর্ণ পরাধীন থাকি—একবার জন্মের পূর্বে, জন্মের স্থান-কাল-পাত্রে, আর দ্বিতীয়বার মৃত্যুর পরে, সেই প্রস্থানের স্থান-কাল-পাত্রাপাত্র নির্ণয়ে। জন্মের কূলেও যেমন আমাদের হাত নেই, মৃত্যুর অকূলেও তেমন হাত থাকে না!

কিন্তু এই মাঝখানের জীবনটা নিজের অধিকারে বাঁচতে গিয়ে আমরা সকলেই কমবেশি নাস্তানাবুদ হয়ে পড়ি। শিশুরা নিজ নিজ অধিকার বাঁচাতে কেঁদে-কেটে-বাড়ি মাথায় করে তোলে, কিশোর-বালকেরা হাত-পা নেড়ে লাফ-দাপিয়ে সোচ্চার হয়, তরুণ-যুবকেরা বুদ্ধি আর অভিনয় কৌশলে কাজ হাসিল করে, করার চেষ্টা করে। জীবনকে সম্যক করে চেনার আগেই এরা অধিকার রক্ষার কলাকৌশল আর বাঁচার রীতি-রেওয়াজ রপ্ত করতে থাকে। এই পর্যায় থেকেই বেগার খাটার, মুটে মজুরীর ভূতের বোঝার বোধ গজায়।

ব্যাপারটাকে যতো সহজ বলে ভেবেছিলাম ততো সহজ নয়। সমাজের মানুষকে এর আগে একবার তিনভাগে ভাগ করে দেখে নিতে চেয়েছিলাম : আমি, তুমি আর সে – এই তিনভাগে। এখন এই 'ভূতের বেগার'-এ এসে দেখছি 'তুমি'-টা একেবারেই নেই - সব তুমিগুলো 'সে'-এর শ্রেণীতে একাকার মিশে গেছে। ভাগ দেখছি দুটো, আমি আর না-আমি বা, সে। আমি ছাড়া এই সারাবিশ্বে আর যা কিছুই আছে সে সবই 'অপর'। একমাত্র এই আমিই আপন।

এই আমিটা সময়ে ধীরে ধীরে কিছু বাড়ে বড়-বৃত্ত ডালপালা ছেড়ে ছেড়ে। কচিপাতা আমির অনুভবে যখন জীবনের হাওয়া লাগে, অভিজ্ঞতার সেচনে যখন তার শিকড় তরতর করে গৃহ-পরিবার ছেড়ে সমাজের দেহে ছড়িয়ে পড়ে আর কাণ্ড-শাখায় পুষ্টির ছোঁয়া লাগে তখন এই আমিগুলোই আমাজানের গভীর জঙ্গলে পরিণত হয়ে ওঠে। তখন প্রত্যেকের আপন-আপন বোধগুলো সেই আমি বনস্পতির পত্র-পল্লবের শিরায়-স্নায়ু, কাণ্ড-শাখার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে শিহরণ তোলে।

শিহরণ তোলে ঠিকই কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে একটা 'অপর'-এর বোধও অনিবার্য জড়িয়ে থাকে, ছড়িয়ে পড়ে। এর কারণটা বোধহয় এই যে কোনো আমি-ই একটা সে-এর বাতাবরণ ছাড়া জন্মাতে পারে না। জন্মাতেও পারে না, বাঁচতে তো পারেই না। যে মায়ের গর্ভে আমরা জন্মাই, দুই থেকে ছিন্ন হয়ে নিজের একাকে খুঁজে পাই, সেই মা যে একজন সে মাত্র তা টের পেতে যৌবন পর্যন্ত বিলম্ব হতে পারে—অথবা বিয়ে করা পর্যন্ত! 'অন্যে-পরে কা কথা'। নিজ নিজ অতীতে দৃষ্টি ফেরালে অথবা অপরের বর্তমানে চোখ রাখলেই এই সত্য জলবৎ ঠেকবে যে মা-বাবা ভাই-বোন এমনকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে স্ত্রী-পুত্র পর্যন্ত এই সে-র দলে, অপরের শ্রেণীতে পড়ে।

কেউ কারো নয় ভুবনে। কা তব কান্তা, কস্তে পুত্রঃ! একাই এসেছি একাই চলে যাবো। আমাদের দেশীয় জীবনকে অভিজ্ঞতার কষ্টিতে যাচাই দিতে দিতে দর্শনের ছাঁকনিতে ছেঁকে তোলা এসব সত্য। [সত্য না মোহমায়া তা অবশ্য পণ্ডিতগণের বিবেচ্য।] তাই এই ভুবনে যখন আমরা আমি

থাকি, কাজ করি তখন তার বেশিরভাগটাই তো চলে যায় সেই অন্য 'কারো' ভাগে—অপরের অংশে। মাইনে ঘরে আনি—স্ত্রী নিয়ে নেয়, প্রথম প্রথম হয়তো মা নিয়ে নিতেন। বাজার করে আনি, সকলে খেয়ে ফেলে। রোদে ঘেমে জলে ভিজে অফিসের লোন নিয়ে বাড়ি বানাই—অন্যলোকে ভোগ করে। সকাল-বিকেল বাড়ির সামনে বাগান বানাই পরিচর্যা করি অন্য লোকে ফুল তুলে নিয়ে যায়, ফল পেড়ে খায়। এমনি করে যা কিছু করি না কেন তা তো আমার 'আমি'-র ভোগেই শুধু লাগে না — অন্যের উপভোগেও যে লেগে যায়। আর তখুনি মনে হয় 'ভূতের বেগার খাটছি'।

কিন্তু এই ভূতের বেগার তো অন্য সকলেই তা হলে খাটছে - সেটা দেখছি না কেন? দেখছি না কারণ ট্রাফিক চলাচলে যেমন ওয়ান-ওয়ে ব্যবস্থা আছে, দৃষ্টিভঙ্গিতেও তেমন আমি-ওয়ের চলন আছে। প্রত্যেক 'অপর' তো স্বার্থপর, নিজের জন্যই যা কিছু করে, নিজের বাইরে আর কিছুই দেখতে পায় না, অপরের জন্য কিছুই করে না। যদি প্রশ্ন করা যায়: কিছুই করে না? যদি বলা যায়, উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দেবার চেষ্টা করা যায় তাহলে শুনতে হবে: কম কম করে, চক্ষু-লজ্জার জন্য যেটুকু না করলে নয় সেইটুকুই করে। ওই করাটা আবার একটা করা নাকি? অনিচ্ছায় করা, মা-বাবার চাপে পড়ে করা, অথবা বৌ-দের জন্য করা, অথবা ছেলে মেয়ের ভয়ে করা, অথবা লোকে কি বলবে বলে করা। প্রত্যেক 'আমি' শুধু বেগার খাটে; নিজের ইচ্ছায়, বোকামিতে মুটে মজুর হয়ে জীবন পাত করে। আর প্রত্যেক অপর শুধুই ভোগ করে।

এই পর্যন্ত এসে একটা অস্পষ্টতা টের পেলাম। পরিষ্কার করে না নিলে চলছে না। আমাদের প্রত্যেকের মধ্যে যে আমি আছে তা এক রকমের নয়। নিজ আমি আছে, পারিবারিক আমি আছে, সামাজিক আমি আছে। এসবের অনেক আমি-র যোগফল আমাদের সর্ব আমি। আর একটা আমি-ও আমাদের ভিতরে আছে। এই আমি-কে অনেকে অনেক নামে চিহ্নিত করেন। দিব্য আমি, ঈশ্বরিক আমি, আধ্যাত্মিক আমি, আমার নিজের আমি। আসল কথা যার যার নিজের নিজের আমিটি তার তার কাছে কিছুটা কল্পনা কিছুটা আবছা-অনুভব আর বেশিটাই অজানা-অচেনা, অর্থাৎ অস্পষ্ট একটা বোধ মাত্র। এই অস্পষ্টতার জন্যই সেই আমিটা কখনই সদর্থক নির্দিষ্ট নয়, সর্বদাই নঞর্থক—নেতি নেতি—অনির্দিষ্ট। যত যন্ত্রণা এই এখানেই গড়ায়। এই এটা-নয় ওটা-নয় আমিটার পাশাপাশি এটাই-ওটাই আমি জাগ্রত চেতনাকে দখল করে থাকে। তাই কিছুটা চেনা বেশিটা অচেনা আমি নিয়েই আমাদের কারবার।

আমির এই কারবারে সকলেরই লোকসান বাঁধা। এই লোকসান থেকেই যন্ত্রণার শুরু। আমরা সকলেই বলি: আমার বাড়ি, আমার গাড়ি, আমার চাকরি, আমার সংসার, আমার স্ত্রী-ছেলে-মেয়ে, আমার বাবা-মা-শ্বশুর-শাশুড়ি। এক ধরনের মালিকানা, তাদাত্ম্য প্রকাশ পায় এই সব পজেসিভ আমি-র প্রকাশে। সদর্থক। আবার আমার হাত-পা, আমার দুঃখ-কষ্ট, আমার চিন্তাভাবনা — এরকম যখন বলি তখন বিভেদ, ফাটল, বিচ্ছিন্নতাও তো ভিতরে ভিতরে প্রকাশ পায়। নঞর্থক।

এই সদর্থক মালিকানাভুক আমি আর নঞর্থক বিচ্ছিন্নতাকামী আমি-র টানাপোড়েনে আমাদের বেশির ভাগটাই দীর্ঘজীবন ধরে আমির সুতোটাকে জটাইয়ে জড়ো করতে থাকি। একটা নিটোল আমির কোকুন তৈরি হয়ে যায়। দু'চার জনই আছেন যাঁরা এই প্রথম অংশের সদর্থক আমিকে ছাড়িয়ে নেন, নিজের বাইরে প্রসারিত করে দিতে পারেন। পরিবার ছাড়িয়ে গ্রামে, গ্রাম

হারিয়ে দেন, দেন ছড়িয়ে দিয়ে প্রসারিত করে দিতে পারেন। এই করতে গিয়েই তাঁরা তাঁদের নঙর্থক আমিকে বিচ্ছিন্নতার হাত থেকে মুক্ত করে সমাজবদ্ধতার আচরণে সদর্থক করে তোলেন —সর্বভূতে নিজের আত্মাকে দেখতে পান। লাটাইয়ের নোঙর ছেড়া আমি বিশ্বের ভুবনেই নিজেকে হারিয়ে নিজেকে খুঁজে পায়, কোকুনের নিরাকাশ অস্তিত্ব থেকে মুক্ত হয়ে প্রজাপতির মতো মুক্তাকাশে সত্য হয়ে ওঠেন। এঁদের সংখ্যা এতোই কম যে এঁদের ব্যতিক্রম বলে, অ-স্বাভাবিক বলে পাশ কাটাই অথবা জন্মদিনে মৃত্যুদিনে ফুলের তোড়ায় আর করজোড় পূজায় এঁদের অ-মানুষ করে দেবতা বানিয়ে ছাড়ি। নিজের দায় পূরণ হয়, যন্ত্রণা কমে যায়। নিশ্চিন্ত হয়ে আমরা নিজ নিজ লাটাই-আমির নিটোল ঘাঁটিতে, কোকুন-আমির নিরাকাশ ঘেরাটোপে প্রবেশ করে আমি-তে তা দিতে থাকি।

এই তা দিয়ে থাকি বলেই 'ভূতের বেগার খাটি'। নিজে নিজে যখন ভাবি তখন মনে মনে বলি: অপরের মুটে মজুরী করে করেই জীবন গেল, পরের কারণে নিজের সবই বাদ হয়ে গেল। আর যখন সেই অপরকে সামনে পাই তখন বলি: তোমার জন্যই আমার কিছু হল না। ভূতের বেগার খেটে খেটেই জীবনটা গেল। এই তুমি কখনও স্বামী কখনও স্ত্রী, কখনও অন্যকেউ কখনও অপর কেউ।

এখানেই শেষ নয়। বরং বলা যায় এখানেই শুরু। একটা সময় আসে যখন জৈব আমির সঙ্গে 'জৈব' আমির বিরোধ বাঁধে। তাণ্ডব শুরু হয় তখনই। তখন লোকসানের আর শেষ থাকে না, যন্ত্রণার আর তল পাওয়া যায় না। তখন প্রত্যেকেই হয়তো নষ্টহতো ভ্রষ্ট হয়ে কপালে করাঘাত করে আর ভূতের বেগার খাটার অনুশোচনা করে। সারাটা জীবনই তো জৈব বেঁচে থাকার সংগ্রামে উঠে পড়ে লেগে থাকতে হয়। শিশুর বয়সে নির্দেশ আসে — প্রস্তুত হও, লেখাপড়া শেখ, হাতেকলমে কাজ রপ্ত কর, রসদ সংগ্রহের পথ-প্রক্রিয়া শিক্ষা কর। প্রৌঢ় বেলায় সংসার পাত—সব কাজ ঠিক ঠাক সারা করা হলো তো? অর্থই-পর্দই-আর্টই কাজ সেইতে দৌড়ঝাঁপ লেগে যায়, ফেলে আসা জীবনের বড়বড় অংশগুলোকে সারাই-সংস্কার করতে হয়, তাপ্পি-তাপ্পি দিতে হয়। তখনই ধরা পড়ে যায় যে যতো তাপ্পি-তাপ্পা করেই জীবনকে বাঁচা হয়ে থাকুক না কেন সেই জীবনে ফাঁক-ফোকর থেকেই গেছে। অক্ষমতার জ্বালা, ভয়ের বীজ আর ভবিষ্যতের আশংকা তখন তোলপাড় করতে থাকে। বার্ধক্য অবস্থা নিয়ে আসে—জৈব বাঁচাটা বাঁচাতে গিয়ে নিজের আসল বাঁচাটার সময়ই পেলে না। তখনই মনে হয় যে সারাটা জীবনই পরের জন্য নষ্ট হয়ে গেল, ভূতের বেগার খেটেই এলাম।

নিজেকে নিয়ে যারা সময় মতো একা একা হতে পারে, মিটিং করতে পারে, যারা জৈব বাঁচার মধ্যে মধ্যে এবং বাইরে নিজের মূল্যবোধের, আদর্শবোধের বাঁচাটার কথা ভাবতে পারে তারা সময় থাকতে থাকতেই সময়কে কাজে লাগায়। বেশিরভাগই তো জীবনের প্রস্তুতিপর্বে প্রস্তুতি নিয়েই ঊর্ধ্বশ্বাস ব্যস্ত থাকে বলে জীবনকেই দেখতে পায় না। সংসার পর্বে, সংসারের অক্টোপাস বেষ্টনে আপেটা হয়ে তেলে-নুনে ডুবে যায় বলে নিজের সন্ধানে সময় দিতে পারে না। প্রৌঢ়াবস্থায় জীবনের জাবেদা খাতাখানা খুলে বসে হিসেবের খারাপাতে লাভ-লোকসানের খতিয়ান করতে গিয়ে জীবনের গড়মিল ছাড়া আর কিছুই খুঁজে পায় না। দীর্ঘশ্বাস বার্ধক্যের কথা ছেড়েই দিন। এক বোকা কুইনিন মুখে তেমাথা জীবনে পুরো জীবনটাই তখন ডেবিটের ঘরে চলে গেছে।

এমন হবার কথা নয়, তবুও হয়, হচ্ছে। কেন? মনে হয় আসল মারটা প্রকৃতির হাতেই আমরা খেয়ে থাকি। বিশ্বপ্রকৃতি এবং মানবপ্রকৃতির হাতে। দুই জায়গায়ই নিয়মের রাজত্ব—উঠিতেও নিয়ম, বসিতেও নিয়ম। জড় প্রকৃতি, প্রাণিপ্রকৃতি এবং সব শেষে মানব প্রকৃতি। জড়ের মধ্যে প্রাণের ধর্ম নেই, প্রাণের মধ্যে মনের নিজস্ব গুণটি নেই। অথচ বিপরীত ক্রমে ব্যাপারটা একরকম নয়। মন যেখানে আছে সেখানে প্রাণও আছে জড়ও আছে। মানুষের বেলায় তাই তিনটি ধর্মের, স্ব-ভাবের, টান আছে। তাই মানুষ ভূতের মার খায়, প্রাণ ধর্মের জৈব পীড়ন সহ্য করে। শুধুমাত্র মনের মনন নিয়ে থাকাটা তার প্রকৃতির অভিপ্রেত নয়। এইখানেই তার মার খাওয়ার উৎসটি খুঁজে পাওয়া যাবে। নিজের অস্তিত্বের জন্য ভূতের বেগার খাটতে হবে, বাঁচার জন্য প্রাণধারণের সব যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে। এই দুই জড়-জৈব টানের বাইরে তার যে মন, মনের নিজস্বতা, তাকে নিয়ে একা একা হওয়ার সময় বা সুযোগ তার কতটুকু? মন একটা আছে, সেই মনের অনুভব আছে, আছে মূল্য এবং আদর্শবোধের একটা অস্পষ্ট উপলব্ধি। কিন্তু এ-সবই মাধ্যাকর্ষণের মতো জড়-জৈবাকর্ষণের অনিবার্য টানে 'নিম্নমুখী', ধরার ধূলির ধূসরতায় মাখামাখি হয়ে যায়। আদর্শ আর মূল্যবোধের 'খাস' একমাত্র মনকে ঊর্ধ্বমুখী, স্ব-মুখী করে তুলে, বেগার খাটার অনুভব থেকে মুক্তি দিতে পারে, প্রাণের মুষ্টিগিরির মধ্যেও মনের অক্সিজেনের যোগান দিতে পারে।

পারে, এবং নিয়ম লংঘন না করেই পারে। যান্ত্রিক নির্ধারণবাদ, অ-যান্ত্রিক অনির্দেশ্যবাদ আর স্ব-নির্ভরবাদের বাদানুবাদে না গিয়েও বলা যায় মনের ক্ষেত্রে, অর্থাৎ মানুষের জীবনে, স্ব-নির্ভরতা নিয়মেরই নিয়ম। একটা সাধারণ সার্বিক বিশ্বনিয়মের মধ্যে অন্যান্য শত শত বিশেষ নিয়মের মধ্যে একটি নিয়ম। জৈব নিয়ম যেমন জীবনের ক্ষেত্রে সার্বিক নিয়ম, মনের নিজের এলাকায় মননের নিয়মও তেমনি মনের নিজস্ব নিয়ম।

কিন্তু মানুষের দুর্ভাগ্য যে তার এই মননের নিয়ম প্রতিনিয়ত জৈব নিয়মের পেষণে পীড়িত হতে থাকে। শৈশব-বাল্যে যদি পড়ার বই থেকে খেলার মাঠে মন দেয় শিশু-বালক তাহলে প্রবৃত্তি মার খায় বলে অভিভাবক-সমাজ রক্ষণের শাসনে ধেয়ে আসে। প্রান্তরের সবুজ আর আকাশের নীল মনের খাদ্য হিসেবে যতো পুষ্টিকরই হোক না কেন জীবনের দৃষ্টিতে অবান্তর-অপ্রয়োজনীয় বলে পরিত্যাজ্য। ছাত্র জীবনে গ্রামারের জেলখানার বাইরে মনের প্রাঙ্গণে যদি প্রভাত বেলার রবির কর প্রবেশ করে তাহলে মনের মনন সিঞ্চিত হয় ঠিকই কিন্তু প্রবৃত্তি বঞ্চিত হয় বলে মনে করা হয়। যে বালকের প্রাণের পর প্রভাতের রবির কর কেমনে পশিল বলে প্রশ্ন জাগে সেই বালক জড়-জৈবাকর্ষণের বাইরে, ঊর্ধ্বে চলে যেতে পারে—মননেরই নিয়মে। যাদের মনের চারদিকে প্রবৃত্তির চাহিদার বেড়া আষ্টেপৃষ্ঠে আঁটা থাকে তাদের ভবিষ্যৎ জীবনে 'বেগার খাটা' ছাড়া আর কোন অনুভব ঘটতে পারে?

একই ভাবে যে তরুণ অন্তরের কান্না অনুভবে অবগাহনের পরিবর্তে ইতিহাস-ভূগোলের গভীর অরণ্যে পথ হারায়, যে যুবমানস সুন্দরের চেতনাকে টেস্টপেপারের আরাধনায় কবর দেয় আর যে মধ্য জীবন মঙ্গলের অনুধ্যানে সময় না দিয়ে ভোগের পণ্য-যোগানে হাবুডুবু খায় তাদের মনের মরণশীল অংশে সময় কালে মুক্তি পায় না বলেই অসময়ে দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে। ফলে—সারাটা জীবনই ভূতের বেগার খেটে বেড়ায়। ছোটবেলা থেকে এই যে সত্যের জানালা-দরজায় চাইতে বাস্তবের

প্রবৃত্তির সেবাইশে ফূর্তি আর আয়াসের আধিক্য, পরিবারের সুন্দরের চাইতে পরিবারের অভ্যন্তরের তীব্র জীবনের তীব্রতার টান আর সমাজের মঙ্গলের চেতনার চাইতে বাণিজ্যিক জীবন-যাত্রার হিসেবের ঝোঁক—এখানেই দুই মহলের বীজ বোনা আছে। একটা জীবন দুবার বাঁচা যায় না। তাই শেষ ধাপে দাঁড়িয়ে হতাশ নিজ নিজ মাথার টাক দেখা ছাড়া আর গতি কি?

বইয়ের পাতা মুখস্থ করতে গাছের পাতার সবুজকে হারাই, জীবনের আনন্দকে গোগ্রাসে গিলতে গিয়ে আকাশের নীলকে হারাই, আর শেষ বেলায় হিসেবের খাতায় মুখ ডুবিয়ে শান্ত-স্নিগ্ধ সন্ধ্যাটুকু হারাই। এই হারাই হারাই বলেই চেঁচিয়ে উঠি—সকলই বেঘোরে গেল, ভূতের বেগার।

সব সমস্যাকেই যেমন মাইক্রো এবং ম্যাক্রো দৃষ্টিতে দেখা যায়—ক্ষুদ্রসূক্ষ্ম এবং বৃহৎ-ব্যাপক প্রেক্ষিতে দেখা যায় তেমনি এই আত্ম-পর—নিজের আপন আর বাইরের অপর হিসেবেও দেখা যায়। এতক্ষণ প্রথম দেখাটাই দেখছিলাম। এবারে একবার বৃহৎ-ব্যাপক বা বাইরের অপর-দৃষ্টিতে দেখা যাক।

শুনেছি একটা আলপিন তৈরি করতে কম করেও ছত্রিশটা পর্যায় পার হতে হয়। হিসেব সঠিক হলে ঐ পর্যায় সংখ্যা তিনশ-ছত্রিশ অথবা আরও ব্যাপক দৃষ্টিতে তিন হাজার ছত্রিশ হতে পারে। তা, একটা ক্ষুদ্র আলপিনেই যদি এমন জটিলতা—জটিল এবং বহুবিধ প্রক্রিয়ার সমন্বয় অনিবার্য হয়—তাহলে একটা গোটা আমি তৈরি হতে ব্যাপারটা কতদূর গড়াবে কে জানে। সংখ্যার আর গুণ পরিমাণের হদিস পাওয়া আমার কর্ম নয়। এই আমি যখন কোন কাজ করে—কাজ তো তাকে প্রতিনিয়তই করতে হয়—তখন তাকে কতো জনের সঙ্গে, কতভাবে ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া করতে হয় তার বোধহয় লেখাজোখা থাকে না। আমরা রোজ বাজার করি, অফিস যাই এবং তিনবেলা আহার এবং একবেলা ঘুমে কাটাই। [ঘুমের বেলায় এবং আহারের ব্যাপারে মতান্তর হতে পারে! তা, হোক, সেই মতান্তরে, আমাদের বক্তব্যের কোনো হেরফের হবে বলে মনে হয় না।] যিনি পনেরো মিনিটেই চটপট বাজার করে ফেরেন আর যিনি ঘণ্টাখানেক পথের মাঝে, দোকানে দোকানে অফিস, সমাজ আর রাজনীতির আলোচনা বিনা পয়সায় কেনা বেচা করেন, তাঁদের দুজনই কম-বেশি ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় জড়িয়ে যান। একই ভাবে অফিসে যেতে এবং অফিসে গিয়ে, বেড়াতে পথে এবং থিয়েটারে গিয়ে, খেলার আসরে দর্শক হয়ে অথবা নষ্ট-নষ্টী সেজে হাজারো ক্রিয়ায় এবং লক্ষ প্রতিক্রিয়ায় আমরা নিজেদের জড়িয়ে ফেলি, ছড়িয়ে দিই। যে কোন কাজেই আমরা আমাদের নিজ নিজ আমি গুলোকে অনেক অনেক অন্য আমি-র সঙ্গে মিশিয়ে-মিশিয়ে প্রসারিত করি, প্রতিনিয়তই করে থাকি। সব সময়ে যে সচেতনে ঘটে তেমনও নয়, তাই অপরাপর আমি গুলোকে আমরা আপন করে নিতে পারি না। পারি না, এবং অনেক সময়ে বিরূপতার কারণে করে নিতে হয়তো চাই না। অন্য আমি গুলো হারিয়ে যায়, হারিয়ে ফেলি। তবে, আমাদের আমি গুলোর প্রসারণ ঘটে—তা সঙ্কুচিত প্রসারণ অথবা প্রসারিত প্রসারণ হতে পারে। আমাদের ইথার জগতের—ইউনিভার্স অব ডিকার্তস-এর যেমন বৃদ্ধি ঘটে অনেকটা তেমনি এই আমি-জগতের বৃদ্ধি।

আমি-র দ্বিধাও এখানে দ্বৈধও এখানে। ক্ষুদ্র-সূক্ষ্ম-মহৎ আমির জড়-জৈব আকর্ষণ এতোই প্রবল যে বৃহৎ-ব্যাপক আমির প্রসারে সে পিছুটানের হেতু হয়ে দাঁড়ায়। গ্যাস পোরা বেলুন হয়ে আকাশের নীলে উঠে যাবার জো থাকে না। সেই জড়-জৈবের অনিবার্য আকর্ষণের টানকে আমরা সারাজীবনই অনেক অনেক বার কাটিয়ে উঠতে চাই। চাই এবং মাঝে মধ্যে আদর্শের আর

মূল্যবোধের পাহাড়ের চাপে আমির সত্তাকে নষ্ট করে, লাটাইয়ে বাঁধা ঘুড়ির মতো, কাছে দূরের আকাশকে অনুভবও করে ফেলি। এই উত্তরণের সুযোগ ঘটে বলেই আমরা, মনের মননে এই বৃহৎ-ব্যাপ্ত আমির ছোঁয়া লাগে বলেই, আমরা বিনম্র বোধ করি। ক্ষুদ্র-সংকীর্ণ আমির অহংবোধে ক্ষুদ্র বোধ করি। তখনও কিন্তু মনে হতে পারে 'সারা জীবনই ভূতের বেগার খেটে মলাম'। হতে পারে কারণ ব্যাপ্ত-বৃহৎ আমির স্বাদ দু একবার তো অন্তত আমাদের সকলের জিভেই—মনের জিভেই টের পেয়ে গেছি।

আগে দেখেছি লাটাইয়ের নির্মোহ আমি অথবা কোকুনের আকাশহীন বদ্ধ দশায় আমি কেমন বেগার খাটার যন্ত্রণায় ক্লিষ্ট বোধ করে, এবারে দেখলাম প্রসারিত-ব্যাপ্ত আকাশ-আমির বেদনা। ক্ষুদ্র আমি আর বৃহৎ আমির এই দ্বন্দ্ব আমাদের প্রকৃতির দান। দ্বিধা-দ্বন্দ্বও তো তাই এই দুই বিপরীত আমির আকর্ষণ পাওনা। জড় জৈবের মুটে-মজুরী যেমন আমাদের স্ব-ভাবের প্রকৃতি-লিপি, ঠিক তেমনি ক্ষুদ্র বৃত্তে পাক খাওয়া বলদের মতো—কলুর বলদের মতো—বাইরের প্রসারিত আমির দেখা পেয়েও প্রসারিত-ব্যাপ্ত না হতে পারার বেদনাও আমাদের স্ব-ভাবের দান। এই বিরোধের ফাঁদে পড়ে, দ্বন্দ্বের ফাঁদে পড়ে আমরা সকলেই এক একজন বগা—ফাঁদে পড়িয়া বগা কান্দে রে!

এই ক্রন্দনের অপর নাম, একটি প্রকাশ—ভূতের বেগার খাটা। অপরের বিপদে যারা ছুটে যায় তারা নিজেকেই ছাড়িয়ে যায়; ভাইয়ের বিপদে ভাই নিজের ঘরের দরজা বন্ধ করে ক্ষুদ্র আমির কোকুনে নিরাপদ হতে পারে, আবার সেই ভাইই নিরাকাশ ক্ষুদ্রতার ঘেরাটোপ ছিঁড়ে ব্যাপ্ত-বৃহৎ ভালবাসার আকাশে জীবনের নীল আর প্রাণের সবুজকে স্পর্শ করতে পারে। যারা পারে তারা বেগার খাটে না, অপরের জন্য নিজেকে 'নষ্ট' করে না। বরং নিজেকেই বড় করে পরিপূর্ণ পরিব্যাপ্ত করে খুঁজে পায়। যারা পারে না তারাই গৃহ-বন্দি হয়ে বাইরেটাকেও হারায়, ভিতরটাকেও দূষিত করে তোলে। এবং এরাই পড়ন্ত বেলায় কপালে করাঘাত করে অদৃষ্টের নিন্দা করে। নিন্দা করে, ধিককার দেয় আর বলে—মুটে মজুরী করেই জীবনটা গেল, ভূতের বেগার খেটেই জীবনটা নষ্ট হল।

সংগ্রহের সিন্দুকে—এখন অবশ্য ব্যাঙ্কের পাশবুকে আর কম্পানির কাগজে—বহুমূল্য সম্পদটাকে জমা করতে করতে কখনই মনে হয় না যে অর্জনের ঘরে শূন্য থেকে গেল। জড়-জৈব আমির ভোগ উদর স্ফীত করতে করতে মন-আমির দিকে নজর দেবার সময় জোটে না। পড়ন্ত বেলায় যখন জড়-জৈব আমির আকর্ষণ ক্রমশই কমতে থাকে আর মন-আমি নিজ নিকেতনে ফিরে তাকানোর অপ্রতিরোধ্য অবকাশ পায় তখনই নিজ নিজ কন্দরে ধেয়ে যেতে চায় কপালের তাগাদে, অথবা কপাল ঠেকে দেয়ালের কাঠিন্য—কপাল চাপড়ানো অথবা দেয়ালে কপাল ঠোকা ছাড়া আর গত্যন্তর থাকে না। আর সেই সঙ্গে নীরব চিৎকার অনুচ্চার কণ্ঠে নিজেকেই ধিককার দিতে থাকে—ভূতের বেগারে, অপরের মুটেগিরিতে জীবনটা নষ্ট হয়ে গেল।

গল্পের অগ্রদানী ব্রাহ্মণ পূর্ণ চক্রবর্তী—অন্যের শ্রাদ্ধের দান ও আহার গ্রহণ করতে করতে একদিন নিজের সন্তানের শ্রাদ্ধের দান-আহারে মহানন্দে পাত পেড়েছিল! আমরা বেশিরভাগই এক একটি পূর্ণ চক্রবর্তী। ভোগের লালসায়—কর্মজীবনারম্ভের তাড়নায়—সর্বভুক-সর্বভোজী হয়ে কবে যে নিজের নিজের আমিটাকে শুদ্ধ হজম করে ফেলি তা টেরই পাই না। ক্ষুদ্র আমির কোকুনে

আটকা পড়ে বৃহৎ আমিকে অবহেলা করি, প্রকাশে বাধা দিই এবং অবশেষে একদিন তাকে হত্যা করে জৈব স্তরের পৌঁছে নিচতলায় পড়ে হাঁসফাঁস করে বসে থাকি। বসে থাকি আর নিজেকেই অভিশাপ দিই—ফুলের বেলায় ফোটা ফোটাই জীবনটা শেষ হয়ে গেল!

অনেকে অবশ্য নিজ নিজ সন্তান সন্ততির মধ্যে নিজের মনের প্রসার ঘটিয়ে বাঁচতে চান। স্বাভাবিক। বৃহৎ আমির ব্যাপ্তি না পেলেও এঁরা একটা পারিবারিক আমিতে সুখের স্বাদ খোঁজে মেটাতে চেষ্টা করেন। ব্যাপারটায় মনের ব্যাপ্তি ঘটে না, স্বার্থের বৃদ্ধি-ই বেড়ে যায়। মানুষের প্রকৃতির মধ্যে যে প্রকৃতির সবুজ আর আকাশের নীল আছে—তার টানে নয়, ভবিষ্যতের অনিবার্য অক্ষম দিনের সুরক্ষার টানেই এই প্রসারটুকু ঘটে। তাই এই প্রসার নেহাতই জৈব-জড় চেতনার ফসল, অর্থাৎ স্বার্থসঙ্কুল। তাই এই ব্যাপারটা সর্বক্ষণ বিঘ্নিত হয়ে ধরা পড়ে যায়—অবশ্যই মনে মনে। জীবনের বেলা যতো বাড়ে ততোই এই সব স্বার্থ-দুর্গের আপনরা ক্রমশই অপর থেকে পরে নির্বাসিত হতে থাকে, আঘাতের পর আঘাতে তখন কপালে 'কড়া' পড়ে যায়, অবস্থার কোনো ইতরবিশেষ হয় না।

নিঃস্বার্থ প্রসার না দিতে পারলে মন নিজের নিকেতন খুঁজে পেতে পারে না। ভালবাসার সার্থকতা ভালবাসাতেই, স্বার্থের পূর্তিতে যে ভালবাসা, ভবিষ্যতের বাণিজ্যিক লাভ লোকসানের হিসেবে যে ভালবাসা তা মনকে ছড়িয়ে দিতে পারে না, প্রসারিত করতে পারে না। আমরা ফুলকে ভালবাসি, প্রকৃতিকে ভালবাসি, সুন্দরকে ভালবাসি। নিঃস্বার্থই ভালবাসি। এদের ভালবাসি এরা মনোহরণ বলেই, কোনো প্রত্যাশা নিয়ে নয়। সন্তানরা যখন ছোট থাকে, শিশু থাকে, নিষ্পাপ সুন্দর থাকে তখনও তো তাদের আমরা সর্বসংস্কারমুক্ত মনে সর্বপ্রত্যাশা শূন্য চিত্তে আবাহন-অভিবাদন করতে পারি না! ছেলে-মেয়ের বিত্তের ভবিষ্যত কারণে, বংশের এবং অন্ন-সংস্থানের হেতুতে ভিন্নমন হয়ে পড়ি। স্বার্থের প্রবাহটা ফল্গুধারার মতোই বহমান থাকে—হয়তো ততোটা বাহ্য প্রকাশে বাস্তব হয়ে ওঠে না। শিহরে ওঠে না বটে কিন্তু প্রত্যাশার স্বার্থের বীজটি যে অনিবার্য উপ্ত ছিল তা টের পেতে বড় বেশি বিলম্ব হয় না। মা-বাবা বৃদ্ধ হলে ছেলে-মেয়েরা [মেয়েরা !-ও ?] দেখবে—এমনতো একটা আশা, বা, বলা ভালো, প্রত্যাশা কারো কারো মনে সোচ্চার জানান দেয়, কারো কারো মনে অনুচ্চার প্রবাহিত থেকে যায়। একটা ভয়-ভয় ভাব তাই এদের তাড়িত করে। একটু সমীহ করে আচার-আচরণ করতে বাধ্য হয়ে পড়ে, বৃদ্ধাবস্থা যতো বেশি বেশি অসহায়তার দিকে গড়ায় পান-থেকে-চুন খসার প্রবাদটা ততো বেশি বেশি স্মরণ হতে থাকে।

তাহলে কি একথা বলা ঠিক হবে না যে আপনজনেদের মধ্যে যখন আমরা নিজেদের ছড়িয়ে দিই তখনও নিজেকে ছাড়িয়ে যাই না, যেতে পারি না। ফুলের বেলায় যেমন, মানুষের বেলাতেও যদি তেমন প্রত্যাশাহীন, স্বার্থগন্ধহীন ভালবাসায় নিজেকে ছড়িয়ে দেওয়া যায় তাহলেই হারিয়ে যাওয়া যায়। সরষে তারার যেমন মিটি মিটি করে চোখ, তেমনি যদি শুধুই সরষে, স্নেহ-প্রীতি-ভালোবাসায় আমাদের আমিগুলো অপরের দুঃখে কষ্টে মিটিমিটি করে সেই অপরের দিকেই চেয়ে যেতে পারে, দৃষ্টিপাতে নিজের প্রসারকে সম্ভব করে তুলতে পারে তাহলে ফুলের বেলায় খাটার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে জীবনের যাথার্থ্য কিছু করার চেতনায় সার্থক সুখ খুঁজিতে পারে।

এখানে একটা কূটতর্ক পাতা আছে। স্বার্থ। স্বার্থ ছাড়া মানুষ কোনো কাজই করে না। হক

কথা, একেবারে ঠিক কথা। আবার মানুষই নিঃস্বার্থভাবে কাজ করতে পারে, করেও থাকে। এটাও ঠিক কথা, ঠিক কথা। তাহলে? স্ব-বিরোধ, না আপাতবৈপরীত্য—প্যারাডক্স?

বসত বাড়ির সীমানা ছয় ইঞ্চি বাড়াতে পেরে স্বার্থ সিদ্ধি হয়, আনন্দবোধও জাগে। চাকুরে ছেলেকে তোয়াজ করতে তার জন্মদিনে উপহার দিয়ে ভবিষ্যতের জন্যে লগ্নি করতে পারি, অথবা পুত্রবধূকে তার জন্মদিনে বেনারসী দিয়ে। এখানে প্রত্যাশা—স্বার্থ সিদ্ধির ভবিষ্যৎ প্রত্যাশা। ছেলেকে যে আমরা অনেক যত্ন নিয়ে বড় করে তুলি, পড়াশুনো শেখাই, মেয়েকে নয়, তাও তো এই লগ্নি মানসে! কত্তো জনের কাছেই তো যাই, মাঝে মাঝে যাই অথবা অনেক দিন পরে হঠাৎ যাই। একটা স্বার্থ ছাড়া এসবের কোনোটাই তো আমরা করি না। "বলুন, কি মনে করে এলেন?" অথবা "কারণে আসা হল?"—এ ধরনের প্রশ্নে আমরা আমাদের মনের ইচ্ছা, মতলব, স্বার্থ অনায়াসেই টের পেয়ে যাই, দেখতে পাই।

এবারে একটু অন্যভাবে দেখা যাক। প্রান্তরের পথে একা এক আর্ত জন। মরণাপন্ন। আপনার শত তাড়া আর শতেক কাজ। মনে আপনার বেদনাবোধ, ঐ মুমূর্ষুর জন্যে। আপনি তার চিকিৎসার জন্যে চেষ্টা আর সময় দিলেন। কোনো লগ্নি নয়, আনন্দ পেলেন। তৃপ্তি, যেন একটা উত্তরণ ঘটল আপনার। এটাও তো স্বার্থ সিদ্ধি—মনের উৎক্ষিপ্ত বেদনাবোধ থেকে নিষ্কৃতি পাওয়া যেন আবার সার্থক সমাধানে আনন্দ উৎক্ষিপ্ত।

আবার, মনে করুন, পথ দুর্ঘটনা। বহুজনের হাহুতাশ। এক-দুজনই এগিয়ে এলো। ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাঁচাতেই হবে। যেন পণ। [সকলেই তো দুর্ঘটনাগ্রস্তের গলার সোনার চেন, পকেটের মানিব্যাগে দৃষ্টি এমন নয়।] যেমন উদিত তেমন করে হয়তো তারা হারিয়ে গেল। আর কিছু নয় শুধু মানুষের বিপদে এগিয়ে আসা, এগিয়ে যাওয়া। হয় না? হয় এবং হবেও। এদেরও কি একটা রকম স্বার্থ নয়? সেই মনের বেদনা বোধ, অথবা মনুষ্যত্বের দায়ভার, অথবা আনন্দের আবেগ। উত্তরণ এখানেও।

এক কথায় বলা যায়। কাজের চালিকা শক্তি যেখানে জ্ঞাত-অজ্ঞাত প্রত্যাশা সেখানেই স্বার্থ। কাজের প্রেরণাশক্তি যেখানে আনন্দ সেখানেই উত্তরণ, নিঃস্বার্থ। মনের বেদনাবোধ যখন ছন্দে-বাক্যে প্রকাশ পায় তখন তা আনন্দের, তাই নিঃস্বার্থ। স্বীকৃত কবি সাহিত্যিক যখন কোনো ক্ষুদ্র বা বৃহৎ প্রত্যাশায় কাব্য-সাহিত্য সৃষ্টি করেন তখন তা স্বার্থ। পল্লবের আড়াল ছেড়ে কুঁড়িটি যখন পাপড়ি মেলে ফুল হয়ে ফুটে ওঠে তখন তা প্রকৃতির আপন নিয়মেই ঘটে। আমরা বলি আনন্দের প্রকাশেই ঘটে। প্রত্যাশা ছাড়াই ফুলের এই পাপড়ি মেলাটা ঘটে যায়। ঠিক তেমনিই শিশুর বেড়ে ওঠাটার মধ্যেও কোন স্বার্থ গন্ধ নেই, আছে লালন পালনে, যেমন, ফুলকে নিয়ে মালী যখন দোকানে-বাজারে যায়।

বিশ্ব প্রকৃতিতে মানুষই একমাত্র প্রাণী যে জৈব জড়ের নিয়মে প্রত্যাশার কারণে স্বার্থপর, আবার মানব-প্রকৃতির আপন অন্তরের নিয়মে আনন্দেরও পূজারী। এই প্রেরণার উৎসেই তার আপনাতে উত্তরণের পথ। জড়ের বেগার খাটার হাত থেকে মুক্তি।

পথ তো আছে, ইচ্ছা এবং চেষ্টাটাই মার খেয়ে যায়, অভাব পড়ে যায়। তাই তো কপালে করাঘাত অনিবার্য ঠেকে। সারা জীবন নিজেরাই জৈব জড় অস্তিত্বের মুটে মজুরী করতে করতে, খিদমদগারি করতে করতে আর সময় থাকে না যে নিজের মধ্যে যে অ-জড় অ-জৈব আমিটি আছে

তার কাছে দু'দণ্ড বসি, তাকে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করি। সময় এলে সমস্যা পার করে নিয়ে। এটাই বোধহয় আমাদের সুইটেস্ট সঙ!

মন এক মজুর

কথায় বলে লোকে তিন ভাবে শেখে—শুনে, দেখে আর ঠেকে। যাঁরা শুনেই শিখতে পারেন তাঁরা উত্তম, যাঁরা দেখে শেখেন তারা মধ্যম আর আমরা যারা ঠেকে শিখি তারা অবশ্যই অধম। তবে সান্ত্বনার বিষয় এই যে আমরাই দলে ভারি। এবং সুদূর অতীতের কথা জানি না, তবে আমাদের কথা অবশ্যই জানি—এবং, অবশ্যই, ঠেকে জানি। জানি যে দলে ভারি হতে পারলে, পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারলে, সব কিছুই সহজ হয়ে যায়, তরতর করে এগিয়ে যাওয়া যায়। ঠেকে শেখাটা তাই অধমের পর্যায়ে পড়লেও মাঝেমাঝে উত্তমের মাথার উপর দিয়ে যায়।

ঠেকে শেখার ব্যাপারে আমরা কেউই কম যাই না। তার মধ্যেও যে শত বার ঠেকে ঠেকে আর সহস্রবার ঠেকে শেখেও সঠিক শিখতে পারলো না সে আর কেউ নয় আমাদের নিজ নিজ 'মন'। এতো কাছের, এতো আপন এবং দিনরাত্র এতোবার তার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় তা সত্ত্বেও মনকে জানা বা বোঝা ক'জনের পক্ষে সম্ভব হয়েছে? আমি তো নিশ্চয় করে বলতে পারি আমার পক্ষে তা এখনও সম্ভব হল না, আর হবে কি না তাও আমার সন্দেহের বিষয়। বহুবারই তাকে নিয়ে ভেবেছি, ঠেকেছি এবং ঠেকে শিখেছি, আরও পরেরবার সেই একই ঘটনা আগে দেখা আছে তাও জানি কিন্তু কোনও দিন যে এই মনটিকে নিজের মতো করে জানতে-বুঝতে-চিনতে পারব তার সুদূরতম সম্ভাবনাও মনের কোণে স্থান দিতে পারছি না।

মন একটি মজুর, মজুর বললে অনেকেই রাগ করতে পারেন। কিন্তু রাগ করেও মনে মনে স্বীকার করে নেবেন। মজুর কেন? কারণ 'ভাগে দুধ না ভাগে টাক'! কাউকে নিজের মতো বোকা বানাতে চান তো মনকে পরিশ্রমী মজুর করে তুলুন। মনের গভীরে আপনার আসল উদ্দেশ্যকে লুকিয়ে ফেলুন আর বাইরে মিষ্টি বা নরম ভদ্রের ভান ছড়িয়ে দিন। মজুরের মতো কাজ হবে। লোকেরা বুঝে যাবে আপনি যা বোঝাতে চান, যা আপনি জানাতে চান, যেমন আপনি চেনাতে চান। ব্যস্।

কেবলমাত্র অপরের কাছেই বা কেন আপনি প্রয়োজন মনের ভেতর ঢুকে পড়ুন দেখবেন সভ্যতার সর্বশেষ, রুচি-সংস্কারের সকল দাবির কেমন অবলীলায় সমাপন করে যাবে আপনার মন, নিজেই অভিভূত হয়ে পড়বেন মনের ক্ষমতা দেখে। মন্ত্র যেমন পথ তৈরি করতে পারে, যন্ত্র তৈরি করতে পারে তেমনি দেখবেন মন্ত্রবলের মতো আপনার মন কেমন অনায়াসে 'সভ্য'-তার নিটোল আবরণটি তৈরি করে আপনার প্রকৃত মনোভাবকে আড়াল করে দেবে, দেখবেন কেমন নিটোল প্রবৃত্তি মাজা-ঘষা করে অপরের মনটিকে নির্বোধ প্রতিপন্ন করে দেবে, কিন্তু সে টেরও পাবে না। তাই বলছিলাম যে মন মজুর ও যেমন যন্ত্র ও তেমনি।

মন একটা গোলকধাঁধাও তো বটে! মনের মধ্যে মন, আবার তারও মধ্যে মন আছে। তবেই বুঝুন! মন তাই জিনিসটি অনেক শুধু নয় তার চাইতে বেশি কিছু। কারণ সে আছে, আমাদের মধ্যেই অবস্থান করে চলেছে, কিন্তু তার হাল-হকিকৎ একেবারে অজানা। বাইরে থেকে যারা ঠকাবে তবুও টের পাবার, আগে থেকে তৈরি হবার সুযোগ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু যে আছে ঘাপটি মেরে অন্তরের অন্দরে, অন্তঃকরণের কন্দরে, সে যখন যায় ঠকাবে? কে আমাদের মুখ

ফসকিয়ে দেয় ? নাক-ডুবিয়ে দেয় ? যেখানে যা বলার কথা তা বলতে দেয় না, যেখানে যা বলার কথা নয় তা ধরধর করে বার করে আনে। স্থান-কাল-পাত্র মানে না, বিপদে ফেলে অকারণে বিপন্ন করে কে ? অথচ সেই মনকেই দুধ-কলা দিয়ে নিরন্তর পুষে চলেছি, বাধ্য হয়েই !

নিজ নিজ মন নিয়ে প্রত্যেকেরই বেদনার শেষ নেই। সর্ব প্রযত্নে ভাল থাকতে চাই, কিন্তু মন তা দেবে না বলে প্রতিজ্ঞা করে বসে থাকে। মন-মরা অবস্থা কে ঘটায় ? অসাফল্য তো জীবনে বাস্তব সত্য, সকলেরই তা ঘটে। কষ্ট-যন্ত্রণা-বেদনা-বিষাদ কার নেই জীবনে ? এ-সব সাদামাঠা সত্য আমরা সকলেই বুঝি। কিন্তু মনটি টুক করে depression ঘটিয়ে আপনার জীবন কেমন বিস্বাদময়, স্যাঁতসেঁতে, নিষ্প্রভ করে ছাড়বে ! অফিসে দেরি কার না হয় বলুন ? ট্রেন লেট, বাস ভিড়ধারণে অক্ষম, রাস্তায় নন্দীভৃঙ্গীর মতো যান-জট। জানা কথা, এ-সবই নিত্য-নৈমিত্তিক। কিন্তু দেখবেন ভিতর থেকে আপনাকে Stress আর Strain-এর টান টান দড়িতে ঝোলাচ্ছে। কে ? আর কে, সেই অকাজের কাজী মন ! কেন বাবা এহেন ব্যবহার ? যা স্বতঃ সিদ্ধ, জানা-কথা তা নিয়ে শরীরের পেশী আর স্নায়ুর দড়ি নিয়ে টানাটানি করা কেন ?

ছেলে অফিস থেকে ফিরে মুখ ঘুরিয়ে শোবার ঘরে ঢুকে গেল, মেয়ে এখনো, এতো রাতেও বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফিরল না, স্ত্রী বিকেলের পর রাতের অন্ধকারে নিয়ে এলেন—কতো কি ই তো ঘটছে, ঘটবে, ঘটতে পারেই। হাজারো কারণও তার থাকতে পারে, থাকেই কিন্তু তা হলে কি হবে ? আপনার ভিতরের তিনি, আপনার মন, মোচড় মারবে, ঘাই দেবে, অশান্তির একশেষ করে ছাড়বে।

ঠেকে ঠেকে শিখেছি যে সহজ পথ কখনই মনের পছন্দ নয়। সোজা রাস্তায় চলায় তার নিতান্ত অভাব। একটা শিশুতে যা বোঝে, এক এক সময়ে, মন তা বুঝে উঠতে পারে না। আবার এক এক সময়ে এমন গুরুগম্ভীর করবে যেন বিশ্বে কোনও কিছুই সহজ নয়, সবই জটিল-কুটিল। যদি-কিন্তু-কেন-তাহলের চাল-চলোয়ারে নিয়ে পাহারাদার বসে যাবে ! সারা জীবন একজন স্ত্রী/স্বামী নিয়ে ঘর করা যায়, কিন্তু এমন একটি মন নিয়ে ঘর করা যে কি কঠিন তা মানুষ কোন ছার দেবতারাই কি ছাই জানেন ? [এখানে জনান্তিকে বলে রাখা ভাল যে পুরাণ-মহাকাব্যে, ধর্ম-দর্শনে সেই দেবতাদের বিষয়ে যা জানা যায় তাতে তাঁরাও যে নিজ নিজ মন নিয়ে শান্তিতে-সোয়াস্তিতে ঘর করেন তা হলপ করে বলা যায় কি ? তাঁদের মতিভ্রমের খতিয়ান মুনিদের তুলনায় কমতো মনে হয় না !]

সব থেকে মুশকিল হল মনের বহুরূপী স্বভাবটাকে নিয়ে। গাছের বহুরূপীই বলুন আর 'ছিনাথের' কথাই বলুন, তাদের এক অঙ্গে বহু-রূপ মাত্র। আর মনের বেলায় ? প্রথম তো অঙ্গ বলেই মনের কিছু নেই, আছে রূপ। সেই রূপ আবার বয়সের পর্বে পর্বে নানা রূপে ভয়ংকর-রসসারা-ঠিকরোয়। অনেকটাই হিমালয় শীর্ষতলে দাঁড়িয়ে সূর্যের উদয়-রঙ-রূপ পরিবর্তনের মতো। সেটা চোখে দেখার বিষয় বলে মনোহর, কিন্তু মনের উদয়-অস্ত কোথায় ? তাই সে মনোহর নয় মনো-বিকলনের উৎস হয়ে সারাজীবন চোখ-বাঁধা বলদের মতো এই দেহ-সর্বস্ব ঘানিটাকে ঘুরপাক খাওয়াতে থাকে। নিজের মনেরই যখন তল পাওয়া যায় না তখন আর আর সকলের মনের খবর পাবার জো কোথায় ?

একটা সোজা পথ আছে বোধহয়। মন নামের এই যন্তর-মন্তর কে অন্য কোথায়ও পাচার করে দিতে পারলে কেমন হয় ? খেলার মাঠে, চাকরির টেবিলে, স্ত্রীর আঁচলে, স্বামীর কব্জায়, বই-এর পাতায়, সিনেমার পর্দায় ? আর যদি কোথায়ও জায়গা না হয় তাহলে সাদা কাগজের বুকে কলমের ডগা দিয়ে ? কেমন হয় ?

(১) আমির খোঁজে বিপাকে ঃ

নিজেকে জান, তোমার তুমিকে জান—এমনতো একটা কথা বড় ভাষায় বহু জনের কাছেই শুনেছি। শুনেছি শোনার বয়স হতে না হতেই। শুনে আসছি সেই প্রথম বয়স থেকে মাঝ বয়স পর্যন্ত, মধ্য বয়স থেকে বড় বয়স হয়ে বুড়ো বয়স পর্যন্ত। এখন আর শোনার ব্যাপার নেই একেবারে ভাবার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। প্রথম প্রথম মা-বাবা বলেছেন, পাড়াপ্রতিবেশীরা বলেছেন, শিক্ষক শিক্ষিকারা বলেছেন। তার পরে দেখেছি প্রবৃদ্ধ প্রপিতামহ থেকে বর্তমানের আচার্য-গুরু-চিন্তাবিদরা বলেছেন। গল্প-গাথা দর্শনে কাব্যে শাস্ত্র-পুরাণে। শুনেছি, ভেবেছি আর মনে মনে নাড়াচাড়া করে করে নিজের নিজটাকে চিনে নেবার চেষ্টা করেছি। লাভ যে বিশেষ কিছু হয়েছে তা বলতে পারি না। তবে একথা নিঃসন্দেহে বলতে পারি যে জটিলতা সবিশেষ বেড়েছে।

ছোট বেলায় বাড়ির মধ্যে ঘর দেখেছি, গ্রামের মধ্যে মাঠ-ঘাট-পুকুর দেখেছি। প্রান্তরে সবুজকে আর আকাশে নীলকে দেখেছি। এখন একটা জীবন ধরে দেখতে দেখতে ঘরগুলোই যেন চোখে ঠেকে, বাড়ি প্রায়ই আর দেখতে পাই না, মাঠগুলোকে ফালি ফালি জমি, পুকুর-ঘাট-ঘাট গুলোকে ডোবা ডোবা দেখায়, গ্রামের যেন আর হদিস খুঁজে পাই না। সবুজ ক্লোরোফিল হারিয়ে কেমন যেন ধূসর, নীল হারিয়ে আকাশ যেন ঘুটঘুটি অন্ধকার বলে মনে হয়। সব সময় যে এমন হয় তা নয়, তবে মাঝে মাঝেই দেখে শুনে এখন যেন সব কিছুকেই কেমন শূন্য শূন্য মনে হয়। চোখে ছানি পড়ে শুনেছি, মনেও কি ছানি পড়ে? কে জানে!

ছোটবেলায় জামাকাপড় রঙের বাহার দেখেছি, কম্বলে উলের বুনোট দেখেছি, মানুষের মনে স্নেহ-প্রীতি-ভালবাসার আনাগোনা প্রবাহ দেখেছি। এখন বড় বেলায় জেনেছি যে সুতো আর রঙ বাদ দিলে পোশাক 'রাজার পোশাক' হয়ে দাঁড়ায়, উলগুলো না থাকলে কম্বলে আর কোনও সম্বল থাকে না। কিন্তু জানা হয় নি প্রেম-প্রীতি স্নেহ-ভালবাসা মায়া-মমতা বাদ দিলে মানুষের, মানুষের মনের, কি অবশিষ্ট থাকে। এই জানতে গিয়েই আমার বেহাল অবস্থা।

বন্ধুবর প্রীতিতোষ কদিন যাবত আসে নি। নিজের মনের এই বেহাল অবস্থায় তার কথা তাই বারে বারেই মনে হচ্ছিল। তার সংসার আছে তাই দায় দায়িত্বের বোঝা আছে। তার স্ত্রী আছেন তাই তার নিজেকে নিয়ে প্রশ্ন তোলার অবকাশ নেই। আমার এখানে এলেই সে নিজেকে খুঁজতে বসে। সেই প্রীতিতোষই আমাকে খুঁচিয়ে দিয়ে গেছে—নিজেকে জান, তোমার তুমিকে চেন। বলেছে, "তুমি বলতে পার ধূর্জটি এই নিজেটা কে? এই তুমিটা কি?"

ছোটবেলায় হলে বুকে টোকা মেরে উত্তরটা দেখিয়ে দিতে পারতাম। বড়বেলায় মাথায় ঝিম ধরে গেল। মাথার ঢাকনা-খানায় আঙুলের টোকা মেরে মেরে উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিম সব কেমন গোলমাল হয়ে গেল। প্রীতিতোষের প্রশ্ন একবার বাইরে একবার ভিতরে—একবার বাইরের আমিকে একবার ভিতরের আমিকে ঘিরে—মাকুর মতো ছুটে ছুটে বেড়াল। আগু পিছু করতে লাগল। সেই প্রশ্ন মাকুর ছুঁচলো মাথায় কোনো উত্তরের সুতো দেখা দিল না। সেদিন তাই প্রীতিতোষকে বলেছিলাম, "পরে একদিন সময় করে এই আমিটার সন্ধান করা যাবে।" প্রীতিতোষ যে আমার সময়-সন্ধানে সন্তোষ লাভ করে নি তা বুঝে গেলাম তার সংযোজন-প্রশ্নের শরাঘাতে। বলেছিল, "যে

আমিকে খোঁজার কথা সকলে বলেন তার কতটা আসল আর কতটা নকল, কতটা নিজের মুখ আর কতটা মুখোশ সে বিষয়টা অবশ্যই পরিষ্কার হওয়া চাই।"

অনেক ভেবেছি। ভাবনার কূল পাইনি, তবে একটা কিনারা মতো যেন দেখা দিয়েছে। মুখোশ যদি সত্যিই থাকে তাহলে একটা মুখ অন্তত তো চাই। মুখ আছে বলেই মুখোশ সম্ভব। আবার, মুখ যদি একটা থাকে, প্রত্যেকেরই থাকে, তাহলে একটা মানুষকে থাকতে হয়, ব্যক্তিকে সত্যি হতে হয়, একটা মনকে সেই মুখের মাধ্যমে প্রকাশ হতে হয়। তিনটি বিষয়কে পাওয়া গেল—মন, মুখ, মুখোশ। এই মনটি কি? মন সমান সমান ব্যক্তি সমান সমান 'নিজ' বা 'তুমি'। মুখটি কি? প্রকাশের মাধ্যম সমান সমান আচার-আচরণ সমান সমান অপরের চোখে দেখা আমাদের নিজ নিজ স্বভাব-স্বরূপ, প্রকৃতি-বিশিষ্টতা। এ পর্যন্ত বেশ বোঝা গেল। কিন্তু ওই মুখোশ? মুখোশ হল ছদ্মবেশ, ধোঁকা দেবার আবরণ, আমরা যা নই তা বোঝানোর জন্যে, অপরের কাছে প্রতিভাত দেখানোর জন্যে আমরা যা হই সেটাই কি মুখোশ?

এ পর্যন্ত ভাবতে পেরে বেশ ঝরঝরে মনে হচ্ছিল। কিন্তু না, কল্পচোখে পরিষ্কার দেখতে পেলাম প্রৌঢ়োত্তম মিটি মিটি হাসছে। সঙ্গে সঙ্গে মুষড়ে পড়লাম। ত্রুটিটা কোথায় ঘটল তা নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেলাম। বিপদ কি মনে? না, মুখে? নাকি মুখোশে? প্রৌঢ়োত্তমের মুখের হাসিটি যেন অধিকতর ধারালো হয়ে উঠলো। বিপদ কি তাহলে ওদের যে কোনো একটিকে নিয়ে নয়, সকলকে নিয়ে সমগ্রের মধ্যে? বাধ্য হয়ে পুনরায় চিন্তাগুলো করতে হল। আর এই ফিরে দেখতে গিয়েই বিপদটি টের পেলাম।

মনটিকে যতো সোজা মনে করেছিলাম এখন আর ততো সোজা বলে মনে হল না। বস্তুর মতো মন তো কোনো মোটামুটি স্থির-অনিচল-অপরিবর্তনশীল বিষয় নয়। মন চঞ্চল। শুধু চড়াই পাখির মতো একই স্থানে, একই বৃত্তে সে চঞ্চল নয়, সে ঝরনার মতো চঞ্চল, সে নদীর মতো চঞ্চল। শৈশবে কৈশোরে সে চঞ্চল, তরুণ-যুবক বেলায় সে বেগবান-বহমান-অস্থির। প্রৌঢ়ত্বে সে সব চঞ্চলতা আর সকল বেগকে প্রসারের মধ্যে অপেক্ষাকৃত স্থির রাখার চেষ্টা করে। বার্ধক্যে নুয়ে-পড়া পারানির কড়ি-গোনা মনকে নিয়ে, নিস্তেজ পাখা গুটিয়ে, দুই হাঁটুর ফাঁকে থুতনি রেখে, সেই মনই কেমন থেমে থাকে। বিচিত্র বিভিন্ন মনের এই চেহারাগুলো কি চেনা যায়? একই মন প্রথম শৈশব থেকে দ্বিতীয় শৈশবে পৌঁছায়? একই ব্যক্তি এবং একই মানুষ কি সবল সকালে আর অবলা বিকেলে একই থাকে? তা তো থাকে না, সে তো থাকতে পারে না!

মন নিয়ে প্রশ্নের খোঁচায় মুখের চেহারাও তো পাল্টে যেতে বাধ্য। গেলও তাই। একটা যদি আসল মনই না থাকে তাহলে একটা মুখ হবে কেমন করে? মুখ মনকেই প্রকাশ করবে। মন চঞ্চল, তাই মুখে আসে চঞ্চল ছোঁয়া। মন অস্থির তাই মুখ কোন স্থির শিল্প কর্ম নয়। মনের অভিব্যক্তি আছে, পরিবর্তন আছে তাই মুখকেও তাল রেখে রেখে অভিব্যক্ত হতে হয়, পরিবর্তিত হতে হয়। শিশুর মন ঈশ্বরের মতো পবিত্র, সুন্দর। তার মুখ তাই অপার্থিব, দেবদুর্লভ। কারণ মুখ সমান সমান মাধ্যম সমান সমান আচার আচরণ সমান সমান অপরের চোখে দেখা আমাদের নিজ নিজ আমি।

কিন্তু শিশু কোনো আমি নয়, শিশুর মধ্যে ব্যক্তি উপ্ত-সুপ্ত-গুহ্য মাত্র। বীজের অভ্যন্তরে বৃক্ষ, জীবের মধ্যে ব্রহ্ম। শিশু মনে-মুখে এক। কেন এক? শৈশবের কোন মুখোশ নেই, জানে না বলেই

নেই। কেন নেই? কেন লাগে না? উত্তর মনে হয় বেশ সোজা। কেন এক?—না, সেই শিব মনে পার্থিব মুখ শুরু হয় নি যে! মুখোশ নেই কেন?—না, ব্যক্তি হয় নি বলে, মানুষ হয়ে সংসারের যান্ত্রিকতার যাঁতাকলে এখনও পোড় খায় নি বলে। তাহলে কি মুখোশ লাগে সংসারের জন্যে, সমাজের কারণে আর সভ্যতার পতাকা বহন করতে?

একটু থমকিয়ে গেলাম। এ কোথায় এসে পড়লাম? একটা সাদামাঠা প্রশ্ন নিয়ে ভাবতে শুরু করেছিলাম। শিশুদের মিষ্টি মিষ্টি হাসিতে জটিলতার আভাস পেয়েছিলাম। কিন্তু এখন মনে হচ্ছে ব্যাপার অনেকদূর গড়াবে।

(২) মুখোশের ক্রমবিকাশ : (ক) সূতিকাগৃহে —

ভয়ে ভয়ে তরুণ যুবকদের নিয়ে ভাবতে বসলাম। কারণ সরল বিশ্বাসে শিশুকে নাড়াচাড়া করতেই জটিল সব বিষয় মাথা তুলে দাঁড়াল। শরীর-মনের জটিলতম উদাহরণ হল তরুণ যুবক কাল। ভাঙা-গড়ার সময়। সেই ওদের বেলায় মন-মুখ-মুখোশের বিষয়টাকে দেখে নিতে চাইলাম।

ওদের বেলায় দেহভান্ডারের বিভিন্ন জৈব প্রক্রিয়া নালিকা-বিহীন গ্রন্থির রাসায়নিক কারিকুরিতে মনের মধ্যে আনে অসীম গতি, অন্তরের গভীরে তৈরি করে তোলে সাইক্লোনিক ঘূর্ণি আর সেই চঞ্চল-স্পন্দন মনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে দেহের কোষে কোষে কেন্দ্র-কম্পন তুলে আবর্তিত ভবিষ্যতকে নিরাবরণ বর্তমান করে তুলতে থাকে। মন পালটায়, তাই মুখও পালটায়। অন্তরের চেতনায় ঝড়ের আভাস দেখা দেয়, তাই মুখের চেহারায় ঘটে অবয়বের ব্যক্তিত্বের প্রকাশ। উঁকি মারে মনের মধ্যে মন, তার মধ্যে মন। মন মানেই তো ইচ্ছা, বাসনা, কামনা। অতীতের শিশু মন-মুখের ঐশ্বরিক একাত্মতা হারিয়ে যেতে থাকে কিন্তু বেদনা বোধ থাকে না সেই হারানোর মধ্যে, বরং যেন উল্লাসের অট্টহাস আর উচ্ছ্বাসের আনন্দ শরীর-মনে সেতারের ঝংকারে, জলতরঙ্গের সুরলহরীতে, সানাই-এর মীড়-ছন্দ আবেগে প্রবাহিত-প্রকম্পিত হতে হতে উচ্ছ্বসিত অনুধাবন-অনুভাব হয়ে ওঠে।

তরুণ-যৌবনের এই চকিত-চঞ্চল উচ্ছল-উদ্দাম ঝরনা জীবনকে অন্যেরা বোঝে না, বুঝতে চায়না অথবা বুঝেও অবুঝের ভান করে। প্রাক-তরুণ শিশুরা বোঝে না কারণ তাদের বোঝার বয়স হয়নি। উত্তর-যৌবন প্রৌঢ়েরা বোঝে না কারণ তাদের ঘাড়ে জীবনের বোঝা সুতীব্র চাপ সৃষ্টি করে রেখেছে। সংসারের বোঝা, সমাজের চাপ, সভ্যতার দায়ভার আর নিজ নিজ অক্ষমতাসমূহকে পুত্রের সম্ভাব্য কুশীলবদের ঘিরে ভবিষ্যতের আশা-আকাঙ্ক্ষা—এ সবের পাশাপাশি এবং মধ্যে মধ্যে সমাজসংসার আবহসংগীত 'পাছে লোকে কিছু বলে'-র চাপ। বড়রা তাই নিজ নিজ মুখ দেখানোর তাড়নায়—মুখ দেখাবো কেমন করে? — তরুণ-যুবক মনের মনের মধ্যে মনকে রক্তচক্ষু বারণে-তাড়নে আর পৃষ্ঠ-কণ্ঠ স্ফীত-শিরা শাসনে-পেষণে পদে পদে বাধা দিতে থাকে। তাই, যা স্বাভাবিক প্রকাশে সরল পথ ধরে চলতে পারতো তাই অস্বাভাবিক পথে জটিল-কুটিল-বঙ্কিম পথে পথ খুঁজতে লেগে গেল। শৈশবে যা ছিল মনের মুখ, তরুণ-যুবক বেলায় তাই দ্বন্দ্ব বিধায় হয়ে দাঁড়াল বহু মনের বহু-মুখ। যে মুখ মনকে প্রকাশ করতে পারত, সে আর মনের মধ্যের মনকে প্রকাশ করতে পারল না। মনের মধ্যে দ্বন্দ্ব সংগ্রাম তার মুখের চেহারায় বিক্ষুব্ধ আবাহন ঘটাল। কোনটা তার মুখ আর কোনটা মুখোশ তা একদিন আর তার নিজের কাছেই ঠাহর হয় না। কোনটা

তার নিজের মন, আর কোনটা তার মনের মধ্যের মন তা একদিন হারিয়ে যেতে বসে। তাই, মন থেকে মনে, মুখ থেকে মুখোশে আনাগোনা করতে করতে কোনটা আসল তার ঠিকানা খুঁজে পায় না!

এই তরুণ যৌবন সময়ে দেহের ভাঙাগড়ার সঙ্গে সঙ্গে এরা মনের নড়াচড়া টের পায়। নিজেকে চিনতে গিয়ে এরা হিম শিম খায়। পড়ুয়া-মন তরুণ পাড়ায়া-মন তরুণকে চেনে না, অঙ্ক বিজ্ঞান-ইতিহাসে যে-মনকে নিবিষ্ট দেখে তার হদিস পায় না কবিতা-গল্প-উপন্যাস অনুসরণে। ঘরের মধ্যের মন বিদ্যালয়ের-বিশ্ববিদ্যালয়ের সীমানায় নিখোঁজ হয়ে যায়। বন্ধু-সান্নিধ্যে যে মনটি একান্ত বোধে নিকট-নিকট মনে হয় সেই মনটিই, ক্ষণপরেই, অভিভাবক-নৈকট্যে কেমন উদাস-দূরত্বে আহত বোধ করে। নিরস নোট-লেখা আর সরস পত্র-লেখার সময়ে দুই মনের ঠিকানা যেন কলমের ধীর চলনে আর মনের ধাবমান গতিতে মনের অনুভবে লেখা পড়ে যায়। এই বিচিত্র-চলন, বিভিন্ন অনুভব মনকে নিয়ে তাই তরুণ যুবক বয়স দুই চোখে, তোলপাড় হয়ে যায়। কোনটা তার মন, কোনটা তার আসল মুখ আর কখন সে মুখোশের আড়ালে নিজেকে ঢেকে রাখে তা পরিষ্কার বোঝে না, কিন্তু জীবনের পাঠ অবশ্যই প্রথমে গ্রহণ করে নেয়।

যারা লেখাপড়া শেখে না, যাদের উপর অভিভাবকদের নজর ততো কড়া নয়, যাদের আশা-আকাঙ্ক্ষার জগৎ স্বল্পতম সীমার মধ্যে ঘোরপাক খায় তাদের ক্ষেত্রে মনটা যেমন থাকে প্রকৃতিস্থ পথেই সহজে তেমনি তাদের মুখটাও থাকতে পারে সেই ভাবেই সরল। মুখোশ তাদের জীবনে প্রায় প্রয়োজনের তালিকায় পড়ে না। আর একটু পিছনে গেলে, প্রকৃতির আপন গৃহস্থালীর অন্দরমহলে উঁকি দিলে, আমরা তাই মন আর মুখের একাত্মতা দেখতে পাই। ইঁদুর-ছুঁচো-বেড়াল, গরু-হরিণ-ছাগল বাঘ-সিংহ-বরাহ। এদের মুখ আছে মুখোশ নেই। নেই, কারণ এদের মনের বিচিত্র-বিভিন্নতার মধ্যে কোনও বিরোধ-বৈপরীত্য নেই। এই মন অবশ্যই প্রবৃত্তিজ মন—তাই বলা চলে এগুলো মন-ই নয়। এ্যাডজাস্টমেন্ট আছে কমপ্রোমাইজ নেই। এরা নিজেরা অন্য থেকে প্রতিপক্ষকে আক্রমণ করে, কিন্তু মনের ভাবকে মুখে অ-দৃশ্য রাখতে পারে না। ক্যামোফ্লাজ গ্রহণ করে, কিন্তু মন-মুখ এবং শরীরের অবস্থানে একখানা খোলা-পৃষ্ঠা নির্বিরোধ দৃশ্য-সত্য হয়ে প্রকাশ পায়। মনের গভীরে অ-দৃশ্য মনোভাবকে মুখের দৃশ্য-ভাব-রেখায় লুকিয়ে রাখা একটি শিল্পকর্ম। ক্যামোফ্লাজ। সে কেবল মানুষের পক্ষেই সম্ভব। তখনই মুখোশ। নিম্নতম প্রাণী থেকে শুরু করে মানুষ-অস্তিত্বের উষাকাল পর্যন্ত—শৈশব পর্যন্ত—তাই মুখোশের দেখা মেলে না। তরুণ বয়সের উধাও খাওয়ার দিনে এবং যৌবনের মধ্যাহ্ন কালে মুখোশের চাহিদা উৎসারিত হয়ে পুষ্ট হয়ে ওঠে। হাতে খড়ি থেকে স্নাতক পর্যায় পার হয়ে জীবনে প্রবেশ ঘটে—জীবন মানে সংসারে, সমাজে, নানাবিধ কর্মকাণ্ডে। নিজ নিজ যোগ্যতায় এবং কেন্দ্র-কর্ম-বিধি মতে যে যেমন পারে মাস্টার, পি এইচ ডি, ডি. লিট ডিগ্রিধারী হয়ে ওঠে। চাই কি ছোট-বড়ো নানাবিধ প্রতিষ্ঠান-অনুষ্ঠানের কেউকেটা হয়ে হবে এবং হতে হতে উত্তরোত্তর উন্নতির ধাপে ধাপে নক্ষত্র-পর্যায়ের ব্যক্তিত্বে স্থির হতে পারে।

তাই মনে হয়, প্রাইমেটস্ নয়—বানররা নয়—ক্যামেলিয়নরাই—গিরগিটিরাই মানুষের মানসিক পূর্বপুরুষ। ডারউইন সাহেব জীবনের—স্পিসিসের—উৎস এবং উদ্বর্তন-বিবর্তন অনুসন্ধান করেছিলেন। তাঁর প্রধান ঝোঁক ছিল শরীর-সংস্থানের দিকে, জৈব-পরিবর্তন ধারা অনুসরণে। ফ্রয়েড সাহেব পাকা ডুবুরীর মতো মনের গভীরে পাতি পাতি অন্বেষণ চালিয়ে তথ্য ও সত্যের সংগ্রহ

আমাদের উপহার দিয়েছিলেন। সমাজবিজ্ঞান আর নৃবিদ্যা মানব জীবনের ও সমাজের অনেক জটিল কুটিল টানাপোড়েনের উৎস-বিকাশ-বিনাশ বিষয়ে আমাদের অবহিত করেছে। কিন্তু এই কার্নেমিয়ন-প্রকৃতির বিষয়ে যথেষ্ট আলো যে কেন পড়ে নি তা বিস্ময়ের বিষয়।

জিরাফের গলা কেন দীর্ঘ, চিতার গায়ে কেন চিতা-চিহ্ন, বাঘের কেন সেই ডোরা কাটা দাগ এবং এবংবিধ বহু তথ্য আমাদের জানা। ছবি-গ্রাফ-চিত্রচিহ্ন আঁকা বিবরণে আর টেলিভিশনের মনোগ্রাহী দৃশ্য-শব্দ-বর্ণনায় যুগের পর যুগ পার হয়ে কেমন করে আমরা সোজা ঋজু দাঁড়াতে পারা শ্রেষ্ঠ প্রাণীটি হয়ে এখন সোফায় বসে টিভি খুলে বিশ্বকে এক-নীড় করে কাছে পাই, পাচ্ছি, তা আমাদের জানা। কিন্তু কেন যে আমরা আমাদের সর্বজন-আচরণ-সিদ্ধ ইউনিভার্সাল কার্নেমিয়ন স্বভাবের জন্য একবারও সেই আমাদের প্রবুদ্ধ প্রপিতামহ শিম্পাঞ্জি প্রজন্মকে স্মরণ করি না তা অবোধ্য! বানরেরা এখনও আছে, এবং নরকুলও অহিবাক্য হয়ে চলেছে। শিম্পাঞ্জিরা এখনও আছে, এবং নরস্বভাবে মুখোশ-ব্যবহার ক্রমশই বেড়ে বেড়ে সর্বজন স্বীকৃত না হলেও সর্বজন অনুসৃত হয়ে দাঁড়িয়েছে। বানরেরা অনেক পূজায় নিবেদন পায়, কার্নেমিয়নদের বেলায় পিণ্ডদানের ব্যবস্থাও কেন নেই?

ফ্রয়েড সাহেবকে স্মরণ করতে পারতাম। গিল্টি ফিলিং—অপরাধ বোধ? প্রাণিজগতে বেঁচে থাকার সংগ্রাম যন্ত্রণা আছে, আছে মানুষের জগতেও। ওরা বাঁচে রুটিতে, আমাদের বাঁচার মধ্যে রুটির যোগান অনিবার্য হলেও যেন একমাত্রাধিপতিনী হয়ে দাঁড়ায় নি। রুটির বাইরেও আমাদের রুটি-র ব্যাপার আছে—বুদ্ধির, অনুভবের এবং বহুবিধ আদর্শের আর মূল্যবোধের টান বা রুটি। র‍্যাশনাল এনিম্যালের র‍্যাশনাল অংশে, সোশ্যাল এনিম্যালের সোশ্যাল অংশে—এককথায় মানবিক অস্তিত্বের ঔচিত্যের অংশে। এই সব রুটির এলাকায় আর ঔচিত্যের অংশে বাঁচার জন্য অন্যতর নিম্নমানের প্রক্রিয়া-পদ্ধতি প্রয়োগ অনিবার্য হলেই কি এই অপরাধ বোধের জন্ম নেয়? তাই কি এই রিপ্রেশন—অবদমন? অস্বীকার?

(খ) সংস্কারের পরিচিত প্রাঙ্গণে:

বিষয়টিকে শেষের দিক থেকে না দেখে প্রথম দিক থেকে দেখা যাক।

নিজ নিজ মনের মাধুরী মনকে লুকিয়ে রাখতে যে মুখোশ ব্যবহারের হাতে খড়ি, তরুণ যুবক বয়সটা সেই পাঠে রপ্ত হয়ে ওঠে। তাই নিজের কামনা বাসনার অতৃপ্ত এলাকা পার হয়ে যখন সে বাস্তব সংসার-সমাজ জীবনে প্রবেশ করে তখন সেই মুখোশ-মার্কা অধীত বিদ্যার প্রয়োগে ক্রমশই পারঙ্গম হয়ে ওঠে। দু'চারটি নমুনা দৃশ্য দেখে নেওয়া যাক।

ছেলে বা মেয়ের বিয়ে ঠিক হয়ে গেছে। দিন বেশি বাকি নেই। সবই ফাইনাল করে ফেলতে হয়। কর্তামশাই আসন পিঁড়ি হয়ে মেঝেতে বা ডিভানে বসে কলম বাগিয়ে কাগজের বুকে বা পুরনো ডায়েরির পাতায় হুমড়ি খেয়ে আছেন। কলমের ডগা বেয়ে একে একে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধব সেই সাদা কাগজের অর্বাচীন অঙ্গনে লাইন দিয়ে হাজিরা দিচ্ছে। গিন্নী এসে পাশে বসলেন। দু'কাপ চা উপস্থিতিকে উষ্ণতর করে জমা করে তুলবে। —"নকুলমামার নাম লিখেছ?" কর্তামশাই বিস্ফারিত চোখে একবার স্ত্রীকে দেখবেন আর একবার ধূসর মানসপুঁথিতে সর্বশেষ লেখা ক্রমিক সংখ্যায় মনোযোগ দেবেন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যার সঙ্গে ক্যাটারারের বিলের যে ডি. পি.-সম্পর্ক তা কর্তার মাথায় নামতার হাতুড়ি পিটবে, পিটতেই থাকবে। কিন্তু গিন্নীর মনের বায়স্কোপ মিঠে গড়

দশ-পনেরো বছরের ডেবিট ক্রেডিট কল ক্রমশ ভেসে ভেসে উঠবে। কোন অনুষ্ঠানে কে কি উপহার দিয়েছে, কে কোন অনুষ্ঠানে নিমন্ত্রণ করেছে, এই অনুষ্ঠানে কাকে কাকে অবশ্যই বলতে হয়, কাকে কাকে না বললে সম্মান থাকে না—এমনতো ক্রমশ প্রকাশ্যেই লেজার রেফারেন্স একের পর এক ধরাশায়ী তালিকাকে পুষ্ট-স্ফীত করে তুলবে। অন্যদিকে হাড়্‌ডির ঘায়ে অবশ-অনড় আঙুলগুলো কর্তামশাইদের হাতে নিথর থেমে যেতে চাইবে। মনের মাথায় মন মুখের গহ্বরে নিমের স্বাদ ঠেলে দিতে মুখের চেহারার সাহারার শূন্যতাকে হাহাকারে ফুটিয়ে তুলতে চাইবে। কিন্তু মনের সামনের মনটা স্ত্রীর সামনে শিশির ধৌত ফুলের পেলবতায় বার বার প্রকাশিত মুখ 'সে তো ঠিকই, ওকে তো বলতেই হবে, ভাগ্যিস তুমি মনে করিয়ে দিলে'—ইত্যাদির উচ্ছ্বাসে বাঙ্ময়তা, উচ্ছ্বাসে ধ্বনিময় রেখে দেবে।

আর সেই সময়ে যদি ছেলে বা মেয়ে, মতান্তরে জিন-ধারী নং: অথবা সেলোয়ার-ওয়াশ পরিহিতা নাতনী এসে ঘাড় বাঁকিয়ে তালিকার দিকে বারসন্ধি ক্ষেপণ সংখ্যা অনুমান করে ধপাস করে পাশের সোফায় সস্কন্দে অধিষ্ঠিত হয় তাহলেই বিপদ সমাসন্ন। "ওয়েস্টেজ, সাম্মার ওয়েস্টেজ! এতো লোক নিমন্ত্রন করার কোন মানে হয়? একটা চায়ের আসরে যে কাজ হতে পারে সেই অনুষ্ঠানের জন্য এমনতো ভুরিভোজের ব্যবস্থা সামাজিক অপরাধ।" নাতনী ঢাকে কাঠি দেয় তো নাতি সানাইয়ে পোঁ ধরে—"নেহেরুজী বলেছেন না? বলেছেন—সামাজিক অনুষ্ঠান-আপ্যায়নে যে পরিমাণ অর্থের অনাপ্রত্যাকাঙ্খিত অপচয় ঘটছে ভারতে তা অমার্জনীয় অপব্যয়!"

শুরু হয়ে যায় এক এক মনের আশা আকাঙ্ক্ষার দ্বন্দ্ব-সংঘর্ষ, এক মনের সঙ্গে অন্য মনের মিল-অমিলের বোঝাবুঝি বোঝাবুঝি। ছেলে-মেয়ের বিয়েতে—একবার বইতো নয়!—আড়ম্বরের বাসনা, প্রতিবেশী-পরিজনদের কাছে নিজেকে, নিজেদের, প্রকাশ করার আকাঙ্ক্ষা, সদাশয়পিত আত্মীয়দের চোখে লোকবল, অর্থবল এবং গোষ্ঠীবলের রূপরেখা এঁকে দেওয়ার ইচ্ছা। আর পাশাপাশি মনের গভীরে পি. এফ্-এর দরিদ্রতর অবস্থা, আগামী দিনের দুঃসহ চাপ, দ্বিতীয় মেয়ের বিয়ের দুশ্চিন্তা এবং ইত্যাদি। গভীর মনের নিজেকে জানলেও তাকে নিস্তব্ধ নির্বাসনে রেখে কর্তামশাই সামাজিক মনের নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত হয়ে পড়ুন। একই ব্যাপার ঘটে গিন্নীর বেলায়, সকলের ক্ষেত্রেই।

যদি সন্দেহ থাকে তাহলে অনুষ্ঠান শেষে একবার কর্তা গিন্নীর একান্ত কথোপকথনে কান দিন। নিমন্ত্রিতের সংখ্যা থেকে যদি আগতজনের সংখ্যা বেশ কম হয় তাহলে উদ্বৃত্ত এবং অপচয়, যদি বিপরীত হয় তাহলে অসময়ে টানাটানি। উভয় ক্ষেত্রেই মনের বিস্ফোরক প্রকাশে অনাগতদের অথবা 'অনাকাঙ্ক্ষিত' আগতদের ঘাড়ে সব দোষ চাপানো হয়ে থাকে। অনুমানের সঙ্গে বাস্তবের অমিলের দায় অপরের ঘাড়ে ফেলে আমরা অনেকেই হঠাৎ হঠাৎ সেই নিস্তব্ধ নির্বাসনে রাখা মনের অস্তিত্বের টের পেতে থাকি। মুখোশ ছিঁড়ে ছিঁড়ে যায়, ফোঁড়া-ফুঁকে মুখ বেরিয়ে আসতে চায়।

আর একটা উদাহরণ নিন। স্বামী স্ত্রীর প্রথম সন্তান। অন্নপ্রাশন। নিমন্ত্রিতের তালিকা তৈরি হচ্ছে। সম্পর্ক আর ঘনিষ্ঠতার নিকষ নয়, কে কি দেবে এই প্রশ্নে তালিকার অন্তর্গতি ঘটেছে। নিতান্ত না বললে নয় এমন কিছু স্বজন-পরিজন থেকে যাচ্ছে সেই তালিকায়। কয়েকের মুখে আনন্দের উচ্ছ্বাস নেই তিক্ত স্বাদ আছে কারণ তারা কিছুই সবিশেষ দিতে পারবে না।

লোকসান। এ ছাড়া ছেলের কাছে শ্বশুর বাড়ির আত্মীয় স্বজনরা সকলে তেমন পরিচিত হয়ে ওঠে নি বলে—কে কেমন দিতে থুতে পারে বা দেবে থোবে—তাদের এক একজনকে নিয়ে যৌথ মূল্যায়ন চলবে ক্রমান্বয়ে। এসবই চলবে মনের মধ্যের মনকে নিয়ে নাড়াচাড়ার সময়। একক ভাবে এবং যৌথ ভাবে, যদি একই ওয়েভ লেংথ-এর হয় দুজনাই!

অনুষ্ঠান দিনে যথেষ্ট সেজেগুজে নিজ নিজ মুখগুলোকে মুখোশ বানিয়ে ঠোঁট এবং দাঁতগুলো ভিন্ন ভিন্ন হাসিতে, কত কত প্রীতিসম্ভাষণে এবং উজ্জ্বল উপস্থিতিতে সামাজিক মনকে ঝরনার মতো বইয়ে দিয়ে যেতে হবে। ভিতরের মনকে কুলুপ এঁটে নির্জলা উপবাসে একেবারে সরিয়ে রাখবে। সব মিটে গেলে স্বামী স্ত্রী বসবে ট্রায়াল ব্যালান্স কষতে—ট্রেডিং অ্যাকাউন্ট, প্রফিট এন্ড-লস্-এর হিসেব প্রথম সুযোগেই মনের কলমে স্তর স্তর প্রকাশ পেয়ে যাবে? প্রফিটের পূর্বপরিকল্পিত অঙ্ক সঠিক বলে মনে হলেই স্মিত মুখে ডিনারে বসবে। অন্যথা বিরস বদনে আত্মীয় স্বজনদের কঞ্জুস প্রকৃতির প্রতি অবিরাম কটাক্ষ চলবে। রাতের ঘুম বিলম্বিত হবে। 'আর অন্নপ্রাশন নয়' বলে দৃঢ় সিদ্ধান্ত মনে মনে ঘোষণা করে হয়তো বা ফ্রয়েডীয় চিন্তাপদ্ধতির মতবাদকে স্বপ্ন সত্য বলে প্রতিষ্ঠা দেবে!

আর যারা নিমন্ত্রিত? রান্না-বান্না পরিবেশন-ব্যবস্থাপনা বিষয়ে কর্তাব্যক্তি, অথবা স্বামী-স্ত্রী, বার বার খোঁজ খবর নেবে, জনে জনে। তারা বলবে 'অপূর্ব হয়েছে, সব সুন্দর' ইত্যাদি। কিন্তু বিদায় পর্বের পরে, গৃহ প্রত্যাবর্তনের পথে সমালোচনা আর বাক্যক্ষেপ চলবে। সব কিছুর, সমস্ত বিষয় ব্যাপারেরই। ত্রুটি বিচ্যুতির পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার-বিশ্লেষণ, ফিসফিস-ফিসফাস, কানা-কানি হয়ে উপস্থাপিত হবে। একটা মন সামনের, সামাজিক স্তরের সভ্যতার দায়ভার বহন করে। মুখোশ নয়? অন্যটা?

নববধূ? পতিগৃহে প্রথম দেখা টানটান স্মিত হাসিমুখে শাড়ি? দুধে আলতায় গৃহ প্রবেশের ক্ষণ থেকে অষ্টমঙ্গলা পর্যন্ত দিনগুলো, কোন কোন ক্ষেত্রে আরও প্রলম্বিত সপ্তাহান্ত-মাসান্ত দিনগুলো পার হলেই সেসব মুখের অভ্যন্তরে যে দন্তপংক্তি দেখা দেয়, নেলপালিশ করা 'কিওট নেইলস' গুলো আসলে নখদন্তের ইতিহাসবহ তা প্রকাশ হয়ে পড়ে। মটকা শাড়ি ছেড়ে আটপৌরে শাড়িটি বেরিয়ে আসে অচিরেই, হাতে থাকে না বরণডালা-প্রদীপ ধান-দূর্বা, মুখ চোখে ফুটে ওঠে নিরাবরণ নিষেধের আর বিরক্তির ঝালাপালা। কোনটা মুখ আর কোনটা মুখোশ? প্রবৃত্তির অস্বীকারেই নাকি আমাদের সভ্যতার সৃষ্টি। প্রবৃত্তির? না, সত্যের, সত্যানুসরের? প্রকৃত মনোভাবকে গোপন করার মধ্যেই, সত্য মনটিকে অপ্রকাশ রেখে আপাত-মনকে সামনে তুলে ধরার মধ্যেই কি সভ্যতা নয়? যতো মুখোশ, যতো বেশি বেশি মুখোশের ব্যবহার ততো বেশি সভ্য, বেশি বেশি সফল-সার্থক? সভ্যতা পরিশীলিত বহিরাবরণ আমিত্বের মধ্যে গুহাবাসী কুণ্ডলী পাকানো একটা আমি সদাসর্বদাই ঘাপটি মেরে বসে থাকে। একটু অহং-এ খোঁচা লাগলেই সে ফোঁস করে সহস্র-ফণা মাথা তুলে জানান দেয়। মুখোশ খান খান হয়ে ভেঙে ছড়িয়ে পড়ে, হারিয়ে যায়। তখনই ভিতরের আমিটি নখ দন্ত, কণ্ঠ-ধ্বনিতে আর কথনের ঢঙে ঢঙে নিজেকে প্রকাশ করে ফেলে। এটাই কি সত্য নয়?

সংসারের বিভিন্ন সম্পর্ককে ব্যবচ্ছেদ-প্রত্যবেক্ষণ করে দেখুন, স্বার্থের ছুরি দিয়ে আবরণকে

অপারেশন করে দেখুন অথবা সন্না—টুইজার দিয়ে একটু গভীরে খুঁটে দেখুন। দেখবেন মুখোশের আস্তরণটি কতোই পাতলা ঠেকবে, ভিতরের আমিটি কতো পুষ্ট, সেই আমির মধ্যে অনেক আমি একে একে উঁকি দেবে, প্রকাশ হয়ে পড়বে। মা-বাবা, ছেলে-মেয়ে, স্বামী-স্ত্রী, ভাই-বোন, জামাতা-শ্যালক, মামা-ভাগ্নে, দেবর-ভাসুর, শ্বশুর-শাশুড়ি এবং ইত্যাদি। সর্বত্রই সম্পর্কের সত্তা সমষ্টির অভ্যন্তরে স্বার্থের মৌচাক। সেই মৌচাকে শত-সহস্র কামনা-বাসনা আশা-প্রত্যাশা অপেক্ষা-প্রতীক্ষারা গুন গুন করে গভীর মনের মনের মধ্যে মনের ঘরে মধু আহরণে সদাই তৎপর। একটু খোঁচা লাগলেই মুখোশের ঔজ্জ্বল্য ঝরে গিয়ে হুলের আক্রমণ ঘটবে, গুন গুন গানের ধ্বনি-মধুরতা থেকে কেমন অবলীলায় জন্ম নেবে শব্দ-বাক্য-কণ্ঠ বাদন। অপরকে তো চেনার প্রশ্নই ওঠে না, তখন দেখবেন নিজেকেই চিনতে পারছেন না। নো দাইসেল্ফ—নিজেকে জান—বললেই কি আর নিজেকে জানা যায়? মনে হবে এই আহ্বানটা অনন্তের আহ্বান, অসম্ভবের অন্বেষণে অসীম যাত্রা।

(গ) সমাজের আঙিনায় :

সংসার ছেড়ে সমাজে মনচারণা করুন। সকাল বিকেল যে প্রতিবেশীর সঙ্গে দৃষ্টি-বাক্য বিনিময় হয় সেই প্রতিবেশী আপনার বিষয়ে কি কি ভাবছে, কোন কোন বিষয়ে পরিকল্পনা আঁটছে তার বিন্দুবিসর্গও আপনার অজ্ঞাত : জমির সীমানা আছে, ছেলেমেয়েদের আকর্ষণ বিকর্ষণ আছে, স্থানীয় অনুষ্ঠান প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতার দখলের ব্যাপার স্যাপার আছে, বিদ্যা-অর্থ-চাকরির স্থানমাহাত্ম্য আছে—কি নেই বলুন! দু-দশ মিনিট অবরে সবরে আলাপচারি করবেন দেখবেন সভ্যতার সমসাময়িক দ্রব্য উপাদানে সময় কেমন মসৃণ কেটে যাবে। আপনার নিজের গুহামুখ খুলবে না একবারও। আপনার প্রতিবেশীরও না। একটু সময় বেশি দিন দেখবেন সেই গুহামুখ কেমন ধীরে ধীরে খুলে দিয়ে পরনিন্দা পরচর্চার ছিদ্রমুখ হয়ে চুঁইয়ে চুঁইয়ে বেরিয়ে আসছে। সময় একটু বেশি পেলে সেই ছিদ্রমুখই গোমুখ হয়ে দেখা দেবে! আপনারা কেউই পরনিন্দা পরচর্চা পছন্দ করেন না কিন্তু তথ্য ও সত্য বিষয়ে দেখবেন আপনাদের উভয়েরই কতো অদম্য আগ্রহ ফুটে বেরুবে। এই সব সংগৃহীত তথ্য ও সত্য অবলীলায় অন্য প্রতিবেশীর কর্ণপথে মস্তিষ্কের কোষে কোষে প্রবাহিত তর্পিত করে দেবেন প্রতিবেশীর প্রতি সামাজিক দায়বদ্ধতার কথা স্মরণ করেই। অবশ্য গোপনীয়তার বিষয়ে সুনিশ্চিত হয়েই এটা করবেন। আপনিও করবেন, তিনিও করবেন। পরিশীলিত মুখোশ-মনের সঙ্গে গুহাবাসী মনের এখানেই তফাত।

ছেলের বিয়ে দেবেন, অথবা মেয়ের। ভাবী বেয়াই বাড়িতে টান টান পারিপাট্য আপনাকে স্বাগত জানাবে। ছোট ছোট কথায় হার্দ্য আবাহন, স্মিত হাসিতে আন্তরিকতার শিশির সিক্ত, ঘনিষ্ঠ আন্তরিকতায় প্রীতিব্যঞ্জন যেন ধূপের গন্ধের মতো আপনার চারদিকে ম' ম' করবে। শিষ্টাচার, কৃষ্টির ছোঁয়া, শিক্ষার বিচ্ছুরণ, রুচির উজ্জ্বল উপস্থিতি—সব মিলিয়ে আপনার মনে হবে 'আহা! এই তো পরিবার, এই তো এতোদিন খুঁজছি।' মুখের সন্ধান পাবেন না, মুখোশেই মজে যাবেন। একবারও ভাববেন না যে বছরের বিশেষ একটা দিন বছরের সব দিন নয়। এক টুকরো মন সব মনটার সহস্রাংশও নয়। মোহিত হয়ে বিমোহিত হবেন। মুখোশে মুখোশে শুভ পরিণয় হয়ে যাবে? ছেলের বা মেয়ের মা-বাবা কাকা-জ্যাঠা আপনাকে ভি আই পি বানিয়ে একের পর এক প্রশংসার ললিত মধুর বাণী শোনাবেন। আপনার মানসিক প্রতিরোধ নিম্নতম মাত্রায় স্থির স্থির বইতে থাকবে, যৌক্তিক সচেতনতা এনেসথেসাইজড হয়ে যাবে। ওঁরা আপনাকে ধোঁকা দেবে।

আপনি বুঁদ হয়ে নেশাচ্ছন্নের মতো সেই প্রশস্তির প্রবাহে ভেসে যাবেন। শিল্পী যেমন তুলির টানে টানে ছবির গড়ন-গঠনকে স্তরের পর স্তর চাপিয়ে মনোহর করে তোলে, তেমনি ওঁরা উপাখ্যানের পর উপাখ্যান উদ্ধৃত করে, অনেকজোটের পর অনেকজোট স্মরণ করে সেই ছেলের বা মেয়ের এমন একখানা রূপে কার্তিক গুণে সব্যসাচী অথবা স্বভাবে লক্ষ্মী প্রকৃতিতে সরস্বতী দাঁড় করিয়ে ফেলবেন যে আপনি ভক্তের দেবদর্শনের মতো সত্যস্বরূপ দর্শনে অনন্যোপায় বোধ করবেন! আপনি নিজের মুখোশটি পরিপাটি উজ্জ্বল রাখতে ব্যস্ত থাকবেন। মনের মধ্যে যদিও দু'চারটি প্রশ্ন তখনও বেঁচে থাকে তা হলেও সভ্যতা-ভব্যতার নির্দেশে সে সবের গলা টিপে ধরবেন। ওঁদেরও সেই একই অবস্থা হবে। মুখোশের অমলিন থাকাটা সভ্যতার দাবি।

ঘরে ফিরে এসে সবিস্তার বর্ণনা দিতে গিয়ে টের পাবেন কেমন করে ধোঁকা দিয়ে আপনাকে বোকা বানানো হয়েছে। আপনার যা জানার ছিল তা জানা হয় নি, যা যা জানানোর ছিল তা সব বাদ চলে গেছে। ওদের যা বলার ছিল তা সব সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেছে। গল্প উপাখ্যানের ঘাত প্রতিঘাতে যে পরিমাণ আবেগ চারদিকে অবিরত ছিটকে ছিটকে বিন্দু বিন্দু উচ্ছলতা ছড়িয়েছে সে পরিমাণ তথ্য ছেলে বা মেয়ে সম্পর্কে উদ্ঘাটিত হতে সুযোগ পায় নি! ছেলে কেমন দেখতে বা মেয়ে? চোখ মুখ কেমন? কি পরে ছিল? কথা বলে কেমন? বুদ্ধি-বিবেচনা? চাকরির বর্তমান ভবিষ্যৎ? —মন-মগজকে আঁতিপাঁতি খুঁজেও দেখবেন তাতে বিষয়ের তালিকা প্রায় শূন্য! অপ্রয়োজনীয় অজস্র বিষয়ের বোঝা বয়ে বাড়ি ফিরেছেন? কেন? কারণ সেই এক—মুখোশটি টান টান ধরে রাখতে মুখটি কেউই দেখাতে দেখতে সময় পান নি।

এবারে দ্বিতীয় চাড়া খেয়ে অথবা বাবার কাছে বাস্তব বুদ্ধি ধার করে মুখোশ ছেড়ে মুখ নিয়ে আসরে নামতে বাধ্য। অতিসন্তর্পণে, গোপনে তথ্য সংগ্রহ: অফিসের বারান্দায়, পাড়ার চায়ের দোকানে, পরিচিত-স্বল্প-পরিচিত বন্ধু বান্ধব এবং তস্য বন্ধু বান্ধবের সাহায্য এবং টহলদারি করে করে একটি পূর্ণ চিত্র বানাতে লেগে যাবেন। এও বাধ্য সত্য, যা অন্তরের সত্য তা সেই মন-মুখ-মুখোশের দ্বন্দ্ব-প্রতিঘাত, টানাপোড়েন। মনের মধ্যে মন, তার মধ্যে মন। বিন্দু বিন্দু শিকড় চালাচ্ছে, মনের বিন্দু বিন্দু চেতনায়, কামনা বাসনার প্রতিফলন এক এক রকম। স্থির বলে কিছু নেই। জলতরঙ্গবৎ, ক্ষণিক-অস্থির, চঞ্চল পরিবর্তন। এ সবের মধ্যেও যদি ছেলের মা-বাবা, তাহলে অবচেতনের কোনও এক দালানে অথবা কুঠরির মধ্যে অথবা কোনও খোপে কোন ঘাপটি মেরে বসে থাকবে বরপণ-বরণমালা এবং টিভি-ফ্রিজ-কারের আকাঙ্ক্ষা। মনের মধ্যের সেই আকাঙ্ক্ষার আবর্তে অনেকেই ইদানিং মুখে আনেন না, কঠিন মুখোশের আড়ালে মানস সমাধি দিয়ে ফেলেন। যুগ যুগ সঞ্চিত ইচ্ছার ধ্বনি অবচেতনে তোলপাড় ঘটায়, কখনও মাকে কখনও বাবাকে কখনও বা আত্ম-মিত্র-স্বজনদের। বোধ বুদ্ধি বড় বালাই। মনের মধ্যের মনের জন্যে বালাই। সভ্যতার মুখোশের জন্যে অনিবার্য। তাই দেখবেন সেই সমাধিস্থ মন শক্তির রূপান্তরের নীতিতে খাট-পালঙ্কে সানমাইকা, টিভিতে কাজের আর যত্নের জন্যে মারুতি-বাজাজে একমনা হয়ে স্থির হয়ে আছে। 'কিছুই চাই না' যে কতো বড়ো মুখোশ তা বিয়ের দিন এবং তার পরে টের পাবেন! অবিশ্বাসকে ঠিক সেই ইতিহাস মনকে ছেড়ে সমাজে, মুখোশকে ছিঁড়ে আইন শৃঙ্খলার এলাকায় আছড়িয়ে পড়বে।

যদি মেয়ের মা-বাবা অথবা কাকা জ্যাঠা, তাহলে সাজসজ্জা, গয়নাগাটি লেনদেনের আবরণে

আসরে সর্বাধিক উজ্জ্বল—মুখোশ। অন্যদিকে মহানায় ছিটিয়ের অভ্যন্তরে মিলিটর মুখ ঢাকা পড়ে যাবে। বা বাঁচানো যায়! সঙ্গে জুড়ে দেওয়া হবে উপাখ্যানের জাদু-মুখোশ। আবার মুখোশের পারে সম্ভাব্য আঁটকুটি বাঁচাতে অন্যপক্ষ নিজেদের হজম শক্তির অনুশীলন করে চলবে।

বন্ধু ছেড়ে বাস্তবে আসুন। বেনারসীর মোড়কে যিনি পাচার হলেন তাকে কি কেউই চেনে? তিনি নিজে কি নিজেকে চেনেন? আর যিনি চাদরে বেঁধে ঘরে তুললেন তিনি? যাঁরা আবাহনে শাঁখ বাজালেন, বরণ করতে ডালা সাজালেন আর জলে জনে মন্দ আমড়া সুশীলার গুণগানে মুখর হলেন তারা? ছ'মাস-এক বছর পরে খোঁজ নিয়ে দেখেছেন? যদি না নিয়ে থাকেন তাহলে কাগজে দেখবেন—দু'নম্বর পাচার—ডিভোর্স, নামমাত্র বিবাহ, তিনদিন অথবা মাসাধিক ইত্যাদি! সেই সব বিয়েতে পাত্রপক্ষ-কন্যাপক্ষ ছিলেন না? গোড়ের মালা কেনা হয় নি? কন্যাদান? হলুদ-বাটা? সানাইয়ের রেকর্ড? উলুধ্বনি? এবং ফুলসাজে সজ্জিত মারুতি এ্যামবাসেডর? তাহলে!

এই তাহলের উত্তরেই ভেসে উঠবে মন-মুখ-মুখোশের জটাজাল। তরুণ যুবক বেলার কথা আগেই বলেছি। উত্তপ্ত দেহে বাষ্পাকুল মনে জীবন রসায়নের অনুপম কারিকুরিতে রাঙা-রসে-বর্ণসম্ভারে মুখোশের ব্যবহার শিখে ফেলেছি, রপ্ত করে ব্যবহারে পারঙ্গম হয়েও উঠেছি। লেখাপড়া শিখতে শিখতে আর না শিখতে শিখতে বয়স বাড়িয়েছি, বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে স্বাধীনতা ভোগ করতে নব নব পন্থার অনুসরণ করেছি। এই স্বাধীনতা পারিবারিক গণ্ডি ছাড়িয়ে সামাজিক হয়েছে এবং সামাজিক খাঁচা পার হয়ে যুক্তি-বুদ্ধি-তর্কের ক্ষুরধারে প্রয়োগে আবার ব্যক্তি কেন্দ্রিক করে খুঁজে পেয়েছি। স্কুল কলেজের শতছিদ্র শাসনের অরক্ষিত বেড়াজালের ফাঁকে ফোকরে মন-মাথা-দেহ গলিয়ে গলিয়ে গাছের এবং তলার কুড়ানোতে অভ্যস্ত হয়ে গেছি। দিনকালের সহজ-সভ্যতার নাগাল ধরতে পেরেছি। সোসাইটি এখন পারমিসিভ, শক্ত-নরম-পাঁঠা মাথানতরা দিনান্ত নিশান্ত তথ্য পরিবেশন করে চলেছে। দেখে-শুনে-পড়ে-টেড়ে সম্যক সন্ধান জানা হয়ে গেছে। সবই হয়ে গেছে, ব্যক্তিগত ভাবে আধুনিক রাস্তাপথে সহস্র পা এগিয়ে গেছে। কিন্তু সেই সঙ্গে তার রেখে পারিবারিক প্রথা-প্রকরণ, বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আচার-আচরণ, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান যেখানে ছিল সেখানেই প্রায় অনড় দাঁড়িয়ে আছে। সমাজের বেলাতেও তাই। টিচিং দি কেক এণ্ড ঈনসো হ্যাভিং ব্যাপারটা—গাছের আকর্ষণ এবং তলার সংগ্রহের প্রতি আগ্রহ—সমান সতেজ থেকে গেল, থেকে যাচ্ছে। কারণ পুরোনো পথে অর্জন পাওয়ার সুযোগ থাকছে। বস্তুগত এবং মানসিক। নোতুন জীবন শুরু করার সময়ে পুষ্ট ব্যাঙ্ক একাউন্ট, সামাজিক সংগ্রহ এবং পারিবারিক সুরক্ষা। অন্যদিকে সেই পুরোনো ব্যবস্থার সেতুরূপ হিসেবে যে সব দায়-দায়িত্ব ঘাড়ে চাপে তা শিক্ষিত আধুনিক ব্যক্তি জীবনের পক্ষে গ্রহণযোগ্য নয়। স্বাধীনতা হীনতায় কে বাঁচিতে চায়?

সুতরাং? ক'দিন বৈ তো নয়, একটু চেপে চুপে কটা দিন ডুব মেরে কোনক্রমে পার করে দাও। সেই মনটা দেখাও আর মুখটা প্রকাশ কর যা সকলে দেখতে চায়। অর্থাৎ একখানা পরিশীলিত পরিমার্জিত মুখোশ টান টান ধরে রাখ। তার পরেই সময় মতো তোরা কাটা, ছিঁড়া চিহ্ন মুখখানা প্রকাশ করতে পারবে। কোথাও বা ঘুন পোকার মতো ধীরে ধীরে শতছিদ্র জর্জর করে তোল, কখনও বা অধীর অনুশাসনে শতছিন্ন করে বেরিয়ে আস। ছেলে মেয়ের কাণ্ডকারখানা দেখে আপনি হকচকিয়ে যাবেন। একবারও কিছু ভাববেন না গোলমালটার কোথায় শুরু আর কোথায়ই বা শেষ। ভেদের বশ পক্ষ নেবেন। মন-অবক্ষয়ের আর ম্যান-অবক্ষয়ের অনিবার্য প্রভাবে

সত্য যদি কেউ কমরপতি/পুত্রপতি হবেন। জানবে ধুন্ধুমার, পড়বে জল অনেকদূর। নিজের মুখের আর মুখোশের সংঘাতে জর্জরিত হয়ে কপালে করাঘাতই হবে একমাত্র প্রাপ্য।

একদিন অবসর তো নেবেন। তখন দেখবেন সন্তান সন্ততিদের, আত্মীয় স্বজনদের বহুবার দেখা মুখোশগুলোর কোনটাই শেষ-সম্বল মুখোশ ছিল না। যার যারই যে মুখটাকে মুখ বলে মনে হয়েছে, অনুমান করেছেন, সেটা আসলে সঠিক মুখ ছিল না। প্রত্যেকেরই একাধিক মুখ স্বরূপ জানবে, একাধিক মুখোশ। কারো বা দুজন দুজন, কারো শতাধিক। কিন্তু এই অবসরপ্রাপ্ত জীবনে তাদের মুখোশে আর কোনো কারিকুরি-কারচুপি থাকবে না। খড় বেরিয়ে পড়বে, আবরণহীন চটাউঠা-ভিতটা দেখবেন কেমন ভাবে ভাব করে ভেংচিয়ে আছে। কারণ আপনি তখন ক্রমশই শক্তিহীন অক্ষমতার ঢালু পথে পিছনে পিছাতে থাকেন। ওরা সকলেই তা বেশ জেনে গেছে।

আবার, আপনার দিক থেকে আপনি যেমন ওদের দেখছেন এক একজন পরিবার-সমাজ স্টেজে জো নাট্যের কুশীলব, ওরাও কিন্তু আপনাকে দেখবে সেই স্টেজেরই অপসৃয়মান অভিনেতা হিসেবে। নিজের মুখও যেমন নিজে দেখা যায় না, নিজের মুখোশটাও তো তেমনি সারা জীবন অদৃশ্যই থেকে যায়। ছেলেরা যখন অবাক হয়ে ভাবে আপনার পেটে পেটে এতোও ছিল, অথবা মেয়েরা—তখন তারা আপনার কোন্ মুখটা নিয়ে ভাবতে বসে? স্ত্রী যখন দেয়ালে মাথা ঠুকে ঠুকে অনুশোচনা করেন—সারা জীবন ধরে ঘর করে লোকটাকে এক বিন্দুও চিনতে পারলাম না! - তখন তিনি কিসের ঘোষণা করেন? মেয়ে কাঁদে: বাবা আমাকে পথে ভাসিয়ে দিলেন—তখন? স্বজন-পরিজন পাড়া-প্রতিবেশীরা যখন বলে 'বাহাত্তুরে বুড়ো' অথবা 'ভীমরতি ধরেছে' তখন আপনার কোন নিষ্ঠা—আনিষ্টা—আক্রোশ হয়? সেই কামনা বাসনা, সেই আশা-আকাঙ্ক্ষার পূরণ-অপূরণ নয়? মনের মধ্যে মন, সেই সব মনের কোণে-কোঠায় জমে থাকা চাওয়া-পাওয়ার টানাপোড়েনে আপনি ওদের মনে ছবি আঁকবেন। আপনার মুখ-মুখোশের সন্ধান পাবেন না ওদের বলা মুখ-মুখোশে। ঠিক তেমনি ওদের মুখ-মুখোশ বলে আপনি যা সারাজীবন ভেবে এলেন সেখানেও কি অন্যথার স্থান আছে? সব থেকে যারা কাছের, সারাজীবন যাদের সঙ্গে সঙ্গে থাকলাম, যাদের সবটুকু না হলেও অনেকখানি জানি বলে বিশ্বাস করে এলাম, সেই তাদের কতটুকু আমরা চিনি? জানি? বুঝি? হঠাৎ হঠাৎ অবাক হয়ে যাই আচরণ-ব্যবহারে, বিস্ময়ের ঘোর কাটে না, চমকিত হয়ে অতীত হাতড়াই! কেন এমন হয়? এমন হয় কারণ আমরা কেউই কারো মুখ দেখিনা, দেখতে সুযোগ পাই না। একের পর এক মুখোশকে দেখি আর তাকেই মুখ বলে মনে করি। পেঁয়াজের খোসকেই পেঁয়াজ বলে মনে করি। আমরা প্রত্যেকেই এক একটি মুখোশের গ্রন্থন, খোসার পরস্পর সংযোজন। সেখানেই পেঁয়াজ, সেই মুখোশের গ্রন্থনেই আমাদের আমিত্বগুলো সংযোজিত। টিককা-ফাককা খেলা। ক্ষণিকবাদ, [illegible], এই নেই-এই এর মধ্যে এক একটি চলমান অস্তিত্বের স্থিতি!

(৩) সমাজ-সংসার-সভ্যতার অবদান :

জীবনের রঙ্গমঞ্চে প্রত্যেকেই হাজির হই নিজ নিজ শরীরে-পোশাকে। পর্বে-পর্বে অঙ্কে-অঙ্কে সেই বহিরাবরণ বার বার পাল্টাই, সংসারের-সমাজের-সভ্যতার নির্দেশ-নির্দেশে কতোবারই তো কতো রকমের চিকন-মোটা উজ্জ্বল-বিষণ্ণ সাবেক-সাদামাটা পোশাকে—চেহারায় সেই মঞ্চে ঘোরাফেরা করি। তার পর একদিন জীর্ণ বস্ত্রের মতো সব ফেলে রেখে চলে যাই। কিন্তু কে আসে? কেই বা চলে যায়! সে থেকে যায় ঠিকানাহীন, আর যায় ঠিকানায় ঠিক সারাটা জীবন

নোঙর করে কাটাই তাকেই বলি জীর্ণ বস্ত্র! আসল রইল অজানা অচেনা, ঘর করলাম কিশেকে নিয়ে? তাহলে মুখোশের বাইরে, মধ্যে, যে ছিল মুখ সে তো কেবলই মিছে! অথবা এতোই সত্য যে জীবনের দৃষ্টিতে তা কোনদিনই ধরা পড়ে না। দার্শনিক 'নাইৎসনক্', ফিলজফিক্যাল প্রিসাপোজিশন। এতোই সূক্ষ্ম যে আছে কি নেই তাই বোঝা ভার।

দর্শনের উচ্চমার্গ থেকে দৈনন্দিন বাস্তবের ধুলোমাটিতে নেমে আসা যাক। বাস্তবের কঠিন জমিতে। এখানে বস্ত্র জীর্ণ হলে দোকানে দৌড়োতে হয়। সংসারের অমোঘ নিয়ম। এখানে যে আসে সে অনেক উৎকণ্ঠা অনেক অপেক্ষাকে একাগ্র করেই আসে। তাকে না চিনে উপায় থাকে না, প্রতিনিয়ত সে তার থাকাটাকে কঠিন কঠোর প্রক্রিয়া পদ্ধতিতেই জাগ্রত বাস্তব করে রাখে। আবার যে যায় সেও যাবার সময় অনেক উৎকণ্ঠা, অনেক চোখের জল অনেক কষ্ট-যন্ত্রণার ইতি টেনে চলে যায়। সে তার চলে যাওয়াটাকেও অনেক কঠিন কঠোর প্রক্রিয়া পদ্ধতিতেই জাগ্রত বাস্তব করেই চলে যায়। কিন্তু, আগেই দেখেছি, এই আসার শৈশব দিনে আর যাবার দ্বিতীয় শৈশব শেষে মুখোশ থাকে না। মুখোশের উদ্বোধন, অনুবর্তন, চর্চা ও প্রয়োগ ঘটতে থাকে মধ্য পর্বে। মুখোশ তাই সংসারের, সমাজের, সভ্যতার অবদান। সেই সংসার সমাজ সভ্যতার আরও কথা বলার আগে কিছু অন্য কথা বলে নিতে হয়। বিশ্বপ্রকৃতির কথা, নর-নারীর প্রকৃতির কথা। আগেই দেখেছি প্রকৃতিতে মন নেই বলে মুখ নেই, মুখ নেই বলে মুখোশের দাক্ষিণ্য নেই। মন নেই, মানে আমরা যাকে মন বলি সেই মন নেই। আছে প্রকৃতিস্থ মন, প্রবৃত্তিজাত মন। তাই সেই প্রকৃতির আপন সংসারে স্ত্রী ও পুরুষের মধ্যে পুরুষকে বেছে নিয়ে সুন্দরের প্রকাশ লীলাময় করে দেওয়া হয়েছে। প্রকৃতিদেবী সেখানে সময়কে এবং সময়ানুপাতেই বর্ণ-গন্ধে নৃত্য-গানে পুরুষকে, মনোমোহন এবং শ্রুতিমধুর করে প্রাণিজীবনের প্রবাহকে অনিবার রেখেছে। সুন্দর সেখানে সময় নির্ভর, পুরুষ তেমন নির্ভর নয়। মনোহরের প্রকাশ ঘটে প্রকৃতির ঋতু-বৈচিত্র্যে, বিউটিশিয়ানের প্রসাধন-বৈচিত্র্যে নয়। ওদের মুখের-দেহের কেশরের-পেখমের আর কণ্ঠের-ধ্বনির যে পরিবর্তন তা ধীরে ধীরে একেবারে নিজ নিজ প্রকৃতির অভ্যন্তর চেতনা থেকেই বাইরের প্রাবল্য-দৃশ্যমান প্রকাশে ঘটে থাকে। ওরা ধোঁকা দেয় না বলেই ওদের মুখোশ নেই, ডাক দিয়ে যায় বলে চমকপ্রদ আছে।

মানুষের বেলায় ব্যবস্থাটা কেমন অনায়াসেই উলটে যায়। মদির আঁখি আর পেলব কপোলের আড়ালে যে মুখ প্রকৃতিদত্ত তাতে আর তেমন করে মন ভরে না। তাই মদিরতর আঁখি আর বর্ণচ্ছটাময় কপোল দৃষ্টিকে চাহনিতে এবং দর্শককে মদনোচ্ছ্বাসে মুখোশ করে তুলতে সচেষ্ট হয়। রূপ দিয়েই ভোলাতে চায়, গুণ দিয়ে নয়। সময় আর ঋতুনির্ভর নয়, ক্যালেন্ডারের খোপে দিন দিন দৈনন্দিন হয়ে ওঠে। প্রকৃতির আপন প্রশ্রয়ে বেড়ে ওঠা দেহবল্লরি সামনে পিছনে উচ্চাবচ সুন্দরের পেলব জ্যামিতিক টান টান দিব্য সুষমা ওদের, নারীদের, সর্বাধিক তুষ্ট করতে পারে না। তাই তারা স্বপ্রচেষ্ট হয়ে প্রকৃতি প্রদত্ত রূপসম্ভারকে সুদে বাড়াতে নানাপ্রকারের হিসেব নিকেশের গড়াপেটায় নিমগ্ন হয়ে পড়ে। গ্রাম আছে প্রকৃতির কাছাকাছি, নীলে-সবুজে মাখামাখি, তাই সেখানে মুখের মুখ এবং শরীরের মুখ প্রকৃতিদত্ত মুখের আদল হারায় নি। শহর এসে গেছে বিদেশের কাছাকাছি, তেলে দুর্গন্ধে মাখামাখি, তাই এখানে মুখে এসেছে আধুনিক মুখোশ, দেহে জড়িয়ে গেছে তিনকেলে বংকোর, গদ-এর মুখোশ।

পুরুষের বেলায় ব্যাপারটা কেমন হয়েছে? প্রকৃতি তাকে গড়ে তুলতে জ্যামিতিক তুলির

ব্যবহার করেনি কিন্তু ক্ষতিপূরণ করার জন্যে অধিকতর পেশী শক্তি, নালিকাবিহীন গ্রন্থির মধ্যে অনিরুদ্ধ-অবারিত রাসায়নিক রসের যোগান ব্যবস্থা এবং সেই সূত্রেই দীর্ঘতর ভোগজীবনের এবং বহু-ভোগস্পৃহার উৎসমুখটি অবাধিত রেখেছে। নারীকে দিয়েছে স্নেহ মমতার শান্ত প্রবাহ, ধারণ-প্রসব লালন-পালনের যন্ত্রাংশ, আর কেড়ে নিয়েছে স্বেচ্ছার স্বাধীনতা। নারীদের মধ্যে যারা এই বঞ্চনাকে শান্তচিত্তে মেনে নিতে পারে নি, পারে না, তারা বিশ্ব প্রকৃতির সঙ্গে স্ব প্রকৃতির দ্বন্দ্ব-সংঘাতে লিপ্ত হয়ে পড়ে। সুযোগ এই যুদ্ধের পর্বে-পর্বে অস্ত্র অস্ত্র বদল ব্যবহৃত। কিন্তু প্রকৃতির আপন নিয়মের বেড়াজালে সেখানে প্রাপ্তির হিসেবে ভোগ যেমন আছে দুর্ভোগও কম নেই। কিন্তু প্রাকৃতিক নিয়ম পুরুষকে ভোগের অংশে সমৃদ্ধ করেছে, দুর্ভোগের বেড়াজালে তার জন্যে পাতা নেই। দেহের বহিরাবরণে পেলব সুন্দরের ছড়াছড়ি বরদান নেই কিন্তু অভ্যন্তরে মুক্তির ঝির ঝিরে ব্যবস্থা পাকাপাকিভাবেই দান করা আছে।

যুগ যুগ ধরে পুরুষ তাই ভোগের অতুল প্রবাহে ভেসে যেতে পেরেছে। প্রকৃতির দেওয়া ভিতে সে সন্তুষ্ট না থেকে নিজের বুদ্ধি-শক্তি-কৌশলে সেই ভোগের গভীরতাকেও বাড়িয়ে চলেছে, প্রসারকেও অসীম করে তুলতে চেয়েছে। উদ্বৃত্ত-ভোগবাদের মূল কথাই অপরের বঞ্চনা, সেই উদ্বৃত্ত থেকে বঞ্চনা। কিন্তু বঞ্চনাকে যদি বঞ্চিতের কাছে প্রাপ্তি বলে দেখান যায়? এই কারিকুরিতে প্রশংসা এক বিরাট ভূমিকা নিতে পারে। মুখে মুখে প্রশংসার চটিতে গল্পে উপন্যাসে, কাব্যে-গানে যদি তাকে, সেই প্রশংসাকে, শাশ্বত ব্যাখ্যা যায় তাহলে মন্ত্রের মতো কাজ হবে, যাদুর মতো প্রভাব পড়বে, আর প্রতিপক্ষের মনে অবশ-বিবশ আলুথালু বাতাবরণ তৈরি হবে। নারীকে তাই দেবী বানিয়েছে পুরুষ, সতীত্বের আদর্শে মহিমময় করে তুলেছে পুরুষ, সুন্দরের বেদীমূলে প্রতিমা করে সহস্রমুখে স্তবস্তুতির ব্যবস্থা করেছে পুরুষ। প্রশংসাসিক্ত নারীকে নিয়ে, এই অবশ-বিবশ অসাড়-নিথর নারীকে নিয়ে পুরুষ মহানন্দে তন্ত্র সাধনায় মন দিয়েছে। নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য আড়াল করে, মৃত-প্রকৃতির অঙ্কুরিত পূজার ভোগ-উপভোগে পা ভাসিয়ে দিতে পুরুষ তাই সুখাদের অনন্তভাণ্ডার করায়ত্ত করে তুলেছে। সভ্যতার ইতিহাস পুরুষের ভোগের ইতিহাস। অথবা বলা যায়, নারীর বঞ্চনার ইতিহাস।

তাই দেখতে পাই গৃহের গণ্ডিবদ্ধ সীমার মধ্যে নারীকে সতীত্বের দীপশিখাটি করে ব্রত-পার্বণে গর্ভ-প্রসবে লালনে পালনে একজনা রেখে পুরুষ নিজের জন্যে অসীম মুক্তির ব্যবস্থাপত্রটি মুষ্টিবদ্ধ রাখছে। গৃহে নারী দেবী, গৃহলক্ষ্মী। গৃহে, কিন্তু পুরুষের কাছে নয়। পুরুষের কাছে সেই দেবীই সেবিকা। পুরুষ, পতিরূপে, পরমেশ্বর, গুরু, সেবিত, পূজিত। নিত্যকর্ম পদ্ধতি। উদয়াস্ত পরিচারিকা, স্নানান্তে সিক্তকেশ নতনেত্র দাসী, দিনান্তে শবরী এবং অবশ দেহ নিশান্তে নর্মসহচরী। নারীর বিশ্ব চরাচর গৃহ-সংসারের চৌহদ্দিতে আষ্টে পৃষ্ঠে ঘেরা। পুরুষ কিন্তু চরে বেড়ায় যত্র তত্র। প্রয়োজনের আর ভোগের সর্বদিক তার খোলা। ঘরের দেবীকে সেবিকারূপে গৃহবন্দি রেখে হেসে-নেচে তারা কোঠাবাসী-গুহাবাসী 'দেবী'-সান্নিধ্যে ভক্তিগদগদ চিত্তে পূজাপাঠ সমাপনে মন দেয় পুরুষ। পুরুষের কাছে দেবীরা 'ওমনিপ্রেজেন্ট'। সংসার সুখের হয় রমণীর গুণে! সেই গুণ অবশ্যই সতীত্ব। পুরুষ সংসারের কেউ নয়? নারীর যে গুণ সংসারকে সুখের মহানন্দ করে তুলতে পারে সেই গুণের ছিটে ফোঁটাও পুরুষের জন্যে ধার্য নয়? স্ত্রীলোকের চরিত্র আর পুরুষের ভাগ্য—দেবতারাই জানেন না তো মানুষ কোন ছার। তাহলে কি বলা যাবে? স্ত্রীলোকের ভাগ্য আর

পুরুষের চরিত্র খোলা বইএর পাতা, সকলেই জানে, সকলেই পড়ে ফেলতে পারে? আমরা মনে-মুখে এক? মুখোশের মরুভূমিতে জলবিন্দুর অন্বেষণ হয়ে দাঁড়াবে না?

ক'দিন আগেই একটা পরিসংখ্যান দেখছিলাম। একা একা থাকার বাসনা আধুনিক শহুরে-শিক্ষিত মনে বেশই উর্ধমুখী। নারীরা একা একা থাকতে চায় এবং থাকতে পারেও। প্রকৃতি, প্রবৃত্তি এবং বাল্যাবধি লাইফ স্টাইল তাদের সাহায্য করে। পুরুষরা একা থাকতে চায় এবং থাকতে পারে না। অনুরূপই লাইফ স্টাইল তাদের তাড়িত করে, সাহায্য তো করেই না বরং নারী-নির্ভরশীলতা অনেক আনচান ঘটায়। আড্ডা-টুগেদার থেকে যৌথ-টুগেদার পর্যন্ত, লিভিং টুগেদার থেকে লিভিং টুগেদার অবধি গড়িয়ে যেতে চায়। বেঁচে থাকার প্রাথমিক দায় সভ্যতার প্রথম থেকেই নারীর ঘাড়ে চাপান আছে বলে পুরুষ সেই প্রথম থেকেই খাদ্য-বস্ত্র ভোগ-উপভোগে পরনির্ভর, পরগাছা।

আবার আর্থিক গতির হেরফেরে নারীর ও পুরুষের মন-মুখ পাল্টায়। দিনের শুরুকাজে ও সন্ধ্যে ঝলমলানো নারী গৃহমন্ডপে, নারীই গৃহের কর্ত্রী। কিন্তু সূর্য যবে গেল পাটে, গভীর হইল রাত্রি—অমনি নারী-পুরুষের জীবনদর্শনে আকাশ-পাতাল ওলট-পালট হয়ে গেল। পুরুষ দুটি কান একাগ্র করে নারীর কণ্ঠ-নিসৃত ললিত-ঝংকৃত বাণীতে আকৃষ্ট হয়ে গেল। সকল সাংসারিক সত্য এবং সমস্ত পারিবারিক তথ্য অকাতরে সংগ্রহের ঝুলি ভরে তুলল—অবারিত, অবিরত। সমগ্র জীবন-মন্থন ওঃ তু দুর্বহ প্রাপ্তির আগুনে আহুতি-কালের অপেক্ষায় পুরুষ তখন পলিপড়া নদীবক্ষের মত নরম, পেলব, মসৃণ। অথচ গৃহ গণ্ডির বাইরে, দিবালোকে, পুরুষের সিংহবিক্রম। সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং কৃষ্টি সংস্কৃতির বহু-সম্পর্ক বহু-বিস্তৃত ক্ষেত্রে নারীর স্থান অন্দরমহলে, পুরুষের ক্ষেত্র বিরাট-ব্যাপক-বহুধা বিস্তৃত। এই যে জীবন দর্শনের হেরফের, মূল্যবোধের তফাত এর মূলে কি আছে? কোনটা নারীর মুখ আর কোনটা তার মুখোশ? কোনটা পুরুষের মুখ আর কোনটা মুখোশ? নারী পুরুষকে নিয়ে খেলে এবং খেলায় মাতে। পুরুষ নারীকে বঞ্চিত করে, শোষণ করে দিনে। দু'জন দুজনকে প্রতারিত করে। মনে নয়, মুখে নয়, মুখোশের প্রভাবে।

(৪) রাষ্ট্রের এলাকায়: (ক) পার্টি ও নেতা

সংসার-পরিবার ছেড়ে এবারে সমাজ-রাষ্ট্রে নজর দেওয়া যাক। ঘনিষ্ঠ গণ্ডিতে মাতা-পিতার দ্বৈত সম্পর্কে অথবা সন্তান সন্ততি নিয়ে যে বহুধা আপন আপন বৃত্ত সেখানে মাঝে মাঝেই মুখোশের আড়ালে স্নেহ-মায়া-মমতায় ঘেরা মুখগুলো উঁকি দেয়, দেখা যায়। কিন্তু সমাজ-রাষ্ট্রে ছড়িয়ে থাকা নেতা-ভ্রাতাদের পরিমন্ডলই আলাদা, শতসহস্র হয়ে তারা আমাদের নেতৃত্ব দেয়, পথ দেখায়, তারণ করে, লক্ষ্যে মোক্ষে পৌঁছে দেবার জন্যে সদা সর্বদাই আত্ম বিসর্জন দিয়ে কোমরে গামছা বেঁধে লেগে থাকে। আপনারে লয়ে বিব্রত রহিতে আসে নাই তারা অবনী পরে, সমাজ চত্বরে, রাজ-রাজনীতির ঘূর্ণিজলে ধর্ম বিশ্বাসের পাদ পীঠতলে। তারা সকলেই ব্রতী, উদ্ধারের ব্রত তাদের অস্তিত্বের ধমনি পথে দিবস রজনী প্রবাহিত। এই প্রবাহ কখনও অপার কণ্ঠে ধ্বনিত, কখনও বা নিমগ্ন-শান্ত ছায়াবীথিতলে মন্ত্র মুগ্ধ উচ্চারণে মন্দ্রিত। এদের মন বলে কিছু আছে কি না তা জানার উপায় নেই—নিজেদের উপায় আছে কি না তা তারাই জানে, অপরের যে জানার উপায় নেই তা সকলেই জানে। মন নিয়ে এরা কারবারই করে না। পাড়ার নেতা পাড়া নিয়ে ব্যস্ত, গ্রামের নেতা গ্রাম নিয়ে, মহকুমার প্রধান মহকুমার সার্বিক স্বার্থ দেখতে স্থির-দৃষ্টি বলে ব্যক্তি-স্বার্থ আউট-অব-ফোকাসে সরে

যায়। পার্টির নেতারা পার্টিকেই বেদী বানিয়ে কোনও না কোনও মন্ত্রের তান্ত্রিক সাধনায় তাত্ত্বিক মতের মারণ-উচাটন প্রক্রিয়ায় রক্ত-আঁখি, মদ্য-জাগ্রত। মানুষের মধ্যে পরার্থপরতা যতো বাড়ছে, স্বার্থচেতনা যতো কমছে, পার্টির সংখ্যা ততোই বেড়ে চলেছে। দেশময় তন্ত্র সাধনার মহাযজ্ঞের দিন প্রায় সমাগত। এরা সকলেই মাভৈঃ মন্ত্রে সঞ্জীবিত, ত্রিনেত্র সুখন লক্ষ্যে উর্ধ্বশ্বাস, আর নিজেদের মধ্যে নিরন্তর ভুজঙ্গের নীতিতে দুধে-আমে হটপট। এদের কথা সবিস্তারে বর্ণনা করার সাধ্য কার? তবুও পঙ্গু যেমন গিরি লঙ্ঘনের চেষ্টা করতে পারে তেমনি চেষ্টা কৃতে যদি ন সিদ্ধতি কোহত্র দোষঃ?

সংসারে যেমন উদয়াস্ত দিনচক্র আছে, পূজা পার্বণে যেমন নিত্যকর্মবিধি আছে তেমন নেতাগিরিতে আছে ক্ষেত্র-কর্ম-বিধি। এই ক্ষেত্র-কর্ম-বিধি এমনই অমোঘ যে এর অন্যথা হলে নেতা সিঁড়ির যে ধাপেই থাক না কেন হঠাৎ দেখবে পায়ের নিচে আর কোন ধাপ নেই—অপার অতল। কিন্তু আশা এদের বেলায় ছলনাময়ী কুহকিনীই নয় এবং এরাও কোন অভাগিনী নয়। তাই পরমার্থ মন্ত্রে যাঁরাই উজ্জীবিত হয়ে—না ভিক্ষার সন্ধানে নয়, নতুন পার্টি গড়ার সমাজ-রাষ্ট্র নির্দেশিত কাজে মন দেবে। এরা মাকড়সার মতো জাল বিস্তারে কুশল এবং মাকড়সার মতই জাল-কেন্দ্র-ক্ষেত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হলেও নিজের নিজের উর্ণনাভ-সূত্রে ঝুলে থাকতে পারে, আবার উঠে আসতে পারে, আবার জাল বুনতে পারে। নেতাদের ক্ষেত্রে এই সূত্রটি অবশ্যই স্বদেহ-উৎসারিত রাসায়নিক সুতো নয়, মস্তিষ্ক সঞ্জাত কলাকৌশল আর পরার্থপরতার স্থির-লক্ষ্য আলোক-বর্তিকা।

ভূমিকা হিসেবে মাকড়সার উপমাটি অসম্পূর্ণ হয়ে গেল। এই নেতারা সকলেই ঈশ্বর তুল্যও বটে। কারণ এরা ঈশ্বরের মতই সর্বত্র-দৃষ্টি, সর্বজ্ঞানী, সর্বক্ষম এবং সর্ব-সহিষ্ণু স্বভাব। ঈশ্বর সাধনার গূঢ় উদযাপনে যেমন ক্ষুদ্র আত্মসর্বস্বতা বিসর্জন দিয়ে বৃহৎ আত্মোপলব্ধির পথ করার ডাক আছে, তেমনি নেতৃত্বের সাধন মার্গেও অপরের কারণে নিজের নিজের স্বার্থবলির ডাক আছে, সকলের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য অনেকের কষ্ট স্বীকারের ঘোষণা আছে এবং দেশের কারণে বহুজনের করুণ অবস্থা মেনে নেবার প্রণ আছে। ঈশ্বর তুষ্টে জগত তুষ্ট কিনা জানি না, তবে নেতার তুষ্টিতে যে সকলের তুষ্টি তা নেতারা অবশ্যই কর্ণ-কণ্ঠে বুঝিয়ে দেন। অথবা, প্রশাসনে-ঘেরাও-এ, মিছিল-মিটিংএ, রেল-রোখ-পথ-রোখ আন্দোলনে।

এসবই আমরা সকলেই জানি। মানি বা না-মানি জানার তাতে হেরফের হবে না। সকালে বাজার করতে গিয়ে দেখবেন বাজার বন্ধ, অফিস যেতে পথে ট্রেন বন্ধ, বাস বন্ধ, রাস্তা বন্ধ। কল্পনাকে একটু ঝাঁকুনি দিন দেখবেন আমার কল্পনার ধরনা-ক্ষমতার চাইতে আপনার মাথাটি অনেক বেশি তুষ-ঝরাবে। নেতা ছাড়া এসবের কোনওটিই কি সম্ভব?

নেতৃত্বের গঠন অনেকটাই পেঁয়াজের গঠনের মতো। পরতে পরতে পরিকল্পনা আর ধান্দার আঁটো সাঁটো বাঁধনে নেতৃত্বের অন্তর-বাহির সজ্জিত। এই সাজটাই আসল, দৃশ্যমান, বিদিত। অন্তর বলে যদি কিছু থাকে তাহলে সে সেই কৌটোর মধ্যে কৌটো, তার মধ্যে কৌটো.......শেষ কৌটোর মধ্যে প্রাণ ভোমরার মতো যখন প্রকাশ পায় তখন আখের গোছানো হয়ে গেছে। কেউ বিধবার পুকুর, নাবালকের সম্পত্তি অথবা সরল বিশ্বাসী প্রতিবেশীর সীমানা থেকে হাত ছিঁড়ে দুই একফালি জমি আত্মসাৎ করে নিজের বসত বাড়িটির দৈর্ঘ্যের সঙ্গে প্রস্থের সমতা এনে ফেলেছে (পাড়া, গ্রাম, এলাকার নেতা), কেউ সকাল-দুপুর এ-গ্রাম ও-গ্রাম করে করে মিটিং-মিছিলের আগে আগে চলে চলে, রাত-বিরেতে রাজনীতির ঘোর প্যাঁচ বুঝিয়ে বুঝিয়ে নিবেদিত প্রাণ জীবন যাপন করতে করতে

সকলের অজান্তে কিন্তু চোখের সামনেই নিজের পুরোনো নজর টাজির আচ্ছাদনের জায়গায় দোতলা-তেতলা ছাদ আঁটা বাসস্থানের ব্যবস্থা করে ফেলেছে, অথবা নগর-দূরের মধ্যে বা কাছে নিরালা জীবনের খোলা একটি বাগান ঘেরা 'মাথা গোঁজার' ঠাঁই করে নিয়েছে (সরকারে আছে এমন দলের নেতা)। এই নেতারাই উচ্চস্তরের বা জাতীয় স্তরের হলে কখনও জনগণের স্বার্থরক্ষার জন্যে পার্বলিক সেক্টর ব্যাঙ্কের সিন্দুক উন্মুক্ত করে অর্থের প্রবাহ বইয়ে দেবে, [প্রবাহের কতোটা কোথায়, কোন মরুপথে দিশা হারায় তার হদিস মরণশীল জনগণের বিবেচ্য নয়!] কখনও দেশী-বিদেশী লেনদেনের মাঝ মধ্যিখানে কাঞ্চনেনীর ভাগবাটোয়ারার অনার্জিত অংশ কর্পূর করে সাধনোচিত দিশা দেবে [ইং ইং কালের জাগ্রত নেতা-দেবতা হওয়া চাই!] কখনও কোন গোষ্ঠীকে তাতিয়ে-মাতিয়ে তাদের উত্তাল-নির্বোধ ক্রেউরূপ স্কন্ধে চেপে দরদাম (বার্গেইন) করার মতো উচ্চতা থেকে জনগণের অধিকার আদায় করার নামে নিজ নিজ পুষ্টি বাড়াবে, ধাপে ধাপে বারে বারে জনতার আহুতি দিতে দিতে নিজেদের চিকন-মসৃন চেহারা দেবে (গোষ্ঠী নেতা—জাত, ধর্ম, ধন ইত্যাদি!)। আর যারা শ্রেষ্ঠ নেতা, এক নম্বর চেয়ার যাদের মাপে তৈরি বলে মনে মনে বিশ্বাস, তারা চেয়ার দখলের দাবা-খেলায় মাতোয়ারা থেকে মুখে মুখে, বচনে ভাষণে, রেডিও-টিভিতে প্রেস-কর্নারে জনগণের জন্যে নাক কাটলে মুক্তো দেবো, পাই বিয়োলে দুধ দেবো, বর্ষা হলে ফসল দেবো......উদাত্ত কণ্ঠে সামগান গাইতে থাকবে।

নেতা হওয়া কিন্তু মুখের কথা নয়। প্রসব করলেই যেমন মাতা হওয়া যায় না, তেমনি জনগণের দুঃখ বেদনা বঞ্চনা-যন্ত্রণার কথাটি যথাস্থানে পৌঁছে দিলেই নেতা হওয়া যায় না। মুখোশের আড়ালে অন্য একটি মুখ আড়াল করে না রাখতে পারলে নেতা হওয়া হবে না। সেই আড়ালে আবডালে লুকিয়ে রাখা মুখটাও যেন কোনো নিজস্বতা দৃঢ়তা না দেখায় সেটাও দেখতে হবে। ক্ষমতাবান বা শক্তিমান যে ভাবে সেই মুখটিকে দেখাতে বলবে সে ভাবেই দেখাতে প্রস্তুত থাকতে হবে। কার্বোনিক্সন হতে হবে। সামনে লড়াই। লড়াই-লড়াই-লড়াই চাই। ঠিক আছে। পিছনে অবশ্যই লাইন অব কম্যুনিকেশন ঠিক রাখতে হবে। বলতে পারেন ডবল-এজেড সোর্ড, স্লিপিং ওয়ার্কিং। যাদের মধ্যে নেতৃত্বের গুনাবলি আছে তাদের পক্ষে সহজ, কিন্তু মরণশীলদের জন্যে অত্যন্ত দুরূহ জানবেন।

চোরের আমি গৃহস্থের আমি, বনের ধারের মাসি এবং কনের ঘরের পিসি—বলতে নেতৃত্বের এ-এক বিষম দায়। নেতার কাছে যারা আনীত, যারা আহূত অথবা রবাহূত, যারা সব দেখেশুনে জেনেবুঝে 'নেতা ছাড়া গতি নেই'- বলে মনে মনে স্থির জেনে গেছে তারা যেন সদা সর্বদা সেই অনুভবের উদ্দ্যমূলে প্রয়োজনীয় সেচন পায়।এই সেচন বাক্যে এবং ব্যবহারে, কৃপাবর্ষণে এবং অকৃপণ আপন বোধের পরিবেশনে হতে পারে। অথবা যোগাস্থানে যোগাযোগের মাধ্যমে প্রোটেকশন হতে পারে। এই সব পথ প্রক্রিয়া এবং পদ্ধতি, নেতা হতে গেলে, দাবাড়ুর মাথায় যেমন চালের পর চাল এবং প্রতিচাল সাজানো থাকে তেমনি নেতার মাথায়ও সাজান থাকা চাই। মরণশীলের পক্ষে চাল ডাল তেল নুন পার হয়ে এই চালের যোগান থাকা কি সম্ভব? এক ধাপ নিচের জনগণকে যেমন সেচনে ভিজে-ভিজে নরম-নরম রাখতে হয় তেমনি এক ধাপ উপরের নেতাকেও ভেট-নৈবেদ্য-পূজা-উপচারে সম্পৃক্ত রাখতে হয়। নেতা মানেই মধ্যবর্তী নেতা। নিচে বহু আর উপরে কতিপয়। নিচের বহুকে নিয়ে ভয়, সদা সর্বদা সামলানোর ভয়। উপরের কতিপয় নিয়েও সংশয়। পতন অভ্যুদয়-বন্ধুর-পন্থার

ক্ষুরধার পথের কি-তর কি-তর সংশয়। নরপশীরা বুভুক্ষুতে আক্রান্ত হবে, অমর নেতাগণ বুভুক্ষু চাপকে সকালের মর্মনিতে ছড়িয়ে দিয়ে প্রয়োজন মতো টিপনীটকে আক্রমণ করবে।

দেবকুলে যেমন তেত্রিশ কোটি দেবতা, নেতাকুলেও তেমনি অসংখ্য অগণিত নেতা। ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর। পলিটিশিয়ান-টেকনিশিয়ান-ম্যাজিশিয়ান সমান ভাবেই ভারতীয় দর্শনে-ধর্মে-জীবনে সত্য। বস্তুর দক্ষিণা কোন দেবতার প্রাপ্য, কোন দেবতাকে দেয় তা নির্ভর করে বহু বিষয়ের উপর। যে জানে সে সবটাই জানে, যে পারে সে আপনিই পারে—পারে সে মন জোগাতে—দেবতার এবং উপ-দেবতাদের [জনগণ]।

ভারতীয় দর্শনের, বিশেষত বেদান্ত দর্শনের, সার্থক এবং প্রকৃষ্ট প্রয়োগ দেখবেন ভারতীয় জনমনে। অজ্ঞতার প্রাগন্ধকার বাতাবরণে ব্যক্তি-দৃষ্টি সর্বক্ষেত্রেই নেতা-দৃষ্টি, নেতা-নির্ভর—পাড়ায় পাড়ায়, গ্রামে গ্রামে, শহরে-গঞ্জে, স্কুল-কলেজে, হাট-বাজারে এবং অবশ্যই ভোট-নির্বাচনে। এই ব্যক্তিপূজা অজ্ঞতার সঙ্গে সার্বিক মায়া-বাদ সোনায় সোহাগা হয়ে ভারতীয় জনগণকে নিশ্চিত-মায় অস্তিত্বের বোধ জলে ডিঙর-জীবন দান করেছে। মৎস্য-জীবন। মৎস্য মারুই খাবা। কেউ বলে শোষিত, কেউ বলে ভেড়াস। কিন্তু সেই ভক্তিরসের অমৃতের প্রবাহে জনচিত্ত যখন সম্পৃক্ত থাকে তখন শোষককে আর শোষক বলে মনে হয় না, মেজারী থেকে সেবকের নম্র-নত নির্বেদিত-চিত্তটি প্রকাশ পেতে পারে। এর সঙ্গে পূর্বজন্ম-পরজন্ম সংস্কার-কর্মফল ইত্যাদি সনাতন সত্য যোগ করে দিতে পারলে সেই সোহাগা-মিশ্রিত সোনাই নির্ভেজাল ব্যবহারের অলঙ্কার হয়ে দেখা দেয়।

বিজ্ঞান যা আবিষ্কার করে মানুষ, ক্ষমতাবান মানুষ, তাকে নিজ নিজ উদ্দেশ্যে কাজে লাগাতে পারে, লাগায়। নিউক্লিয়ার পাওয়ার। ধর্মের শিব, মূল্যবোধের সুন্দর আর দর্শনের সত্যকেও মানুষ কাজে লাগায়। অস্ত্র। অজ্ঞতার অন্ধকারে আর মায়াবাদের আচ্ছাদনে মানুষের মনোজগতে যে সহস্র সহস্র হিরোসীমা-নাগাসাকি ঘটে যাচ্ছে তার পরিসংখ্যান ফল-আউটই অদ্যাবধি বিন্যস্ত হয় নি। হয় নি, হবেও না। হবে না কারণ মায়াবাদ যদি ব্রহ্মের মুখোশ [সেখানেও মুখোশ?], যে মুখোশে সত্যকে, পাথরকে, কাদাকে ঈশ্বর বলে মনে হতে পারে, হয়ে থাকে, তাহলে নেতাদের দোষ কোথায়?

(খ) শিক্ষক : শিক্ষাক্ষেত্র :

শিক্ষার ক্ষেত্রে নেতা বলতে শিক্ষক, শিক্ষাবিদ, শিক্ষা পরিকল্পনার পুরোহিতেরা। এই নেতাদের আটপৌরে অবস্থায় ওদের সংসারে, পাড়ায় ক্লাবে, বাসে-ট্রামে, বাজারে-ফিরতি দেখুন। দেখুন আর এদের চিন্তা ভাবনা আবেগ-অনুভব আশা-আকাঙ্ক্ষার ছবিগুলো দেখে রাখুন। এবারে যাবেন ওদের নেতৃত্ব ক্ষেত্রে। চিনতে পারবেন না। দীর্ঘ লালিত আচরণ বিধির চাপে এরা বইয়ের ভাষায় কথা বলবে, কেতাবী কায়দায় নড়াচড়া করবে আর উচিত-অনুচিত বিষয়ে অনর্গল উপদেশ নির্দেশ দেবে ছাত্র ছাত্রীদের। আপনি আচরি ধর্ম পরেরে শেখাই—একেবারেই পুরানো, বস্তাপচা, অবসোলিট। আমি যা করি তা দেখবে না, আমি যা বলি তাই করবে—একেবারে আধুনিক, চালু এবং এফেক্টিভ।

কে যেন বলেছিলেন প্রত্যেক শিক্ষকই, অধ্যাপকই পণ্ডিত ব্যক্তি। যে যে বিষয় পড়ানোর কথা সেই সেই বিষয় ছাড়া অন্য অনেক বিষয়েই, এমন অন্য সকল বিষয়েই তাদের পাণ্ডিত্য অপ্রতিরোধ্য বহমান। একমাত্র যে বিষয়টি শ্রেণীকক্ষের ছাত্র ছাত্রীদের প্রয়োজন সেই বিষয়টির পাণ্ডিত্য,

শ্রেণীকৃত নয়, গৃহ-কক্ষের যেরাটোপে নোট-রূপ কবজকুণ্ডলে পরিবেশিত। এতে দাতা ও গ্রাহক উভয়েরই মঙ্গল সূচীত হয়। জ্ঞানের অকারণ মেদ ও অপ্রয়োজনীয় বপু বর্জিত হয়ে পুরিয়া-পুরিয়া আকারে গ্রাহক পরীক্ষার সময় সহজ বোধ করে আর শিক্ষক-অধ্যাপক বিন্দু বিন্দু [এখন আর বিন্দুতে কুলোয় না!] অর্থের ধারাপাতে হাট-বাজার-সংসারকে অনেক সহজ করে উপভোগ করতে পারে। শিক্ষকরা বড়-বড় ক্লাসে রোজ কল করে; ছোট-ছোট ক্লাসকে হোম-কল করার কল পাতে। সব পুজোয় যেমন সমান লোক সমাগম, আড়ম্বর এবং আমদানি হয় না, একই মন্ত্র, একই আচার-অনুষ্ঠান চলে না তেমনি শিক্ষা ক্ষেত্রেও বিষয় বা সাবজেক্টভিত্তিক আড়ম্বরাদি ঘটে, স্তর বা শ্রেণী ভিত্তিক ছাত্র সমাগমাদি ঘটে, সময় বা তাৎক্ষণিকতা ভিত্তিক আমদানির ব্যবস্থা থাকে। আর যদি পাণ্ডিত্য বা জ্ঞানের ক্ষেত্রে কোন্দল শাবল একেবারেই ব্যবহার না ক'রে বিশ্ববিদ্যালয়ের সার্টিফিকেট চাই তাহলে শুধু শিক্ষক নয় মন্ত্র-তন্ত্রের সাধক আচারে-বিচারে পটু কতিপয় করিতকর্মা অদ্ভুতকর্মা সাধক-শিক্ষক-নেতার কাছে যাবেন।

সব শিক্ষক নেতা কিন্তু শিক্ষার বদ্ধ-ক্ষুদ্র জগতে আবদ্ধ থাকে না। কিছু কিছু শিক্ষক নেতৃত্বের মই বেয়ে পুরোহিতের ভূমিকায় পৌঁছে গিয়ে ফিরে দেখার সুযোগ পায়। এরা সব জানে বোঝে, সব পরিষ্কার দেখতে পায়। তাই ইচ্ছে করলে এরা শিক্ষা ক্ষেত্রের যাবতীয় জঞ্জাল দূষণ দূর করার পথ বাতলাতে পারে, সকল প্রকারের মাকড়সার জাল আর উইএর ঢিবি ভেঙ্গে দেবার পরিকল্পনা তৈরি করতে পারে, শিক্ষাক্ষেত্রে যে সব বিভেদের বীজ, বিষবৃক্ষের বীজ আর জাতি-উচ্চতা-অজ্ঞতার বীজ ছড়িয়ে দেওয়া আছে তা সমূলে উৎপাটনের পথ দেখাতে পারে। পারে কিন্তু করবে না। কেন করবে না? করবে না কারন এরা কেউই কালিদাস হতে রাজি নয়। যে ব্যবস্থায় তাদের নিজ নিজ নেতৃত্ব, নিজ নিজ চেয়ারের দখল সম্ভব হয়েছে সেই ব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত হবে না? তা ছাড়া যদি কোন প্রদীপ দেখা দেবই তাহলেও কুলদেবতাদের রোষ আক্রমণে সে পুনর্মূষিক হতে বাধ্য। নেতারও নেতা আছে যে!

তাই জনগণের জন্য ঝড়ে কম্পমান জরাজীর্ণ স্যাঁতসেঁতে চালাহীন বেড়াহীন পাঠশালার ব্যবস্থার পাশাপাশি মনঃপূত-মনোনীত জনদের জন্য এলাহী ঝিকমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থা থাকছে। শ্রেণী সংঘর্ষ দূর করতে সুপরিকল্পিত সুবিন্যস্ত শ্রেণী নির্ভর শিক্ষার আঁটোসাঁটো ব্যবস্থাটি পাকা করে তোলা হয়েছে, হচ্ছে। কাঙালী ভোজের পাদর ব্যবস্থায় শুরু হয়ে প্রাথমিক শিক্ষা ধাপে ধাপে স্তরে স্তরে উন্নত হতে হতে রাষ্ট্রীয় ব্যাঙ্কোয়েট পর্যায়ে উন্নীত হয়েছে। সেরিষ্ট নয় মানি, স্টেট পলিসি নয় স্ট্যাটাস সচেতনতাই মোটিভেটিং ফ্যাক্টর। ভেস্টেড ইন্টারেস্ট, প্রাপ্তকে প্রাপ্য করে রাখার মনোবাসনা। কিন্তু কমিটি-কমিশনে প্রকৃত উদ্দেশ্যকে লুকিয়ে রেখে এমন একখানা দৃশ্যমান মলাট টান টান তুলে ধরা হবে যেন সকল নেতারাই সকলের জন্যে, জনগণের জন্যে, মনপ্রাণ ঢেলে শ্রেষ্ঠতম পরিকল্পনাটি পেশ করল। ইতিহাস-ভূগোল, অর্থনীতি-সমাজনীতি, দর্শন-নীতিবোধ রাজনীতি-রাষ্ট্রনীতির এমন ঘোল ঘোটা উপস্থাপনা থাকবে যে সাধারণ লোকেরা সেই পাণ্ডিত্যপূর্ণ মন্থনের অভিঘাতে ভোম কানা হয়ে যাবে। শ্রেণীভেদ জাতিভেদের বিরুদ্ধে উদাত্ত আহ্বান জানিয়ে এরা, এই নেতারা, চুপিসাড়ে শিক্ষার ক্ষেত্রে সেই ভেদ-কে সুদৃঢ়-সুপ্রতিষ্ঠ করে তুলবে। তারা তাদের নিজেদের সকল সন্তানের জন্যে ইংরেজি ভাষার মাধ্যমকে প্রায় জন্মাবধি চালু রেখে শিক্ষার বৃহত্তর সামাজিক জীবনের প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রকে সীমিত করে রাখবে। লক্ষ-লক্ষ কোটি-কোটি অর্বাচীন

তাই গণতান্ত্রিকতার দেশজ স্রোতের বাইরে তৈরি হয়ে চলেছে এক ক্ষুদ্র ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী যাদের পদযুগ্ম দেশের মাটিতে কিন্তু মন-মাথা বিদেশের আকাশে অধিষ্ঠান গ্রহণ করে আছে। ক্ষমতা, অধিকার, শ্রেষ্ঠত্ব এবং প্রাপ্তি তাই ব্রাহ্মণ, কুলীন, বংশ-জ ডাইনেস্টিক হয়ে যাচ্ছে। ঘরের মধ্যে এই নেতারা যা বলে, ভাবে, প্রকাশ করে, ঘরের বাইরে জনগণের কাছে সেই কথা বলে না, সেই বিষয় ভাবে না এবং সেই মনোভাব প্রকাশ করে না। জ্ঞান-কর্ম-বিধির অমোঘ নিয়মে সুনির্বাচিত মুখোশটি চড়িয়ে রাখে। এই সত্য!

শিক্ষার বিষয়কে বইয়ের পাতায় আটকে রেখে, পড়ুয়াকে চার দেয়ালের ঘেরাটোপে আবদ্ধ রেখে এবং শিক্ষকদের দীর্ঘদিন ধরে বিদ্যাব্যবসায়ী সৎ-নাগী–সন্ন্যাসী জীবন যাপন করতে বাধ্য করে শিক্ষা জগতের সুউচ্চ মার্গ নেতারা একদিকে নেতৃত্ব কায়েম রাখতে সক্ষম হয়েছে অন্য দিকে, সেই ব্যবস্থার অনিবার্য ফলস্বরূপ, বহুবিধ সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক রোগ ও দেখা দিয়েছে। বেকারির কোনও রোগ নয়, রোগের জন্মভূমি, লীলাক্ষেত্র। দেশময় বিদ্যালয় আর বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি করে দিয়ে কোটি কোটি টাকার নয় ছয় করার সুযোগ যতোটা ঘটে ততোটা শিক্ষার বিস্তার ঘটে না। বিশেষ বিশেষ রাজনৈতিক তন্ত্র সাধনার ক্ষেত্র প্রশস্ত হয় বটে কিন্তু শিক্ষার মধু মনের গভীরে প্রবেশ করে না। নেতারা এ সবই জানে। জানে যে শিক্ষা যদি জীবন কেন্দ্রিক না হয়, যদি শিক্ষার উদ্দেশ্য শিক্ষা ছাড়া আর সব কিছুই হয়ে ওঠে তাহলে দল ভারি হয় ঠিকই কিন্তু ছাত্ররা সোনা হয়ে ওঠে না, ব্যক্তি হয়ে স্বতন্ত্র হতে পারে না। জেলের ছেলেকে মাছ আর জাল থেকে উৎপাটিত করে বইয়ের পাতায় জুড়ে দিলে উভয় সংকট অনিবার্য হয়। জল আর মাছের জগতে তার শিক্ষা হলে বইয়ের মধ্যেই সে চারপাশের জীবনকে খুঁজে পায়। সংকট ধারে কাছে আসে না।

কিন্তু সংকট না থাকলে নেতার যে নেতা তার চলে কি করে? সমস্যা না থাকলে সমাধানের জন্যে লোকে হন্যে হয়ে নেতা খুঁজবে কেন? বৃহৎ এবং বৃহত্তর নেতাদের কাজই তো সংকট আর সমস্যা তৈরি করে দেওয়া। তবেই জনগণ আলোড়িত হবে, বিভ্রমতা-বিক্ষিপ্ততা দ্বারা শতধা হবে আর দৌড়ে যাবে নেতার কাছে—'পথ দেখাও পথ দেখাও'। অহংকারের মুখের সামনে স্থিতধী নেতৃত্বের মুখোশটাকে তখন অনেক বেশি পালিশ দেওয়া যাবে, অনেক বেশি খেলানো যাবে এবং জনগণের নির্ভরশীলতাকে অনেক বেশি নির্ভর করে শাসনের লক্ষ্য স্থির করা যাবে। এমন ভাবেই সমাধান করতে হবে যেন অনেক বেশি ভবিষ্যতের সংকটের বীজ বুনে রাখা যায়। ওরা জয়ধ্বনি দিয়ে ফিরে যাবে স্কুল-কলেজে, ক্ষেত-খামারে, কলে-কারখানায়, জলে-জঙ্গলে। নেতা অপেক্ষা করবে অধিকতর সংকট আক্রান্ত বিভেদ জর্জর পুনরাগমনের। এই বীজ বোনার ক্ষমতা এবং দূর দৃষ্টির উপর নেতৃত্বের অগ্রগতি নির্ভর করে। শুধু তাই নয়, সেই বীজ যাতে যথা সময়ে অঙ্কুরিত পল্লবিত হয়ে কাঙ্ক্ষিত সংকট-সমস্যা তৈরি করতে পারে তার জন্যে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা, সময় মতো জলসেচন দেওয়া ইত্যাদির জন্যে সচেতন থাকাও নেতার দায়। তাই লোকবল লাগে, ক্যাডার লাগে, বৈঠকখানায় সদা সর্বদা বহুজনের ধুনি জেলে রাখতে হয়।

তাই ঊর্ধ্ববর্গের নেতারা, সে শিক্ষার ক্ষেত্রেই হোক আর অন্য যে কোনও ক্ষেত্রেই হোক, কখনই আর বিষয়ে আটকা থাকতে পারে না। শিক্ষক শিক্ষা ছাড়া আর সব কিছুই দান করে, ডাক্তাররা রোগীর সেবা ছাড়া, ধর্মীয় নেতারা ধর্মের মর্মটি ছাড়া এবং দেশের নেতা দেশের ও দশের মঙ্গলটুকু ছাড়া আর সবেই মনোনিবেশ করতে সময় পায়। সময় পায়? না, সময় করে করতে

হয়। স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে এবং অন্তঃসমন স্থির রাখতে। নিজের সাংসারিক সুখ, সামাজিক সুখ আর নেতার সুখের আদল এক হলে চলে কি?

কিন্তু যারা সাধারণ শিক্ষক, নেতা-শিক্ষক নয় তাদের বেলায় ব্যাপারটা একটু অন্যরকম। এই অন্যরকম হওয়ার প্রধান কারণ এই যে নেতাদের ক্লাস নিতে হয় না কিন্তু সাধারণ শিক্ষকদের ক্লাস নিতে হয়। প্রথম গোষ্ঠী ছাত্রদের কোনও ক্ষতি করে না, দ্বিতীয় গোষ্ঠী—সাধারণ শিক্ষক গোষ্ঠী নিজেদের এবং ছাত্রদের — উভয়েরই ক্ষতি করে। ওরা পড়ায় না বলে ক্ষতি করতে পারে না। এরা পড়াতে হয় বলে অনিবার্য সুযোগ পায়। সাধারণ শিক্ষকরা তোতা কাহিনীর এক একটি তোতা। বইয়ের পাতা। হাতে-পকেটের চিরকুট অথবা মাথা-মগজের কোণে কোণে নোটস-কাটস! নিজ নিজ ছাত্র জীবনে বইয়ের পাতার বাইরে পদচারণা-পরিক্রমায় যেমন ইচ্ছা বা অবকাশ নেই। জীবনে জীবন যোগ করা হয় নি, ব্যর্থ তাই বিদ্যার পসরা। সেই ব্যর্থ পসরার বোঝা বয়ে বয়ে যখন ঘাড় বেশ শক্ত-পোক্ত হয়ে ওঠে তখনই আমাদের বিশ্ববিদ্যালয় সিলমোহর এঁকে দিয়ে যোগ্যতার মানপত্রটি হাতে ধরিয়ে দেয়। শিক্ষা ক্ষেত্রের নেতা-শিক্ষকরা বাক্তির মধ্যে শিক্ষককে না খুঁজে সিলমোহরের ঔজ্জ্বল্যে বিমোহিত হয়ে শিক্ষক নিয়োগ করে দেয়। শিক্ষা ক্ষেত্রের খাঁচায় খাঁচায় এই সব উন্নত মানের তোতারা কচি কাঁচা তোতাদের ট্রেনিং দিতে থাকে। শব্দ যত বাড়ে, শিক্ষার মানও তত বাড়ছে বলে নেতার নেতারা অন্যত্র মন দেয়। চলছে, চলছেই।

পুরোহিতের যেমন নামাবলি, শিক্ষকের তেমন চাদর। কাঁধে চাদর, নিপাট চাদরখানা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিপাট মানপত্রটির মতই একটি ঘোষণা। আজকাল অবশ্য সাম্যের ঘূর্ণি হাওয়া আর ত্রস্তব্যস্ত আধুনিক জীবনের তাড়ায় শিক্ষকদের নামাই বা মুখোশ বলে কোন আবরণ-আভরণ নেই, তবে ভিতরের সীমাহীন নিঃস্বরিক্ততা আর বাইরের নিঃসীম বুকিশ বাকচাতুর্য, দেশী-বিদেশী জ্ঞানী বিজ্ঞানীদের নাম উচ্চারণের সাবলীলতা, উপস্থাপনার কায়দা—সব নিয়ে চকচকিয়ে দেবার মতো ব্যাপার। দৈনন্দিন সমস্যা-সংকটে সমাধান বাতলানোর মতো বাস্তব সম্মত সংগ্রহ নেই, আছে মাত্র আদর্শ আর নীতির ঝুড়ি ঝুড়ি উপদেশ উপুড় করে দেওয়া এবং কাঁড়ি কাঁড়ি কোটেশনের আড়ম্বর উচ্চার। বুকিশ শিক্ষা ব্যবস্থা বুকনিপ্রধান হতে বাধ্য। প্রাথমিক স্তর থেকেই 'শিক্ষিত' করে তোলার এই যান্ত্রিক ব্যবস্থায় কেবলমাত্র অসোজা-অপটু করে তোলার পথই প্রশস্ত হয়েছে। শিক্ষকরা কাঁধে-চাদর পর্যায় পার হয়ে হাতে ফোলিও ব্যাগ, এটাচি, গলায় নেকটাই, অথবা কাঁধে শান্তিনিকেতন মার্কা ঝোলা ব্যাগে রূপান্তরিত। ছাত্ররা হৈহুল্লোড় করা বস্তু কলারে, ভক্তপাঞ্জাবীতে জীবনের কর্মযজ্ঞ থেকে উৎপাটিত হয়ে অফিসের অনায়াস অহংতুষ্ট চেয়ারের অন্বেষণে সার্টিফিকেট বগলে ব্যাঙ্ক-কাউন্টারে দৌড়ঝাঁপ করছে। অন্তঃসারশূন্য মুখোশের উজ্জ্বল সমারোহ দেখে সকলেই বিমোহিত বোধ করছে।

প্রত্যেক ব্যক্তিকেই কিছু না কিছু হতে হয়, করতে হয়। যে কামার হয় সে লোহা আর হাতুড়ি, হাপর আর আগুনের কাজ করে করেই কামার হয়। জেলেকে জেলে, কৃষককে কৃষক, চাকীকে চাকী হতে হয় এবং সেই সেই কাজ করে করে শিখতে হয়। তেমনি পুত্রকে পুত্র, কন্যাকে কন্যা, মাকে মা, বাবাকে বাবা হতে হয়। পরিবারে সমাজে রাষ্ট্রে এমন শত শত হওয়ার ব্যাপার আছে। নিম্নস্তরের প্রাণিজগতে এই সব হওয়ার ব্যাপার সমান ভাবেই আছে। সেখানে প্রকৃতি শিক্ষকের ভূমিকা পালন করে। তাই সেখানে ডারুইন তত্ত্ব সত্য। সত্য কিন্তু যোগ্যতমের উদ্বর্তন নিয়মকে মানুষ অমান্য করে

বহুসংখ্যকের মৃত্যু বা অপনয়নকে নিশ্চয় করে দিয়ে সকলের জীবন সম্ভব করে তুলতে চাইছে। মৎস্য চাষ, হাঁস-মুরগী পালন, শস্যের অধিক ফলন ইত্যাদি। প্রাকৃতিক হওয়াটাকে বিজ্ঞান আর প্রযুক্তির সাহায্যে একটা অন্যতর মাত্রায় হওয়াতে উত্তীর্ণ করা হচ্ছে।

প্রকৃতিকে নিজের বশে আনার জন্যে যে শিক্ষা তা মানুষ নিজের জন্যে, নিজেদের মধ্যে বংশধরের জন্যে ঘটিয়ে চলেছে। কিন্তু নিজেকে নিজের বশে আনার জন্যে, নিজেকে জানার জন্যে, নিজ নিজ হওয়াগুলোর জন্যে তার শিক্ষা ব্যবস্থা মানুষ নির্ভর না হয়ে প্রকৃতি প্রবাহ নির্ভরই থেকে যাচ্ছে। বইয়ের শিক্ষা নিচ্ছি পড়ে পড়ে, জীবনের শিক্ষা যা কিছু তা ঠেকে ঠেকে। তাই আধুনিক জীবনের পলেস্তারা পড়ছে শিক্ষার নামে কিন্তু ভিতরের কাঠামোতে মধ্যযুগের সংস্কার-কুসংস্কার, চিন্তা-ভাবনা, আবেগ-অনুভব, বিশ্বাস-অবিশ্বাস নখ-দন্ত অস্থি-অস্থিরতা তৈরি করেই চলেছে। সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর বিশ্বাস-অবিশ্বাসের জমিতে পা রেখে আমরা বিংশ-একবিংশ শতাব্দীর আকাশে শ্বাস নিয়ে চলেছি। ভিতরের আমি আর বাইরের আমিতে যুগান্তরের ব্যবধান ঘটছে। বাইরের আমিটা, মুখোশটা সকলের দৃষ্টিতে পড়ছে, ভিতরের মুখটা চেনা যায় না সব সময়ে। হওয়াটা যথাযথ হয়ে ওঠে না, কিন্তু প্রলেপটা স্পষ্ট-জ্যান্ত দেখা দিচ্ছে।

এই প্রলেপটাই আসল বলে দেহ-মুখ, চলনে-বলনে ঝুলিয়ে রাখি। রাখি যে তা কতো সহজেই ধরা পড়ে যায়। পলকা এই শিক্ষার বহিরাবরণটুকু জীবনের দৈনন্দিনে ছিঁড়ে যায়, ভিতরের নখদন্তের আভাস দেখা দেয়। শত শত উদাহরণ নিত্যদিন ট্রেনে-বাসে, হাটে-বাজারে, অফিসে-কাছারিতে যেমন ঘটছে তেমনি ঘটছে গৃহে গৃহে, সংসারে-সংসারে, বাড়িতে-বাড়িতে, সম্পর্কে-সম্পর্কে। একটু থেকে একটু হলেই, পান থেকে চুন খসলেই, ছোট-বড় স্পার্ক দেখা দেয়। সামান্যে দন্তপঙ্‌ক্তি উন্মুক্ত করে যেমন ভিতরের অ-শিক্ষিত আমিগুলো উঁকি দেয়, গর্জায়, আক্রমণ করে, তেমনি কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান হারিয়ে ধুন্ধুমার দাঙ্গা ঘটাতে পারে। এই ব্যাপারটার মূলে আছে সেই হওয়া ব্যাপারটার না হয়ে ওঠাটা। শৈশব থেকে হয়ে-ওঠার শিক্ষাটা না পেয়ে পেয়ে কিন্তু বইয়ের পাতা সংগ্রহের শীর্ষ প্রথায় একটা প্রলেপ, মুখোশ, আমাদের প্রত্যেকের আমিটার উপর ধাপে ধাপে পড়তে থাকে। একটা সময়, তাই আমরা সত্যি সত্যিই বিশ্বাস করে বসি যে, দরজার বাইরে ঝোলানোর মতো যে নেম-প্লেটখানা চকচক করে অপরের কাছে আমাদের পরিচয় হিসেবে, সেই নেম প্লেটটাই আমরা। তখন আর মনে হবার সুযোগ ঘটে না যে জামা কাপড়ের অভ্যন্তরে, সার্টিফিকেট-মানপত্রের বাইরে আমাদের প্রত্যেকের এক একটা ঘরোয়া মুখ আছে, আমি আছে। এই আমিটার সুপ্ত সম্ভাবনা নিয়ে আমরা শৈশব-যাত্রা করি, শেষ পরিণতি নিয়ে কবরে-শ্মশানে যাত্রা করি। মাঝখানে মুখোশের জয়যাত্রা, অথবা বলা যায় পরাজয়-যাত্রা। নিঃশেষে মুছে যাবার যাত্রা।

(খ) ধর্মের ক্ষেত্রে:

শিক্ষার মতো ধর্মও একটা সামাজিক-সার্বিক ব্যাপার। কিন্তু শিক্ষাকে যতো সহজে বোঝা যায় এবং সে বিষয়ে বলা যায় ধর্মকে ততো সহজে বোঝাও যায় না সে বিষয়ে বলাও যায় না। স্পর্শকাতর, উত্তেজক, বিস্ফোরক। 'হ্যাণ্ডল উইথ কেয়ার' ব্যাপারটা ধর্মের নাড়াচাড়ায় সর্বদা মনে রাখতে হয়। তাছাড়া 'দিস সাইড আপ'-বলে একটা চিহ্ন-ঘোষণা ধর্মের গায়ে সেঁটে দেওয়া আছে—ঈশ্বর। সব সময়ই উপরের দিকে তাকাতে হবে। অন্যথা চলবে না—অন্তত ধর্মপ্রাণদের জন্যে তো নয়ই।

জলের ধর্ম আছে এবং তা বুঝি। বাতাসের ধর্ম আছে তাও বুঝি। তেমনি মেঘের ধর্ম, আগুনের ধর্ম ইত্যাদি আছে। এই সব ধর্ম শংকাতর নয়, উত্তেজক নয়, বিস্ফোরক নয়। যৌক্তিক, বৈজ্ঞানিক এবং বাস্তব সম্মত নাড়াচাড়া এই সব ধর্মের বেলায় তাই সহজেই চলে, চলে আসছে। মানুষের বেলায় তার মনের ধর্ম, শরীরের ধর্ম ইত্যাদিও গোলমালের কারণ ঘটায় না। মানুষের ধর্ম? এখান থেকেই পা মেপে মেপে পা ফেলার শুরু। কেন? কারণ সেই ধর্ম যখন সার্বিকতায়, সামাজিক মানুষের বিশিষ্টতা নিয়ে নয় হবে তখন চলন-বলন সহজ-স্বাভাবিক থাকবে। মানুষের ধর্মকে মনুষ্যত্ব বলে ঘোষণা করলে বঙ্কিমের কথায় বলা যাবে যা থাকলে মানুষ মানুষ না থাকলে মানুষ মানুষ নয় তাই মনুষ্যত্ব, অথবা রবীন্দ্রনাথের মতো রিলিজিয়ন অব ম্যান বলে শিল্প সঙ্গীতে জীবনের পূর্ণতায় অভিব্যক্তি খুঁজে নেওয়া যাবে। কিন্তু ধর্ম যখন বিশ্বাসের মাত্রা পাবে, ঈশ্বরের কোন-না-কোন রূপে-বর্ণে-ছটায় সম্পৃক্ত হয়ে হাজির হবে তখনই হুঁশিয়ার হবার সময় আসবে। এবারে আর বুদ্ধি-বিবেচনা যুক্তি-বিজ্ঞান বস্তুবোধ-চেতনাবোধ কোনও কাজে লাগবে না। কাজে লাগবে না তার প্রধান কারণ এই যে ইন্দ্রিয়পথ সকল রুদ্ধ করে ধ্যানস্থ হতে হবে। নিজ নিজ মনের গভীরে ডুব দিতে হবে। সুষুপ্তি স্তরের অনুরূপ স্তরে পৌঁছাতে পারলে নিজেকে জানা সম্ভব হবে, নিজের সর্ব-বর্জিত নিজটুকুকে জানা সম্ভব হবে। পণ্ডিত ব্যক্তিরা বলেছেন। তবে জানলে কি হবে, তাকে প্রকাশ করা যাবে না, মনের গোচরে সেই জানাকে ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। এই এলাকার কথা বলার যোগ্যতা নেই কারণ এটা যোগীদের এলাকা, যোগসাধনের এলাকা। অদ্ভুত উপলব্ধির এলাকা। মরনশীল আমরা যারা নড় তাদের থাকা উচিত শতহস্ত দূরে।

কিন্তু দূরে থেকেও মড় শাই যা পাই তা কেমন? নিজেকে জান-র নিজটা তাহলে অবাঙ্মানসগোচর? পিওর বিইং? একটা অবিমিশ্র সাবজেকটিভিটি? এখানে পৌঁছে বিইং আর নাথিং একাকার। এটাই ব্রহ্ম স্বরূপ। যুক্তি-বুদ্ধি-অভিজ্ঞতার নাড়াচাড়ায়, বিশ্লেষণ-অনুসন্ধানে মনের মধ্যে মন, তার মধ্যে মনকে খুঁজতে গিয়ে এরকম একটা সিদ্ধান্ত অগ্রাহ্য ঠেকবে না। কিন্তু বিপদ ঘটবে অন্যত্র।

আমরা প্রত্যেকেই চেষ্টা করলে নিজেদের বাইরেটা ছেড়ে ভিতরটাকে তন্ন তন্ন করে খোঁজা খুঁজি করতে পারি। নিজের বলে যা কিছু জমা করেছি সময় করে তার প্রত্যেকটিকে নেড়েচেড়ে উল্টে-পাল্টে দেখে দেখে, বাতিল করে করে আপন আপন মনের গভীরে একেবারে স্বকীয় নিজেটার অন্বেষণ করতে পারি। কমবেশি এ-কাজ আমরা করেও থাকি। লেগে থাকি না বলে শেষ আমিটার হদিস করতে পারি না। তা, এই করতে করতে যদি শেষ পর্যন্ত যেতে পারি আর তখন যদি সবই বাতিল হতে হতে হাতে কেবল শূন্যই পড়ে থাকে, নাথিং-ই একমাত্র পাওনা হয় তাহলে সেই ফাঁকা-মুঠির মধ্যেও একটা কি-যেন-কি থেকে যায়। শূন্য-প্রাপ্তি, কিন্তু মিথ্যা-প্রাপ্তি নয়। প্রকাশ করা যায় না, একটা কিছু যা আপন অস্তিত্বের অনুভবের মাত্রায় নিজের বলেই মনে হয়। একে যদি দার্শনিকেরা সৎ-চিৎ-আনন্দ ব্যবস্থা বলেন, একজিসটান্স-কনসাসনেস-ব্লিস বলেন অথবা বলেন 'অনুভ-স্বরূপ-ব্রহ্ম' তাহলে তা অস্বীকার করি কেমন করে? একটা বিজ্ঞানসম্মত কনস্ট্যান্ট—একটা 'এল'। ইউক্লিডের 'বিন্দু'।

কিন্তু এই অন্বেষণ যখন নিজের ভিতরে না চালিয়ে বাইরের দিকে চালান হয়? তখনই বিপদ। ঐ একটাই ঈশ্বর হয়ে হাজির নয়। মনের নিরিখে আতিপাতি তোলপাড় করে কিছু না

পেলেও যে অনুভব পাই তা বাস্তব অনুভব, বিশ্বের মহাশূন্যে হাত পা ছুঁড়ে কিছু না পেয়ে যদি অনুরূপেই বলে উঠি সেই কিছু না পাওয়াটাই ঈশ্বর তাহলেই বিপদ। এক ক্ষেত্রে রইল অনুভবের অনুভব, অন্যক্ষেত্রে অনুভবহীনতার অনুভব। প্রথম ক্ষেত্রে একে একে সব কিছুকে বাদ দিতে দিতে যে শূন্যতা—নাথিংনেস—সে কি দ্বিতীয় ক্ষেত্রের পরিব্যাপ্ত শূন্যতা হাতড়িয়ে পাওয়া শূন্যতার মতো?

তবুও মন মানে না। এটাই বিপদ। কিন্তু এই বিপদ যতক্ষণ দার্শনিকদের এলাকায় আলোড়ন ঘটায় ততক্ষণ তা মারাত্মক নয়। এ বিষয়ের আলোচনা অন্যকোনও সময়ে করার বাসনা রইল। এখনকার কথা এখন বলে নিতে চাই। সেই কথাটা এই : দর্শনের ঈশ্বর যখন ঘাটে মাঠে বাটে ধর্মের দেবতা হয়ে হাজিরা দেয় তখন ব্যাপারটা কোন দিকে মোড় নেয়?

বোধ হয় সম্পূর্ণ ঠিক বলা হল না। প্রশ্নটা অন্য একটা দিক থেকেও দেখা দেয়। ঐতিহাসিক দিক। কারণ, মানুষ অসহায়, ভীত, সন্ত্রস্ত ছিল সেই অতীত দিনে। তার জ্ঞান-অভিজ্ঞতা কম ছিল, জানা-চেনার এলাকা সীমিত ছিল। অথচ তার পরিবেশ পরিস্থিতি ছিল ভয়ানক বিপদসঙ্কুল। সেই সুদীর্ঘ জীবনের ধাপে ধাপে সুতীব্র সংগ্রামের প্রাপ্তি আর বঞ্চনার মধ্যে মধ্যে, তার অনেক হারিয়ে কিছু কিছুকে পাওয়ার অভিজ্ঞতার পরতে পরতে একটা বিরাটের অনুভব, একটা কখনও-ভীষণ-কখনও-সুন্দরের অনুভব, একটা মহাশক্তির উৎসের অনুভব ছড়িয়ে দিয়েছিল। ভয়-বিশ্বাসে, হারানো-প্রাপ্তিতে, আশা-নিরাশায় ভূত-প্রেত-দৈত্য-দানোর পাশাপাশিই এক দেবতার জন্ম সে রোধ করতে পারে নি। তাই, ইতিহাসের পথ বেয়ে, ভয় আর অসহায়তার ভিতে, ভীষণের পাশাপাশিই এক মঙ্গলময়ের ক্রমিক উন্মেষ ঘটেছে। একেই মানুষ তার দেবতা, ভগবান বা ঈশ্বর বলে দুর্যোগে-দুর্দিনে বাঁচাটাকে সহজতর করে তুলতে চেয়েছে। আবার দর্শনের পথ ধরে ব্রহ্ম এসেছে, এবসলিউট এসেছে। সভ্যতার প্রথম পর্বেই এই বাঁচার দেবতার সঙ্গে মিলন ঘটেছে দর্শনের ঈশ্বরের। একটা আবেগীয় নির্ভরশীলতার আকাঙ্ক্ষার স্রোতে ক্রমশই মিশে গেছে বৌদ্ধিক চেতনার সিদ্ধান্ত-মীমাংসা। জনগ্রাহ্য দেবতা আর জ্ঞানগ্রাহ্য ঈশ্বর সেই যে একই বিশ্বাসের স্রোতে মিশে গেল, তা আর থেমে গেল না। থেমে গেল না বটে কিন্তু মাঝে মাঝেই প্লাবনের সম্ভাবনাকে, হঠাৎ হঠাৎ ফুলে ফেঁপে উঠে দিক আর গতিবেগের কারণে ধ্বংসের সম্ভাবনাকে সমূহ করে তুলতে পারল।

খাদ্য যেমন মানুষের ক্ষুধাকে, জল যেমন তৃষ্ণাকে নিবৃত্ত করতে পারে ঠিক তেমনি অসহায় মানুষের ভয়ভীত অস্তিত্বের অপরিমেয় দুঃখ যন্ত্রণার তুষ্টি সাধন করতে দেবতা, দেবতাদের, প্রয়োজন ছিল। বিশ্বাসের জোরে সে জীবনকে সেই সময়ের মতো করে বেঁচে নিতে পারছিল। পারছিল, কিন্তু বেশিদিন তার এই পারাটা প্রকৃতিসিদ্ধ থাকতে পারল না। পারল না, কারণ মিডল-ম্যানরা এসে গেল, দূতের দল, পুরোহিত-পোপ-ব্রাহ্মণ—সকলেই। এরাই প্রথম প্রোফেশনাল এজেন্সি, স্বনির্বাচিত প্রতিনিধি। মানুষের এবং দেবতার বা ঈশ্বরের। প্রোফেশনাল এবং ডাইনেস্টিক। জীবন পাল্টে গেল যাযাবর থেকে কৃষিতে। অবকাশ, অফুরন্ত অবকাশ। অজস্র ধারায় উন্নতি। অন্বেষণ, অনুসন্ধান, সৃষ্টি। সভ্যতা।

ধর্মক্ষেত্রের প্রতিনিধিরা, দূতেরা, ধর্মকে পেশা করে নিল। শ্রেণী-বর্ণ-জাতপাত সেই পেশার দীর্ঘস্থায়িত্বের জন্যে অনিবার্য হয়ে উঠলো। ধর্ম আর ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের ব্যাপার রইল না, জনসমূহের প্রাপ্ত বিষয় হয়ে দাঁড়াল। হাজারো আচার-অনুষ্ঠান, বিধি-বিধান, প্রথা-প্রকরণ, প্রক্রিয়া

পর্যন্ত উত্তরিত হয়ে হয়ে ব্যক্তিকেও যেমন গোষ্ঠীকেও তেমনি আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে ফেলল। যে বিশ্বাস বা অনুভবের জন্ম হল মনের নিভৃত নির্জনে সেই বিশ্বাসকেই, সেই অনুভবকেই আসর করে, কার্নিভাল করে, হিসেবী মনের ধূর্ত মানুষেরা অক্টোপাস, পাইথনের মতো ব্যবহার করতে লাগল। মনের দেবতাকে কাছে পেতে, তুষ্ট করতে অথবা ভয়-ত্রাস-অসহায়তার হাত থেকে মুক্তি পেতে সেই যে আর এক দল পার্থিব দেবতার পদতলে নত হল সেই শুরু হল মানুষের, আপামর জনগণের আধ্যাত্মিক পরনির্ভরশীলতা। এপারে পারানির কড়ি গোনার সেই শুরু। ওপারে যাবার যাবতীয় পথ আগলে রইল সবিশেষ জন, বুদ্ধিমান জন। ক্রমশ এরা ঐহিক এপারের দেবতা হয়ে উঠলো এবং পারত্রিক ওপারের সেতুপথে টোল সংগ্রাহকের, পাসপোর্ট বিক্রেতার আধিকারিক হয়ে গেল।

অর্থনৈতিক শোষণ, সামাজিক অবিচার আর পার্থিব পেষণ অবশ্যই সভ্যতার অবদান। কিন্তু মনের এই ধর্মবোধের শোষণ অনেক বিকৃতির কারণ। সময় এবং সুযোগ পেলে অন্যান্য শোষণ থেকে অবিচার থেকে মুক্তির পথ পাওয়া যায়। পাওয়া যায় তার কারণ সে সকল বিষয় বিচার-বিবেচনার, তর্কের-জ্ঞানের, বিশ্লেষণ-অন্বেষণের বিষয়। তথ্য ও তত্ত্বের ক্ষেত্র। কিন্তু ধর্ম? ধর্ম তো প্রধানত এবং সম্পূর্ণত বিশ্বাসের, অনুভবের আর ভক্তির ব্যাপার। আগুন যতোদিন আগুনের ধর্ম হারাবে না ততোদিনই সে দহন করবে। তেমনি মানুষ যতোদিন মানুষের প্রকৃতি হারাবে না ততোদিনই সে বিপদে ভীত হবে, অসহায়তা থেকে মুক্তি পেতে সহায় সম্বল খুঁজবে। এই খুঁজতে গিয়েই সে মানুষের মধ্যে নয়, দেবতা-কল্পনার মধ্যেই বরাভয় চাইবে।

মানুষের এই দুর্বলতম ক্ষেত্রে, তার অসহায়তম অস্তিত্বের অনুভবের ঘাটে দেবতা-ঈশ্বরের কারবারীরা দলে দলে, যুগে যুগে ঘর বেঁধে বসবে। আধুনিক জীবনের কারবারীরা মানুষের ভোগস্পৃহার দুর্বলতাকে বিজ্ঞাপনের কৌশলে সদা জাগ্রত রেখে ব্যবসায় রমরমা আনছে, তাকে অগ্রপশ্চাৎ বিবেচনাহীন বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে, বস্তু থেকে অন্য বস্তুতে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। পণ্যের বাজারে হাতছানি দিচ্ছে। অস্থির করে তুলছে। এবং মানুষকেও পণ্য করে তুলছে। ভোগস্পৃহা মানুষের দুর্বলতম ক্ষেত্র নয়। নানাবর্ণের মুখোশের আড়ালে যে কারবারী, যারা এপার-ওপারের মাঝি, তারাই মানুষের মনের অসহায়তম, দুর্বলতম স্থানে নিজেদের আসনটিকে অধ্যাত্ম মহিমায় সিংহাসনে সম্পৃক্ত করে নিঃসাড়ে শোষণ করে চলেছে।

ম্যান ইজ র‍্যাশনাল, মানুষ বুদ্ধিমান। সে কেন বোঝে না? মানুষ বোঝেও বটে বোঝেনাও বটে। সব কিছু যখন ঠিক ঠাক চলে, আশা-আকাঙ্ক্ষা, চাওয়া-পাওয়া যখন স্বাভাবিক গতিতে পথ খুঁজে পায় তখন সে অবশ্যই র‍্যাশনাল, বুদ্ধিমান। কিন্তু বিপদে-আপদে, দুর্দিনে-দুর্যোগে, জরা-মৃত্যুর সামনে সে অনিবার্য ইর‍্যাশনাল, আবেগ সর্বস্ব। তখন সে দু'হাতে পথ হাতড়ায়, সহায় খোঁজে। মানুষে তার কুলোয় না, অতি-মানুষ খোঁজে, নির্ভরশীলকে মনের মধ্যে স্থির পাবার জন্যে দেবতা-গতি হয়ে ওঠে। সেই দেবতা খুঁজতে সে মন্দিরে যায়। দেবতা মন্দিরে আছেন কিনা সে প্রশ্ন তখন অবান্তরই নয় ধৃষ্ট বলে মনে হয়। যে নয়নকাড়া সৌম্যমূর্তিটি তার চোখের সামনে দেখা দেয় সেও তখন, সেই তখন, তার একমাত্র প্রত্যক্ষ পরিত্রাতা বলে মনে হয়। এটাই অসহায় মানুষের প্রকৃতি, আবেগীয় স্বভাব। যে দেবতার থাকার কথা তার মনের মধ্যে, তার নিজের অনুভবে-বিশ্বাসে-ভক্তিতে, তাকেই সে হাতড়িয়ে বেড়ায় মন্দিরে-মন্দিরে। এটাই মানুষের মনুষ্যপ্রকৃতি।

মানুষ জানে যে দূর থেকে দূরে সরে যাওয়া রেলের পাটি দুটোর মধ্যেকার ফাঁক সর্বদাই সমান থাকে, কিন্তু সে দেখে অন্যরকম। দেখে যে সেই ফাঁকটা ক্রমশই ছোট হয়ে আসছে। এটা মানুষের চোখের চক্ষু-মিথ্যা। অন্যথা হবার পথ নেই। মানুষ জানে যে পৃথিবী ঘুরে ঘুরে চলেছে, নিয়মিত ঘুরছে, সূর্য দিয়ে রাত তৈরি করছে। এটা মানুষের প্রত্যক্ষের আপেক্ষিকতার প্রত্যক্ষ-মিথ্যা। মানুষ জানে যে ভূত-প্রেত বলে কিছু বাস্তবিক নেই, কিন্তু পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে এবং মানসিক প্রকৃতি-প্রবণতার কারণে—স্থান-কাল-পাত্র মাহাত্ম্যে—তার গা ছম ছম করে, ওইসব ভীত-সন্ত্রস্ত মনের ওপর ভূত-প্রেত রূপ নেয়, প্রকাশ পায়, আক্রমণ করে নিজে অ-জ্ঞান করে দেয়। সে ভূতকে তাই 'প্রত্যক্ষ'ও করে। দেখে বা প্রত্যক্ষ করে কারণ এটা তার মনের ভয়-ভয় অনুভূতি-মিথ্যা। একই ভাবে দেবতা-ঈশ্বর মানুষের অসহায়-অসহায় মনের অনুভব মিথ্যা। বিশ্বাস মিথ্যা, ভক্তির আবেগে আপ্লুত প্রত্যক্ষ-মিথ্যা। জানা নয়, অ-জানা মিথ্যা।

মানুষ মাত্রই এক, কিছু কিছু বিষয়ে এক। তাই মনোবিজ্ঞান, নৃবিদ্যা, সমাজবিজ্ঞান ইত্যাদি বিজ্ঞান সম্ভব। আবার মানুষ মাত্রই আলাদা, বহু বিষয়ে আলাদা। তাই তার হাতের লেখা, আঙুলের ছাপ, আকৃতি-প্রকৃতি, মন-মানসিকতা, বিশ্বাস-অবিশ্বাস তাকে ব্যক্তি বলে চিহ্নিত করতে পারে। এই সমষ্টিগত সামঞ্জস্য বা ঐক্য আর ব্যষ্টিগত ভিন্নতা বা অনৈক্য নিয়ে প্রত্যেক মানুষ। এই ব্যষ্টিগত ভিন্নতার মধ্যে সে তার ব্যক্তিগত ইচ্ছা-অনিচ্ছা, হওয়া-না-হওয়া, করা-না-করা গুলোকে একে একে নিজের মতো করে খুঁজে নেয়, তৈরি করে নেয়। জাগতিক সব বিষয়েই তার বেছে নেবার, গ্রহণ-বর্জনের সুযোগ থাকে। একমাত্র বিষয় তার ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মবোধ, যেখানে তার কোনও সুযোগ থাকে না—অধিকার থাকতে পারে কিন্তু সুযোগ থাকে না। জন্মমুহূর্তেই, পর্বতগাত্রে শিলালিপির মতো, শিশু ব্যক্তির ধর্মের লিপিটি খোদাই হয়ে যায়। তার পরে সারাজীবন ধরেই পর্বে পর্বে পর্যায়ে পর্যায়ে সেই ধর্ম-সামাজিক আচার-অনুষ্ঠানে নিয়মে-নীতিতে হাতে-পায়ে এমন টাইট এবং গভীর করে তোলার ব্যবস্থা হয় যাতে যৌক্তিক অনুশীলন, বাস্তব প্রত্যক্ষের পরিশীলন অথবা মানবতাবোধের দাবি সবই নস্যাৎ হয়ে যায়। মানুষের জানা-দেখার জগতে আ-সমুদ্র পরিবর্তন ঘটে যায় কিন্তু সেই শিলালেখতে তার প্রভাব পড়ে না, সেই ধর্মবোধ যখন আমৃত্যু সাড়া দেয়, আবেগীয় আচারের জন্য সেরা ঠিক তেমনিই তা থেকে যায়। সব মুখই বার বার দেখা দেয়, সব মুখোশই বার বার পাল্টায়, একমাত্র ধর্মের আ-জন্ম বিশ্বাসের মুখটি, আরোপিত হয়ে মুখোশটি বরাবরই তাই, তার কখনও পাল্টায় না।

আর বাদবাকি আমি বলেছি? ভূত বা মিত্রজন? তারা জেনে-অজানে এই মুখ মুখোশ বাগিয়ে পর্যায়ক্রমিক নেতৃত্ব দিতে থাকে। যা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অথবা প্রেম-ভক্তির বিষয় থাকার কথা তাই সর্বজনীন হয়ে বিপদের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। বিপদে আপদে, দুর্দিনে-দুশ্চিন্তায়, ভয়ে-অসহায়তায় যেখানে নিজ নিজ অন্তরের বিশ্বাসের ঈশ্বরকে ডাকা বা স্মরণ করে ভরসা পাবার কথা, সেখানে অন্যদের বিশ্বাসের আক্রমণ ডেকে এনে খুন খারাপি প্রাণ হত্যা হয়। মানুষের ইতিহাসে বার বার এই প্রমাণ দেখা গেছে। মানুষ বার বারই জেনেছে যে দেবতা থাকেন অন্তরে, মানুষের ব্যক্তিগত বিশ্বাসের অন্তরালে, ভক্তির অনুভবে, প্রেমের উপাসনায়। কিন্তু তবু বারেই সেই অন্তরের দেবতাকে সর্বজনের মাঝে এনে ধুমধাম করে উৎসব করছে। কেন? কার প্রয়োজনে? নিশ্চয়ই ব্যক্তির প্রয়োজনে নয়, ধর্মের প্রয়োজনে নয়, দেবতার প্রয়োজনেও নয়।

জন্মায়? উপসর্গ যেমন অসুখ বা অন্যায় নিয়ে আসে, তেমনি এ ক্ষেত্রেও কি কোন উপসর্গ যুক্ত হয়ে গেছে? সেই উপসর্গই ধর্মের অর্থ-তাৎপর্য-স্বরূপকে উৎপাটিত করে কোনো শক্তি-ক্ষমতা-স্বার্থ কেন্দ্রিক করে তুলেছে?

হতে পারে। বর্তমান মনের ভয় আর অসহায়তার ভিতে পূর্বতন পরাক্রম, অন্ধবিশ্বাস, কুসংস্কার, ইত্যাদির পাকাপোক্ত ভীত তুলিতে আঁকা মুখোশ-এলাকিনা এঁটে দিয়ে আর নিজেদের মুখে নামাবলির মুখোশ আঁটিয়ে ধর্মগুরুদের নেতারা মাইক্রোওয়েভে ছবি ফেলছে। ঠিক ঠিক চালালে কাঙ্ক্ষিত-প্রার্থিত ছবি পড়ছে। ভক্তদের বাহ্যাবস্থা নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। সেখানেকে অনুবর্তিত নিয়ে নেতা-গুরুদের শক্তি-ক্ষমতা-স্বার্থ সিদ্ধির সার্টিফাইড অ্যানেকশন সম্পূর্ণ করা হয়েছে। মুখ দেখা যায় না, মুখোশের রমরমা চলছে।

প্রাণিজগতে বেঁচে থাকার সংগ্রামে সর্বনিম্নবাধার নীতি—আইন অব লিস্ট রেজিস্ট্যান্স—সর্বজনস্বীকৃত। এই বেঁচে থাকার সংগ্রাম বলতে বস্তুগত জগতের বাধা বিপত্তির কথাই প্রধান। দৈনন্দিন বাস্তব জগতেও এই নীতি সংসার-সমাজ-সভ্যতার ঘাত প্রতিঘাতে সমান সত্য। পাছে লোকে কিছু বলে, কি বলতে কি হয় কে জানে, ভেবেছিলাম বলব কিছু বলি নি—এসবই এই সর্ব নিম্ন বাধার নীতির বাস্তব উদাহরণ। বিপরীত-কে তো আমরা সকলেই এড়িয়ে চলি, এমন কি ছিটে বিপরীতের সম্ভাবনাকেও পাশ কাটিয়ে যাই। যতক্ষণ আমার গায়ে আঁচড়টি লাগছে না ততক্ষণ আমরা সম্ভাব্য বিপদ এড়াতে মৌন-ক্রিয়াহীন-বাক্যহীন থাকাই পছন্দ করি। সেই আইন অব লিস্ট রেজিস্ট্যান্স।

এবারে দেখুন এই সর্বজনগ্রাহ্য নীতিটি আমাদের ধর্মীয় জীবনে কী অসীম প্রভাব বিস্তার করে। আর তখনই দেখতে পাবেন কেমন অনায়াসেই আমরা নিজেদের ধোঁকা দিয়ে থাকি, ধোঁকা দিতে পারি। পাছে কেউ অন্যরকম কিছু ভাবে, যুক্তিহীন সংস্কারাচ্ছন্ন বলে দাগ দেয় তাই যুক্তিতর্কের ভয়ে ভয়ে আমরা একটা মুখোশ শক্ত করে মুখে এঁটে রাখি। ধর্মের ক্ষেত্রে দেব দেবী, ঈশ্বর ভগবান প্রভৃতি থাকবেই। বাস্তব জীবনের ক্ষেত্রে—যেমন সংসারে দাদা-দিদি, বাবা-কাকা, মা-মাসি মামা-মামু আছে এবং তাদের যথাযথ সমীহ করে চলতে হয়, বিপদ-আপদের সম্ভাবনা থাকলে নানান উপায়ে তাদের তুষ্ট রেখে নিজ নিজ কাজ হাসিল করতে হয়—যেমন অফিস-কাছারিতে তেমনি ছোট থেকে মাঝারি হয়ে বড় বড় কর্তারা আছে এবং তাদেরও সমীহ করে চলতে হয়, বিপদ আপদের সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে ভেবে হিসেব করে মেপে মেপে পা ফেলতে হয়—তেমনি ধর্মের এলাকাতেও আমরা কম হিসেবী নই। জন্মের পরে হয় ষষ্ঠী করি। যদিও জানি বাচ্চাদের যাবতীয় নিয়ম পালন করা, প্রতিষেধক টিকা ইত্যাদি নেওয়া আর পুষ্টিকর এবং প্রয়োজনীয় আহার আবশ্যিক কাজ, তবুও অকারণে ষষ্ঠীমাতাদেবীকে অসন্তুষ্ট করার ঝুঁকি নিতে চাই না। যদি সত্যি সত্যিই কিছু একটা হয়ে যায় শিশুর তাহলে? মানুষ কি সর্বজ্ঞ? কার্যকারণের সব জট-জটিলতা কি মানুষ জানে বলে দাবি করতে পারে? তাহলে? সবরকমের বিজ্ঞানসম্মত ব্যবস্থা গ্রহণ করেও কি বিপদ হয় না? হয়ে থাকে না? একটু পুজো দিলে কোন বিজ্ঞানের শাস্ত্রাদি অশুদ্ধ হয়ে যাচ্ছে?.......

হতে পারে, আত্মপ্রসাদ, উপলব্ধি এবং ইত্যাদি। সামাজিক অনুষ্ঠান, ধর্মীয় অনুষ্ঠান আলাদা আলাদা। কিন্তু দীর্ঘ দিন পাশাপাশি চলে চলে একের সঙ্গে অপরের মিশামিশ ঘটে গিয়ে সামাজিক

ধর্মীয় আবার ধর্মীয় সামাজিক অনুষ্ঠান একাকার হয়ে যেতে পারে, যায়ও। হয়ত বিয়ের সময়ে নিজেরা সারলে সামাজিক, কিন্তু যদি পুরোহিতকে ডেকে আনা হয় তাহলে বুঝতে হবে সামাজিক-ধর্মীয়। অন্নপ্রাশন-উপনয়নের বেলাতেও তাই। তবে ভিত্তিতে তফাত। উপনয়নে পৈতে বা যজ্ঞসূত্রের ব্যবস্থা থাকায় শুধুমাত্র আচার্য-সমীপে উপনীত হওয়ার বা কল্যাণের ব্যাপারটা ছাড়িয়ে পুরোহিতের হিত সাধনের ব্যাপারটা ঢুকে পড়েছে, ধর্ম পথ খুঁজে নিচ্ছে। ধর্মের দিক থেকে অকারণ, অপ্রয়োজনীয় জেনেও আমরা, 'বোকারা', সেই ধর্ম প্রবেশের পদ্ধতিকে গ্রহণ করে নিয়ে থাকি। কেন? সেই একই উত্তর। কেন শুধু শুধু ......যদি কিছু হয়? বলা তো যায় না। সব কিছুই কি আমরা জানি? বিজ্ঞান........ইত্যাদি।

বিশ্ব প্রকৃতির মধ্যে দেবতাকে দেখতে পাই না, গাছ-পালা পশু পক্ষীদের মধ্যে ঈশ্বরকে খুঁজি না [যখন খোঁজা দেখেছে এবং যারা খুঁজেছে তখন মানুষ ছিল অন্যরকম, সময় ছিল অন্যরকম], খুঁজি না পাড়া প্রতিবেশীদের মধ্যে, মানুষের মধ্যে, আর্তজনের করুণ প্রার্থনায়। দেবতাকে খুঁজি পীঠস্থানে, তীর্থস্থানে, মন্দিরে মন্দিরে। সময়ের অভাব পড়ে যাওয়ায় এখনকার ব্যস্তসমস্ত মানুষ তাকে খোঁজে রাস্তার মোড়ে মোড়ে, বটতলায়-গাছতলায়, সিঁদুর লেপা নুড়ি পাথরে, ধুনি জেলে বসে থাকা ভস্মদেহ জটাধারীর পদতলে, ছিমাইর দোরে। এদের সকলকেই আমরা গড় করি, সমীহ করে চলি, করজোড়ে নতজানু নতশির প্রণামটি জানিয়ে যাই। কেন? ভাল কিছু হোক-না-হোক এরা তো ইচ্ছে করলেই মন্দটা ঘটাতে পারে। একটুখানি বিনম্র ভক্তি দিলে যদি মিটে যায় তাহলে কেনই বা তা করব না? সেই একই কারণে—সর্ব নিম্ন বাধার নীতির কারণে—তামার থালায় বা চাদরের বুকে বা পার্বণীর বাক্সে টাকাটা-সিকেটা ফেলে দিয়ে থাকি।

এটা শুধু নিজেকে ধোঁকা দেওয়া নয়, দেবতাকেও ফাঁকি দেওয়া। বিশ্বাসের ব্যক্তি নির্ভর দেবতাকে সমাজের সামনে, সকলের সমক্ষে সার্বজনিক চেহারা দেওয়ার প্রক্রিয়ায় মদত দেওয়া। সাম্প্রদায়িক হুড়োহুড়ি, যত্রতত্র দেবস্থানের পত্তন, টুং-টাং খুচরো পয়সার ধ্বনি ভক্তের সিমফনি। জননেতা রাষ্ট্রনেতা এবং ধর্ম-নেতারা একাসনে বসে, পাশাপাশি বসে দেবতাকে নিয়ে যে যার প্রয়োজন মতো কার্য সিদ্ধির প্রথা প্রকরণ স্থির করতে লেগে যায়। কার্য সিদ্ধির অন্তরালবর্তী উদ্দেশ্যটি থাকে সংগোপনে মনের গভীরে, কিন্তু প্রত্যেকেই এক একটি মুখোশ এঁটে জনগণের প্রয়োজনের পূরণ ঘটাতে ব্যস্ত হয়ে পড়ে।

একই কারণে জনগণ দেবতাকে নিয়ে ভয়ে বিহ্বল, আবার নেতারাও সেই কারণেই দেবতাকে নিয়ে মশগুল। লাইন অব লিস্ট রেজিস্ট্যান্স—সর্বনিম্ন বাধার নীতির কারণে। সাধারণ মানুষ ভয়ে ভয়ে সব দেবতাকে তুষ্ট রাখতে চায়—'কি জানি কি হয়'-এর মতো সংশয় আর 'বিজ্ঞান কি সব জানে?'-র মতো সন্দেহ নিয়ে সে পথে পথে, মোড়ে মোড়ে মন্দিরে-দেউলে ভেট চড়াতে চায়। বিশেষ যারা, নেতা যারা, তারা মানুষের এই সহজতম, আবেগতাড়িত, অপযুক্তিসমর্থিত বিশ্বাস আর ভয় কে, অসহায়তা আর নানাভাবে, খাটিয়ে কাজে লাগাতে চায়, লাগায়। ইতিহাস। অতীতের, বর্তমানের।

তাই তো [illegible]—নিজেকে জান-এর পাশাপাশি যে ঈশ্বর মত—নিজের দেবতাকে জান-টাও জোর হওয়া উচিত। মুখোশের আড়ালে নিজেরাও হারিয়ে যাচ্ছি, দেবতাকেও হারিয়ে ফেলেছি। মানুষ নিজেকে হারাচ্ছে বাইরের আমিটাকে তাড়া করে আর দেবতাকে হারাচ্ছে ভিতর থেকে বাইরে

বার করে নিয়ে। যা আছে তার নিজের ভিতরে সেই পরশ পাথর খুঁজতে খ্যাপার মতো দিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে মানুষ নিজের যে ধর্ম সেই মনুষ্যত্বকেই খুইয়ে বসছে। দেবতার ধর্ম তাকে নিজের্নিজের বাইরে টেনে নিচ্ছে। সেই টানে মানুষের ধর্ম থেকে সে চ্যুত হয়ে যাচ্ছে। এটাকেই বলেছি তার ভয়ের লিপি, তার অসহায়তার লিপি, নিজেকে উদ্ধার করতে নিজেকে জলাঞ্জলি দেওয়ার ধর্মকর্ম।

প্রত্যেক মানুষের যেমন একাধিক পোশাক থাকে তেমনি থাকে একাধিক মুখোশ। সে দ্বিচারী, ত্রিচারী বহুচারী। দ্বিচারী বহুচারী। দ্বিভাবের স্বনচরিত্র—ভূমিসিদ্ধি—তার স্বভাবের অঙ্গ। এই খলতা এই চালাকি সে তার নিজের সঙ্গে তো করেই, এমন কি তার দেবতাও বাদ যায় না। ধর্মকে সে তাই ফিনাইল, ডেটল, মারকিউরিওক্রোম হিসেবে ব্যবহার করতে পারে। অথবা মজাভঙ্গের ছিটে। অন্যায় কাজ করতে তার বাধে না, অনুচিত কাজ সে জেনে শুনেই করে থাকে, পাপ কাজে অনায়াসেই লিপ্ত হয়। তার পরে সময় করে দেবতার কাছে গিয়ে পুজো দেয়, মানত শোধ করে, স্নান করে শুদ্ধ-বস্ত্র ধারণ করে মুক্ত হয়। চোর, জুয়াচোর, খুন-জখম, নারী নির্যাতন-ধর্ষণকারী ঠগ-গুণ্ডা-বদমাইশের সংখ্যা যতো বাড়ছে দেবস্থানে ভেট চড়ানোর ভিড় ততোই বেড়ে চলেছে। কেটে-ছিঁড়ে গেলে যেমন আমরা ডেটল-আইওডিন লাগাই তেমনি মনে অন্যায়-অশুচি-পাপের ছোঁয়া লাগলে দেবতার আশীর্বাদী লাগাই।

পাছে বিশ্বাসীরা, ভক্তরা তেড়ে আসে তাই সময় থাকতে একটা বিজ্ঞানের চাল সামনে তুলে ধরতে চাই। আমাদের প্রত্যেকের মনেই যে ভয় আছে, অসহায়তার বোধ আছে, সংশয়-সঙ্কটের যন্ত্রণা আছে তা নিয়ে কোন দ্বিমত নেই। এদের মধ্যে ভয়টা প্রধান, কোথাও কারণ হিসেবে কোথাও বা ফল হিসেবে। বহুপ্রকারের ভয়েই আমরা ভীত। সেই সব ভয়কে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। জৈবিক ভয় আর মূল্যবোধের ভয়। বেঁচে থাকার জৈব সংগ্রামে, তেল-তন্ডুল-চাকরি-ব্যবসায়ের বিচিত্র বিভিন্ন ঘাত-প্রতিঘাতে সদাসর্বদার 'কি হয় কি হয়' ভয়। এই ভয় আবেগের মূলে ঘা দেয়, তীব্র হলে নালিকা-বিহীন গ্রন্থির রস ক্ষরণে রক্তচাপ-প্রবাহে হেরফের ঘটায়। শরীর-মনের সেই ভয়-ভীত অবস্থা থেকে সদ্য মুক্তির জন্যে—অল্প-স্বল্প হলে মায়ের নাম স্মরণ করি বাবার সাহায্য চাই—কিন্তু বেশি মাত্রায় ভয় হলেই ভগবান, ঈশ্বর। যার যেমন বিশ্বাস-ভক্তি সে তেমন তেমন দেবতাকে বিপদ উদ্ধারিনী বলে ভয়ের বৈতরণী পার হতে চায়। দেবতা-ঈশ্বরে এরা চব্বিশ ঘণ্টা তিনশ পয়ষট্টি দিন নিরত-নিরত থাকে না। বিশেষ বিশেষ দিনে এবং কারণে এরা পট্টবস্ত্র পরিধান করে ভেট-নৈবেদ্য হাতে উপস্থিত হয়। নির্ভয় হবার জন্যেও বটে, ভবিষ্যৎ কোনও অপকর্মের কাঙ্ক্ষিত সাধনে আগাম ভেটও বটে। এই ভাবে মানুষের মনের দেবতার দেবতাকে লোভী, প্রিয়-পোষক এবং কাণ্ডাকাণ্ডজ্ঞানহীন বলে প্রতিভাত করে তুলেছে। দেবতাকে তার নিজের আসন থেকে নামিয়ে এনে বড়বাবুর আসনে, অফিসের নির্দয় প্রধানের ভূমিকা দেওয়া হয়েছে। এখানে শিক্ষিত-অশিক্ষিত, গ্রাম-শহরের ভেদাভেদ নেই। মানুষ নিজেকে প্রকাশ করছে দেবভাবে ভাবুক বলে, কিন্তু মনের গভীরে যে তার নিজ-টুকু আছে সে জানতে পারছে কতো নিপুণ তার বাইরের মুখোশখানা।

দ্বিতীয় ভয় হল মূল্যবোধের ভয়, আদর্শের ভয়। এই ভয়ে মানুষ যখন ভীত হয় তখন তার কোন জৈব উপাদানে চাপ পড়ে না, তাপ বাড়ে না। তখন সে সামঞ্জস্যকে খুঁজতে চেষ্টা করে, যুক্তি-বিবেচনার চেতন দিয়ে সত্যকে, মঙ্গলকে, সুন্দরকে জেনে চিনে নিতে চায়। এই জন্যে তার

কোনও দেবতাই অনিবার্য নয়। নিজের অন্তরের মধ্যে যে উচিতকে, সামঞ্জস্যকে, সংহতিকে অন্বেষণ করতে থাকে। যদি সেই মূল্যবোধ স্থির হয়—এই জিজ্ঞাসু ব্যক্তিদের ক্ষেত্রে—তাতেও কোন ক্রিয়া-কর্ম-বিধির নিয়ম লাগে না। ভেট-নৈবেদ্য তো নয়ই। এদের কোন ভেকও ধারণ করতে হয় না। একচারী এ ধরনের মানুষের সংখ্যা হাতে গোনা যায়। বাকি সবাই জন্ম-ভয় মরণ-ভয়, কি-হয় কি-হয় ভয়ে ভীত বলেই স্থির বিশ্বাসী, দেবতার স্থান-অন্বেষী, ভেকধারী ভেট-নৈবেদ্য-দত্ত হতে বাধ্য। মুখোশের বাজার তাই জমে উঠেছে। ঠক বাছতে গাঁ উজাড়!

ভয় পেলে পলায়ন অনেকক্ষেত্রেই স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া। জৈব স্তরে সর্বকালে। প্রাণিজগতে ভয়-পলায়নের ভূরি ভূরি উদাহরণ ছড়িয়ে আছে। মানুষের ক্ষেত্রেও এর অন্যথা হবার কথা নয়, হয়ও না। শিশুর যে কোনও ভয় পেলেই যে আমরা মায়ের আঁচল বা বাবার কোল খুঁজি তা আমাদের জৈব প্রাকৃতিক কারণেই ঘটে। অভ্যস্ততা বা প্রকৃতিজ উত্তরাধিকার। একই ভাবে বাল্যকালে মা-বাবার ভয়ে দাদু-দিদিমার কোল খুঁজি, দাদা-দিদির ভয়ে ঘরের কোনো কোণ খুঁজি অথবা মা-বাবার আশ্রয়। আবার ঘরের ভয়ে বাইরে চলে যাই, বাইরের ভয়ে ঘরে ফিরে আসি। ভয় আমাদের তাড়িত করে, কোনও কোন অন্বেষণে বাধ্য করে, আশ্রয়ের সন্ধানে উদগ্র করে তোলে। এই মানসিক-জৈব উত্তরাধিকার নিয়ে আমরা যখন বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রবেশ করি, প্রতিনিয়ত বিরুদ্ধ-বিপরীত সংসার-সমাজ-প্রকৃতির ঘূর্ণিজালে জড়িয়ে পড়ি তখন সেই প্রকৃতিজ অভ্যস্ততার সঙ্গে আর একটা অভ্যস্ততা, অন্য একটা উত্তরাধিকার যোগ হয়ে যায়। এটাই ধর্মের আঁচল, দেব দেবীর আশ্রয়।

নিত্য নৈমিত্তিক আপদ-সংকটে আমরা অপেক্ষাকৃত বড়দের কাছে যাই। যাই সান্ত্বনার আশায়, আশ্রয়ের বাসনায়, প্রশ্রয় পাবার কামনায়। ছোট ছোট ভয়ের বেলায় তুলনামূলক বড়কে খুঁজি—দাদা-দিদি, মা-বাবা, শিক্ষক-অধ্যাপক, সম্পাদক-সভাপতি, স্থানীয়-জেলা নেতা। অথবা মা ষষ্ঠী, মা শীতলা, ইতু-মনসা। একই সঙ্গে ওঝা-বৈদ্য ডাক্তার-হেকিম জলপড়া-পান-পড়া-তেল-পড়া চলতে পারে। ভয়-বিপদের কারণ জানা থাকে না বলেই ফল লাভের আশায়—কার্যের আশায়—সব সম্ভাবনাই খোলা রাখতে চাই, 'অপশান' কোনটাকেই ছেড়ে রাখতে মন বল পাই না। কিন্তু যখন সংকট তীব্র হয়, ভয়-বিপদ অস্তিত্বের ভিত ধরে নাড়া দেয় তখন আর এ-সবে কুলোয় না। বড় ভয় অধিকতর বড় আশ্রয় চায়। শিব-কালী-দুর্গা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর পর্যন্ত ছুটোছুটি পড়ে যায়। [অফিস-কাছারিতে যেমন ছোটবাবু-বড়বাবু ছাড়িয়ে সেক্রেটারি-মন্ত্রী পর্যন্ত দৌড়ায় অনেকটা তেমনি।] লৌকিক বৃহৎ 'দেবতা'-দের কাছে পৌঁছাতে যেমন কাণ্ডারী লাগে, পথ প্রদর্শক দরকার হয়, তেমনি অ-লৌকিক দেবতাদের আশ্রয় পেতেও কাণ্ডারী লাগে, পথ-প্রদর্শকের দরকার হয়। দালাল বলা ঠিক হবে না, এজেন্টস বললে খুব ভুল হবে না, কিন্তু অলৌকিকের সন্ধান দেয় বলে, অলৌকিক শক্তির বরাভয় আদায় করে দেয় বলে এদের অন্য নামে পরিচিত হতে হয়। এরা সকলের হিত করে বলে, পুরবাসীদের মঙ্গল সাধনই এদের একমাত্র লক্ষ্য বলে এরা পুরোহিত। ভিন্ন ভাষায় এবং ক্ষেত্রে এদের ভিন্ন নাম থাকতেই পারে, যেমন ব্রহ্মপুত্র—সাংপো এদের চরিত্রের এবং স্বভাবের কোনও হেরফের হয় না, যেমন ব্রহ্মপুত্র নদের হয় না।

ভয়ে মুহ্যমান পলাতক মানুষদের নিয়ে যারা কারবার করে তাদের ভাষা ব্যবহার রীতি নীতি মুহ্যমানদের থেকে স্বভাবতই স্বতন্ত্র হওয়া প্রয়োজন। অমর এবং মরণশীলদের মধ্যস্থ-গোষ্ঠী পেশায়

পদাতিকে সুশৃঙ্খল রাখতে হয়, জোতদারকে অনুগত রাখতে নির্যাতনে লুকিয়ে রাখতেই হয়। উকিলদের মুখোশ তাদের শামলা-আমলা, [সততার বর্ণহীন নিরপেক্ষ বাবহারে ও নির্ভর সামলার লজ্জা কিছু অসততার অথবা ক্লায়েন্ট-সাপেক্ষ সততার কার্যমুখটি আড়াল করেই কোথাও সোনালী কৃষ্ণবর্ণ—ডার্ক ডিভস আর কোর্টের হাল আওয়ার (হিম) ডার্কনেস।] পুলিশের মুখোশ তার ইউনিফরম [জনগণের সেবকদের সহজে চেনার জন্যে যে ইউনিফরম তাই পোষাকের মালিককে ভিতরে আড়াল করে রাখে।] লাল কৌপীন, গেরুয়া উত্তরীয়, দীর্ঘ টিকি, রামনাম নামাবলি অথবা ভস্মময় দেহ—সবই ইউনিফরম।

পলায়ন একটা ডিফেন্স মেকানিজম। আত্মরক্ষার জন্য পলায়ন, লুকিয়ে পড়া, আত্মরক্ষা নেওয়া। আক্রমণও একটা ডিফেন্স মেকানিজম। আত্মরক্ষার জন্য প্রত্যাঘাত, উত্তেজিত শক্তির প্রদর্শন, ঝাঁপিয়ে পড়া ইত্যাদি। ভয় ব্যক্তিকে নষ্ট করে, উদ্ধতও করে। প্রথম প্রতিক্রিয়ার ধর্মের মুখোশধারীদের লাভ, দ্বিতীয় সমাজরাষ্ট্রের নেতাদের। এখন সেই কথাতেই আসা যাক।

(৫) মুখোশের অন্তরালে সমাজ ও রাষ্ট্রনেতা :

একটু ভূমিকার দরকার। কাজ আদায় করার জন্য তিনটি পথ সবাই জানে। এক, ভুলিয়ে ভালিয়ে কাজ আদায় করা, দুই, বুঝিয়ে-বাঝিয়ে এবং তিন, ধমকিয়ে-ধামকিয়ে। সবাই জানে, কারণ সকলকেই শৈশব-বাল্যকাল পার হতে হয়, তরুণ-যৌবন সময় অতিক্রম করতে হয় এবং এক সময় অভিভাবক-বয়স্ক-বৃদ্ধের ভূমিকা পালন করতে হয়। তাই এই সামান্য-সার্বিক ত্রিবিধ পদ্ধতি সকলেরই জানা—অনুভবে, প্রত্যক্ষ এবং প্রয়োগে জানা। সংসারের মধ্যে, সংসারের প্রয়োজনে এবং সামাজিকীকরণের ধাপে ধাপে এই জানাটা অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যায়, স্বাভাবিক-স্বীকৃত ঠেকে। এর প্রধান কারণ বোধহয় এই যে প্রতি ক্ষেত্রেই, প্রত্যেক ধাপেই উদ্দেশ্য হিসেবে যা উপস্থিত থাকে তা ব্যক্তিস্বার্থের পঙ্কে নিকৃষ্ট থাকে না, অন্যায় উচিত-অনুচিত, ভাল-মন্দ বোধের দ্বারা চিহ্নিত থাকে। অর্থাৎ একদিকে থাকে এই ত্রিবিধ প্রক্রিয়া অন্য প্রান্তে থাকে স্বীকৃত-স্বাভাবিক উদ্দেশ্যের দিক নির্দেশ। যে বা যারা থাকে মাঝখানে, প্রক্রিয়া-পদ্ধতি প্রয়োগকারী হিসেবে, তারা তাই সন্দেহজনক বলে অনাদৃত হয় না। দৈনন্দিন জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই এই পথগুলো, প্রক্রিয়াগুলো জানত বলেই প্রয়োগকারীকে বড়ো বলে, প্রধান বলে, নেতা-কর্তা বলে মান্য করার রেওয়াজ আছে। স্বামী-স্ত্রী, পিতা-পুত্র, দাদা-ভাই, শ্বশুর-জামাই, বয়স্ক-তরুণ, সভাপতি-সদস্য, গ্রামপ্রধান-গ্রামজন — ইত্যাদির বেলায় ব্যাপারটা সহজেই চোখে পড়ে — সংসারে, সমাজে, অনুষ্ঠানে।

এবারে দেখুন এই ত্রিবিধ প্রতিক্রিয়াই কেমন অন্যরকম হয়ে যাবে যখনই উদ্দেশ্য সার্বিক-সামান্য না থেকে স্বার্থজুষ্ট-ব্যক্তিস্বার্থ চিহ্নিত হয়ে যাবে। তখনই সুরকণের পরিবর্তন ঘটে যাবে। প্রথম পরিবর্তনে শব্দগুলোই পাল্টে যাবে। ভুলিয়ে-ভালিয়ে না বলে বলা হবে ধোঁকা-বাজি করে, বুঝিয়ে-বাঝিয়ে ব্যাপারটা হবে ব্রেন-ওয়াশ বা মস্তিষ্কশোধন, আর ধমকিয়ে-ধামকিয়ে না বলে বলা হবে ব্ল্যাকমেল করে অথবা স্বার্থের-বাঁধের নাকে দড়ি দিয়ে অনুগত রাখা। শব্দ ব্যবহারে এই যে পরিবর্তন ঘটবে তা দ্বারা তাৎপর্যের পরিবর্তন বোঝানো হবে। দ্বিতীয় পরিবর্তনে প্রক্রিয়া প্রয়োগকারী ব্যক্তিটি অনিবার্য নেতা হয়ে যাবে, থেকে থাকবে। যে যেমন নিপুণ, কুশলী এবং অবিমিশ্র সে তেমন পর্যায়ের নেতা হয়ে উঠবে।

নেতা হবার প্রথম পাঠে এই সর্বজনস্বীকৃত মনোবৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ার যথাযথ ব্যবহার সাফল্যের সঙ্গে যোগ হবে সর্বজনকে, জনগণকে, উপযুক্তভাবে ব্যবহার করতে পারার কুশলতা। এই ব্যবহারের কথা ব্যাপারটা কেমন? এখানেও সেই স্বাভাবিক এবং বিকৃত প্রকাশ আছে। কাউকে দিয়ে কাজ করানো আর কাউকে কাজে লাগানো — ব্যক্তির যোগ্যতার বিচারে কাজ ন্যস্ত করা আর ব্যক্তিকে যন্ত্রের মতো, অস্ত্রের মতো ব্যবহার করার মধ্যে যে তফাত সেই তফাত। প্রথমটা স্বাভাবিক-স্বীকৃত, দ্বিতীয়টা অ-স্বাভাবিক বিকৃত। এখানেও সেই সংসার-সমাজের প্রেক্ষিতে দেখুন। — বাবা, এক বাটি দুধ এনে দেবে? দোকান থেকে দশটাকার চিনি এনে দেবে? এই অঙ্কটা একটু দেখিয়ে দেবে? চিঠিটা পোস্ট করে দিও, প্লীজ! — এমনতো হাজারো কাজ হাজারো জনকে দিয়ে করানো যায়, করানো হয়ে থাকে। এটা স্বাভাবিক-স্বীকৃত। যে বলছে বা কাজে লাগাচ্ছে আর যাকে বলছে বা যাকে কাজে লাগান হচ্ছে তাদের দুজনের মধ্যে কোনও ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ নেই। সেই অবকাশ ঘটলেই দেখা যাবে মানসিক বৈপরীত্য-বিস্ফোরণ ঘটছে — আমি কি তোমার চাকর? তোমার ব্যাট-ম্যান? পিওন? — ইত্যাদিতে উদ্গার ঘটবে। নেহাত ওয়েভ লেংথ না মিললেই ক্ষতি এবং 'সরি'-দুঃখিত-লজ্জিত ইত্যাদির প্রকাশ ঘটে যাবে। তখনই বোঝা যাবে যে এখানে যন্ত্র বা অস্ত্র হিসেবে ব্যবহারের মানসিকতা ছিল না। এসবই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতা, তাই বলেছি স্বাভাবিক।

এবারে দেখা যাক এর বিকৃত রূপটি কেমন। মনের গভীরে গুপ্ত অভিপ্রায়টি লুকিয়ে রেখে, গোপন রেখে, যখন কোন সর্বজন বা বহুজন সমর্থিত উদ্দেশ্যকে সামনে তুলে ধরা হয় এবং সেই উদ্দেশ্যে ব্যক্তিকে বা গোষ্ঠীকে কাজে লাগান হয় তখনই তা বিকৃত ব্যবহার। দাদাগিরিতে অভিনিবিষ্ট হাত, প্রতিষ্ঠিত হাত অনেক দাদাই এই পদ্ধতি বেছে নিয়ে থাকে। — দোকানে দোকানে চাল ডাল নুন তেল সংগ্রহ করে কাঙালী ভোজনের ব্যবস্থার প্রতিটি পর্বে পর্বে কিশোর-কিশোরীদের সঙ্গে সঙ্গে নিয়ে ফেরা এবং অবশেষে ভোজনান্তে জয়ধ্বনি পর্যন্ত সব ব্যাপারটাই একবার ভেবে দেখুন। মনে গোপন অভিপ্রায়টি অনেক পরে ধরা পড়ে, উদ্দেশ্যটি নেতাকে তৈরি করে দিতে থাকে। কারণ কাঙাল-ভোজনের উদ্দেশ্যের মধ্যে তো কোনও অসমর্থনযোগ্য হেতু নেই। তেমনি শত শত কচিকাঁচার হাতে পতাকা ধরিয়ে দিয়ে, ঘাড়ে ফেস্টুন চাপিয়ে দিয়ে যে সব পদযাত্রা ইদানিং পথেঘাটে দেখা যাচ্ছে তার উদ্দেশ্য মহৎ হতে পারে, কিন্তু সেই উদ্দেশ্যের 'উ'-বিষয়েও যাদের বিন্দুমাত্র বোধ নেই তাদের নিয়ে কেন? ছবির জন্যে, ডকুমেন্টারি এভিডেন্স? খবরের কাগজে লক্ষ লক্ষ পাঠকের চোখে হাজির হবার জন্যে? অথবা টেলিভিশনের পর্দায় ভেসে উঠতে? নিরক্ষরতা সামাজিক অপরাধ, নিরক্ষরতা জাতীয় বিচ্যুতি, কলঙ্ক। ঠিক। কিন্তু স্কুলে একদঙ্গল ছাত্রছাত্রীকে সারিবদ্ধ চলনে, সাক্ষর-অধ্যুষিত এলাকার সম্পদ-সমারোহে, প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন-স্লোগানে উচ্চকিত উচ্চকণ্ঠ করে পথ পরিক্রমায় নিরক্ষরদের কোন উপকার করা হয়? একইভাবে গ্রামের দূষণ তাড়াতে, পেট্রোলের অপচয় রোধ করতে আর প্রকৃতির সবুজকে ফিরিয়ে আনতে মানব পরিবারের সবুজদের নিয়ে যে অবরে-সবরে টানাটানি চলে, চলছে, তাতে কার উপকার বেশি হচ্ছে?

বলা যেতে পারে 'ক্যাচ দেম ইয়ং' — শিশুমনের নরম জমিতে ভবিষ্যতের ছাপ ফেলে ফেলে সচেতনতার বীজ বপন করা হচ্ছে। অবহিতি অবশ্যই সচেতন করে। শৈশবের ছাপ হারিয়ে যায় না, মুছে যায় না। সেই অবহিতি চেতনার কেন্দ্র বা আশপাশ থেকে কি প্রতিক্রিয়া তৈরি করবে,

কোনদিকে ঠেলে দেবে, তা কি সেই অবহিতির উপর নির্ভর করে? প্রতিক্রিয়া নঞর্থক হতে পারে সদর্থক হতে পারে। সেই হওয়াটা নির্ভর করে — কচি মনের বাতাবরণে নয়, নির্ভর করে কঠিন-কঠোর নির্মম-নিষ্ঠুর অনড়-অচল সামাজিক প্রেক্ষিতের উপর। ধরে রাখার মতো ধারক, ধারণ করার মতো ধর্ম, স্থির-লক্ষ্য হবার মতো কোন আদর্শ যদি না থাকে তাহলে এই অবহিতিই ভবিষ্যৎ জীবনে পদক্ষেপকে সহজেই পিছল করে দিতে পারে। অবহিতি থাকলেও পারে, না থাকলেও পারে। যৌন-শিক্ষার বেলায় আমরা কৃপণ, পর্ণোগ্রাফির বেলায় লৌহ-কঠিন সিন্দুক-মন। অবহিতির সেই এলাকায় পদযাত্রা নেই কেন? অত্যন্ত স্পর্শকাতর অনুপ্রবেশকারী এলাকায় কচিকাঁচাদের ব্যবহার করতে সাহস নেই বলে নয় কি? টিকা-ভ্যাকসিন বিষয়ে কি এক-নয় মাসের শিশুকে সচেতন করে তুলতে হবে? না-কি মা-বাবাকে, যারা কাজটি করবে, তাদের? টার্গেট-সম্প্রদায়কেই তো সচেতন করে তোলার কথা? কনডোম ইত্যাদি পরিবার-পরিকল্পনার প্রচারে এইসব কচিকাঁচাদের কেন প্ল্যাকার্ড-ফেস্টুন-স্লোগান চলনের ব্যবস্থা করছি না? বড় হলে এসব বিষয়ের সচেতনতাও তো ওদের কাজে লাগবে!

তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পারছেন যে সামনে যে উদ্দেশ্য টানটান মেলে ধরা আছে তার পিছনে কোন-না-কোন গভীর অভিপ্রায় গোপনে-গোপনে সচল আছে। ব্যবহার করা হচ্ছে, যন্ত্র বা অস্ত্র হিসেবে। মানুষকে একটা 'এন্ড' বলে মান্য করার কথা ধর্মে-দর্শনে-নীতিশাস্ত্রে বলা আছে। নেতৃত্বের শাস্ত্রে অবশ্যই সে 'এন্ড' নয় 'মিন্স' মাত্র; অভিপ্রায় সিদ্ধির হাতিয়ার। নৈবেদ্যের থালায় পরিবেশিত অথবা সুপ্ত অভিপ্রায়ের হাড়িকাঠে বলিপ্রদত্ত সংখ্যা মাত্র। নির্দয়, কিন্তু সত্য।

এটাই নেতৃত্বের পথে দ্বিতীয় পাঠ। এই অভিপ্রায় গোপন রেখে উদ্দেশ্যকে টান টান সামনে ধরে রাখার অনুশীলন, প্রয়োগ এবং কুশলতা। ভিতরের মুখখানা যেন কোন অবস্থাতেই দৃশ্যমান না হয়। সেই মনের-মুখের ভাব-কম্পন শঙ্কা-সংশয় উত্তাপ-ঔৎসুক্য যেন মুখাকৃতিতেও মুখ-মুখোশের স্নিগ্ধ-শান্ত চেহারায় আভাসিত না হয়, দৃশ্যমান না হয়। প্রাণিকুলে বকেরা আদর্শ নেতার মূর্তি। আপাদমস্তক শুভ্রতায় মোড়া শান্ত সমাহিত ধ্যানমগ্ন অবস্থান। অভিপ্রায়টি সংগোপনে মনের গভীরে টা প্রাপ্ত। কিন্তু নরকুলে নেতারা দ্রুত চলমান ধাবমান। অনুগতদের কাছাকাছি থাকাটা নেতা কর্তাদের নিত্যকর্মবিধির মধ্যে পড়ে। সশরীরে না হলেও অন্য-শরীরে অন্তত তেমন তেমন স্থানে অথবা আশেপাশেই থাকতে হবে। এটা যে কোনও মাধ্যমেই হতে পারে — পুলিশ হোক, ক্যাডার হোক, ক্ষমতার অলংকরণের ছিটেফোঁটা দিয়েই হোক। মোট কথা নেতাকে মানুষের মতো হতেই দেখতে হবে এমন কথা নেই। প্রবচনের মতো রাজাসুলভ কর্ণেল হলেই যথোত্তম, সর্বোত্তম। ঝক্কি ঝামেলা কমে যায়, গায়ে আঁচ লাগে না। জামাই সতো একই সঙ্গে পোষ্যদেরও সন্তোষ বিধান হয়, তারা গুরুত্ব বোধে স্ফীত হতে পারে। আবার সমাধানও ভেবেচিন্তে অভিপ্রায়ের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে দেওয়া চলে।

নেতৃত্বের এই দ্বিতীয় পাঠে বেদান্ত ব্যাখ্যাত মায়াবাদের ললিত প্রয়োগ দেখা যায়। ব্যক্তির বেলায় যা অজ্ঞতা, সমষ্টির বেলায় তাই মায়া। এই মায়া দুই ভাবে কাজ করে — ঢেকে দিয়ে আর প্রকট করে দিয়ে। সত্যকে ঢেকে দেয়, 'কভার আপ' করে রেখে সত্যকে আড়াল করে তোলে। আর দ্বিতীয় ভাবে, দুই নম্বরী প্রক্রিয়ায়, অন্যতর কিছুকে সত্য বলে প্রতিভাত করায়, প্রকট করে দেখায়। অবশ্য যে কোন ইন্সটিটিউশনের ক্ষেত্রেই — রাষ্ট্র প্রশাসনের ক্ষেত্রেই — একথা সত্য। এমন কি

[illegible] এই এক [illegible] ও দুই [illegible]। '[illegible]' — [illegible] উঠিয়ে [illegible] করে। [illegible] এবং [illegible] চাই। তাই [illegible]। কিন্তু [illegible] হবে, [illegible] হতে হবে।

[illegible] নেতার [illegible]। [illegible], নির্দিষ্ট [illegible] — [illegible] এবং [illegible] হওয়া চাই। [illegible] তেমন [illegible] মনে হবে। [illegible] সেই [illegible] কাছে, [illegible] — মাঠে-ময়দানে, [illegible]।

এই ব্যাপারে যে যতো নিপুণ সে ততো বড় নেতা। এই [illegible] এবং [illegible] — [illegible] এবং [illegible] দুই [illegible] — এ [illegible] কাজ। যে পারে সে আপনি পারে, পারে সে নেতা হতে। এই [illegible] নেতার তৃতীয় পাঠ।

একটু [illegible] করা যাক। [illegible] নেতাদের [illegible], [illegible] ধরে [illegible]। [illegible] দুই [illegible] এবং [illegible] নেতার [illegible]। কিন্তু সব নেতাদের [illegible] সেই [illegible] একরকম। অনেকেই সেই [illegible] — [illegible] — [illegible] কাজ করে। কাজ করে [illegible] এই নেতাদেরও [illegible] হতে [illegible]। [illegible] থেকে [illegible] সেই সেই [illegible] নেতা [illegible]। আর এই যে [illegible] — [illegible]। [illegible] দুই থেকে [illegible] নেতা-[illegible] হয়। সেই [illegible] — [illegible], [illegible], [illegible] এবং [illegible]।

এই [illegible] কেন [illegible] না। [illegible] কেমন? [illegible] — [illegible] — [illegible] সেই [illegible]। [illegible] — [illegible]। [illegible] হবে, [illegible] — [illegible]।

শুধু সেটাই নয়, সবকিছুই আধুনিক নেতৃত্বের অনুর প্রতিভার পণ্য হয়ে গেছে — বুদ্ধি-মেধা-প্রজ্ঞা, বিজ্ঞান-প্রকৌশল-প্রযুক্তি। আর তার মধ্যে সেরা হতে গেলে অসমান প্রতিযোগিতা পার হতে হয়, প্রত্যেকের পণ্য বাজারে থেকে কিনে নিতেই হবে। বুদ্ধি বা চাতুরীই অনুশীলনের গুণ, মেধা নয়, প্রত্যেকের জন্য, প্রত্যেক বিষয়ের জন্য আইন-প্রেসিডেন্সি-বিশেষ সংযোগে থাকা চাই — প্রতিযোগিতা।

এই যে সর্ব-পণ্য-সর্বোত্তম বা গুপ্ত-নেতাকে প্রকাশিত-নেতার রূপান্তরিত করে তোলে, এই মনোভাবই প্রকারান্তরে আকাঙ্ক্ষার বিদ্রোহকারীর — মতাদর্শগত পরিস্থিতির জন্ম দেয়। অনিবার্য বাই-প্রোডাক্ট। অন্যভাবে, নেতৃত্বের কর্পোরেট-অসমাধানের উৎপত্তি। অন্যান্য দেশে শব্দের কোনো ধারাবাহিক নেতৃত্বের প্রধান গুণ বলে মনে করা হয়। আমাদের দেশে, ইতিহাস বাদ, খবর বানাতে যার মনোযোগ তারা কুকুরকে কামড়ানো নেই, মানুষ যখন মানুষকে কামড়ায়, তখনই তা খবর। অপ্রাকৃতিক হয়ে দুইয়ের কারণ-সেলিব্রিটিদের উৎপাদন উপাদানের ইতি হয়ে যায়। স্ব-আর্থিক দলেই দুটি পথ নির্দেশ — এবং সহজ হয়ে আসছে ছবি এবং স্মরণ-বিজ্ঞাপনী কাগজপত্র নয়।

একটা সময় ছিল যখন দীর্ঘ সাধনা আর দীর্ঘদিনের অনুশীলনেই সেরা হওয়া যেত, জনমনে স্বীকৃতি পাওয়া যেত, ইতিহাসের স্মরণে স্থান পাওয়া সম্ভব হত। খবরের মাধ্যমে বিজয় বটে মাধ্যম পরে পুরো ব্যাপারটাই অনাবশ্যক হয়ে গেছে। খবর এখন আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়তে পারে। একটা মারাত্মক প্রতিযোগিতা চলছে খবরের শীর্ষে থাকার অথবা খবরের শীর্ষে পৌঁছানোর। একটু এদিক-ওদিক হলেই বিস্মরণের অতলে নির্বাসিত হয়ে যাবার সম্ভাবনা, তেমনি একটু ভুল হলেই সম্ভাব্য শীর্ষারোহণ চিরতরে লুপ্ত হয়ে যেতে পারে। সাধনা আর অনুশীলন সময় সাপেক্ষ ব্যাপার। তাই সবাকাই, সব হাতেই, শর্ট-কাট খুঁজতে থাকে। সহজে কিস্তিমাতের সর্বোত্তম উপায় কি?

মনোবিজ্ঞানীরা বলেন মানুষের মনে বহু রকমের আগ্রহ আছে, বহু বিষয়ের প্রতি টান আছে। আত্মসংরক্ষণ, মুক্তবোধ, কর্মনিপুণতাবোধের প্রতি টান আছে। অর্থ-সম্পদ-সম্পত্তির প্রতি আগ্রহ আছে। আবার যা কিছু বিকৃত-বিরূপ তার প্রতিও আকর্ষণ আছে — 'অজানার প্রতি, পরকালের প্রতি, পর্নোগ্রাফির প্রতি। অন্য সব টান প্রকাশিত হয়ে যায়, অজানা-প্রীতি বহু কোলাহল। অন্য সব আগ্রহের উৎসে থাকে জানার-ইচ্ছা, বিচার-বিশ্লেষণ। বিকৃতির প্রতি যে টান তার উৎস আবেগ-উত্তেজনা। তাই গভীর, উত্তেজক এবং দীর্ঘস্থায়ী।

এই মনোবৈজ্ঞানিক সত্যের ভিতে কোনো অন্যায় সেরা একনিমেষেই জাতীয় স্তরে নিজের অস্তিত্ব বিদিত করে দিতে পারে। কাগজের প্রথম পাতার সংবাদ খবরের ঢেউ তোলে দেয়, রেডিও-টিভির প্রোগ্রামে যাতে সাথে এবং পত্রিকা প্রতিবেদন চেঞ্চ-ঘটনাক্রমে দিয়ে অন্যান্য চরিত্র এক অন্যরকম সেতু তৈরী দিয়ে জাতীয় বাজারে বিখ্যাত-কুখ্যাত হয়ে যেতে পারে। বিখ্যাত-খ্যাতরা যা কিছুই হতে পারে — ভক্তি-ধর্ম, রাজনীতি, বিজ্ঞাপন, সাজ-বুদ্ধি, আইনজ্ঞ-শাস্ত্রীয়, শিল্পী-আদর্শ এবং ইত্যাদি।

কিন্তু এই দুর্নীতি-বীরদের নেতৃত্বের পথ বড় ভয়াবহ, বড় দুর্গম। আমাদের পক্ষে নেতৃত্বের অবস্থা হয়ে যুদ্ধ ওঠা সহজ কথা নয়। অর্জিত অতীত কত উঁচুর চূড়ায় আসন পেতে দেয় কিন্তু সেখান থেকে নিজের আসনকে অতীব প্রচারের বলে টিকে থাকা চলে না পারা যায়। রাজনীতিকে

সেটাই কনস্ট্রাক্টিভিজম থেকে যায়। সেটাও অবশ্য কম আক্ষেপ নয়। বর্তমান সমাজে নিয়মিত নেতৃত্ব কৌপীনধারী-আত্মত্যাগী বলে পরিত্যক্ত। নেতৃত্ব বলতে এখন শক্ত নেতৃত্ব বোঝায়, শক্তির উপাসক। ক্ষমতার করায়ত্তে জেলের সুধা পানই নেতৃত্বের জীবনরেখা।

এখানেই চতুর্থ পাঠের মূল খুঁজে পাওয়া যায়। ক্ষমতার বণ্টনে, বিরোধীদের প্রতি যথাযোগ্য ব্যবহার — ক্ষমতার ব্যবহার, নিজের মই শক্ত করা এবং অপরের মই সরিয়ে নেওয়া। একাজটি মঞ্চের বাইরে থেকে করতে হবে — সূক্ষ্ম সুতোর নিপুণ ব্যবহার। যখন যখন মঞ্চের মাঝখানে দাঁড়াতে হবে তখন তখন জনকল্যাণের বাণী হয়ে অপাপবিদ্ধ কিন্তু জনগণের ভাবনায় উদ্বিগ্নমনা দেখাতে হবে। এই মঞ্চাভিনয় নেতৃত্বের চতুর্থ অনুশীলিতব্য পাঠ। এই পাঠে ক্ষেত্র প্রস্তুত করা আছে, ক্যাডার মস্তান-দাঙ্গাবাজ-ঠেঙাড়ে তৈরি করা আছে, যে কোন প্রয়োজনে — দাঙ্গায়, ভোট আদায়ে, অর্থসংগ্রহে, প্রতিপক্ষ নির্যাতনে — তাদের কাজে লাগান যাচ্ছে। আছে, কিন্তু নিজের হাতে যেন দাগটি না লাগে তা দেখার আছে। এটা একটা হাই-ট্রিক কলাকুশলতা।

প্রোলেটারিয়েট অব দি ওয়ার্লড ইউনাইট — বিশ্বের শ্রমজীবী মানুষ এক হও। অবশ্যই উত্তম ঘোষণা। অত্যন্ত প্রয়োজনীয়ও। ঐক্য না থাকলে, এক হতে না পারলে পতনই অবশ্যম্ভাবী। চির সত্য — অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ বলে কোন কথা নেই। এখন সর্বনাশ: কারণ দলদাসের বাণিজ্যিক বর্তমান ঔচিত্যের নিরিখে অত্যন্ত কৃপণ। সমাজজীবনের এই সত্যকে নেতা-জীবনে অনাদরে প্রয়োগে ডাক দেওয়া হয়েছে — ক্রিমিন্যালস অব দি আণ্ডার ওয়ার্লড সার্ভ এণ্ড গেট সার্ভড — অপরাধপ্রবণ গুহাবাসীজন সেবা কর এবং সেবা পাও। কাজে লাগ এবং কাজে লাগাও।

জনগণের শতকরা নব্বই ভাগ মানসিক দিক থেকে নিয়মকানুন অনুসারী শান্ত-সৎ জীবন যাপন করতে আগ্রহী। কিন্তু তারা ইউনাইটেড নয়, ঐক্যবদ্ধ নয়। বাকি শতকরা যে দশভাগ অপরাধপ্রবণ তাদের মধ্যেও সকলে অপরাধী হবার শক্তি-সাহস-সুযোগ পায় না। যারা পায় তারা সংখ্যায় অত্যল্প হলেও কাজে অত্যন্ত দড়। বহু সংখ্যক সত্য-পালিত জনগোষ্ঠীর জন্য দুচারজন রাখালই যথেষ্ট। এই রাখালরা সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে আছে। নেতৃত্বের কাজ এদের ভোটচক্র পয়েন্টে মোতায়েন করা, নিযুক্ত রাখা। 'কালো হাত ভেঙে দাও, গুঁড়িয়ে দাও' — স্লোগানের প্রকৃত তাৎপর্য 'কালো হাত খুঁজে নাও, গুছিয়ে দাও'। সব কালো হাতেই শক্তি বেশি। শক্তি বেশি তার কারণ সেই হাতে 'মাস্তানি' বা 'মাস্তানবাজি' থাকে। সেই মাস্তানির চেহারা-চরিত্তির, আকৃতি-প্রকৃতি, শক্তি-ক্ষমতা অশেষ — ইস্পাতের ফলা, পেটো, নল ইত্যাদি থেকে শুরু করে সর্বাধুনিক অস্ত্রশস্ত্রের প্রকারভেদ খুঁজতে হবে। একটা অদৃশ্য গিভ-এণ্ড-টেকের বাতাবরণে নেতা সুস্থিত থাকবে নেতৃত্বে, আর অপরাধী নির্ভয় থাকবে তাদের অ-সামাজিক কাজে-কারবারে। দিবে আর নিবে মিলাবে মিলিবে যাবে না ফিরে — নেতা কাঙ্ক্ষিত কাজ পাবে, আর আশ্রিত জন, অপরাধীজন পাবে প্রত্যাশিত সুরক্ষা। চলছে, চলবে।

কিন্তু কেন চলছে? কেনই বা চলবে? কারণ তো আর একটা নয়, অনেক। প্রথমেই ধরুন সেই অসংগঠিত পার্টিগুলির আইনকানুন মানাই অভ্যাসের কথা। তারা শাসকের তাড়নায়, সন্ত্রাসবাদীদের তাণ্ডব এবং পরিবর্তিত নাতিবান ভোগ। আর্থসামাজিক সংকটের চেহারা ভোট-আসন্ন-অবকাশের পিছনেই জীবনের খুঁটি নির্ভরশীল করে দিতে বাধ্য। ভোট-মারফত রাজ-চরিত্র

বলে তাদের সময় নেই শতকরা ওই দুই ভাগের মুখোশের আড়ালে যে সদাব্রত কারখানাগুলি চলছে তার হদিশ নেবার। মাঠ তাই ফাঁকা। ঐ বহুজনের অসহায় করজোড় অবস্থানে স্বল্পজনেরা হাতে লাঠি-ছোরা-বন্দুক অধিক শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তারপরে ধরুন মধ্যবিত্ত বুদ্ধিমানদের কথা। বুদ্ধির অনুশীলিত পুঁজিতে আর সংগৃহীত জ্ঞানের ভাণ্ডারে এরা স্বভাবতই নবুক-জননীর মতো অহংকারী। বহুজন যে জনগণ তারা এদের কাছে এসে হাঁটুতাঁজ করে বুদ্ধি-পরামর্শ চায়, স্বল্পজন যে নেতাদল তারা এদের নরম চেয়ারের গভীরে আসন দিয়ে পথ নির্দেশ ক্রয় করে। তাই এই বুদ্ধিজীবী মধ্যবিত্তরা মনে মনে সার্থকতার, প্রাপ্তির আর সম্মানের আসনে নিজেদের দেখে দেখে নেশাগ্রস্ত আফিংখোরের মতো বুঁদ হয়ে থাকে। কোঁচা দুলিয়ে ঘরে ফিরে আরামকেদারায় শয়ান করে। স্ত্রীপুত্রকন্যারা গর্বে স্ফীত হয়ে বুদ্ধিজীবীর শিরে পাখার বাতাস দেয়। অথবা, এটাচি দুলিয়ে টাই-এর নট ঢিলা করে কোমর-নিমজ্জ সোফাসেটে আসীন হয়ে সিনায় তৃপ্তির ঢেকুর তোলে। স্ত্রীপুত্রকন্যারা অর্জিত আরামকে পার্টিতে-সোসাইটিতে, স্টিরিও-ভিডিওতে অথবা বারে-নৃত্যে উপভোগ করে। এখানেও মাঠ ফাঁকা। বণিকতা-পরিকল্পনা চিল-শকুন-শৃগালের প্রকৃতি পেয়ে যায়।

এবারে ভাবুন ওদের নিজেদের কথা — ওই দুই শতাংশ নেতা-অপরাধীদের কথা। নেতৃত্ব এবং অপরাধপ্রবণতা দুটোই নেশা। নেশা ধরার সময় ধ্রুবের কিছুটা স্বাধীনতা থাকে — ধরব কি ধরব না। কিন্তু নেশা যখন গ্রস্তকে ধরে তখন পাকড়াও করে, গিলে খায়। অক্টোপাস। তাই নেতৃত্বের ঘোড়ায় অধিষ্ঠিতজন ইচ্ছে করে আর নামতে পারে না। পারে না কারণ সেই ইচ্ছেটাই আর তেমন মনের মধ্যে কেন মনের আনাচে কানাচেতেও স্থান পায় না। অপরাধীও তাই। একবার অন্ধকার চলাপথ বেছে নিলে সেই পথের শেষে আলোর অন্বেষণ আর সম্ভব হয় না। তাই এই স্বীকৃত নেতারা আর ধিককৃত অপরাধীরা সদাসর্বদাই উজ্জ্বল নেতৃত্বকে সমাজ থেকে দূরে রেখে দেয়, চাটিয়ে দেয়, মুছে দিতে তৎপর হয়। অনেকটাই দুষ্ট ভাইরাস যেমন শিশু রক্তকণিকাকে, যৌন সাহিত্য যেমন জীবন শিল্পকে অথবা টিভির মাইক্রো ছবি যেমন প্রকৃতির শ্যামল সুন্দরকে। এখানেও সেই মায়া-প্রপঞ্চের বিনাশক ক্রিয়াকাণ্ড সমান বর্তমান — উজ্জ্বল নেতৃত্বকে আড়াল করে রাখা এবং স্বার্থ-নেতৃত্বকেই উজ্জ্বল বলে দেখানো। ঈশ্বরের মুখোশে সৎ-ব্রহ্মকে আড়াল করা এবং নিজেদেরই সর্বেসর্বা সর্বশক্তিমান কল্যাণের মূর্তি বলে জাহির করা। [এবং অবশ্যই মাঝে মাঝে জনগণকে উত্তেজিত উত্তেজিত করে তোলা — বিরোধীদের নির্মূল করা, সংগ্রহকে স্তূপাকার করা এবং বশংবদদের সুযোগ দেওয়া। অর্থাৎ শক্তির পূজায় তান্ত্রিকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে কালী আর শনিকেই দেবতাকুলে একচ্ছত্র বলে মানাতে দেওয়া!]

এটিই নেতৃত্বের পঞ্চম পাঠ — এই সম্ভাব্য সৎ-নেতাকে শৈশবেই নুন খাওয়ানো, নিপ ইন দি বাড, অঙ্কুরেই বিনষ্ট করা। এই পাঠে ছোট ছোট নেতারা অনেক ভুল করে। তারা আইডিয়াকে আক্রমণ না করে ব্যক্তিকে আক্রমণ করে বসে। বড় বড় নেতারা তাই আইডিয়াকেই নিধন করে। এই কাজে ব্রুটাস হওয়াটা আবশ্যিক, বাগ্মিতায়। চাণক্য হওয়া প্রয়োজন, কূটবুদ্ধিতে। উজ্জ্বল নেতৃত্বের সম্ভাবনা দেখলেই তাই বশংবদ দুই শতাংশকে লেলিয়ে দিয়ে মুড়িয়ে দাও অথবা একেবারে ঘরের মধ্যে ডেকে এনে শক্তির নেশায়, ক্ষমতার লোভে এবং ভোগের প্রবাহে মস্তিষ্ক শোধন করে দাও। তবুও যদি কোন 'পাজী' থেকে যায় বাবাবাবাদি তাহলে পেইন্ট ছিম শ্যাক, সংবাদ-মাধ্যমে ছিছিক্কার ছড়াও এবং জনমনে তার কবরের পাকাপাকি ব্যবস্থা করে দাও। এসব কাজই নেতাকে

করতে হবে জনসাধারণের ভাবমূর্তিটি সদা জাগ্রত রেখে। এই মুখোশটি মুহূর্তের জন্যেও যেন মুখ থেকে বিচ্ছিন্ন না হয় তা অবশ্যই দেখতে হবে। এটুকু রপ্ত করতে না পারলে নেতা হওয়া আপনার কম্ম নয় জানবেন।

যদি মনে করে থাকেন যে উচ্চস্তর নেতৃত্বের সততাকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারলেই আপনার কাজ মিটল তাহলে ভুলটি এক্ষেত্রে মিথে মজায়। সৎ-উচ্চপদ-নেতৃত্ব সব সময়েই বোকা হয় কারণ আবেগপ্রবণ হয়। এদের মধ্যে একটা আদর্শবোধ থাকে একটা সামঞ্জস্যের প্রতি আগ্রহ থাকে নিজের যথাসর্বস্ব অপরের জন্য পণ করে বসার বাসনা থাকে। তাই এদের, আদর্শবান সুতরাং বোকাদের নিয়ে নেতাদের বেশি মাথা ঘামাতে হয় না। সহজেই টাইট করা যায়। আসলটার কঠিনতম দিকই হল সংগ্রামীদের মধ্যে ক্ষমতার দখলের লড়াই। সেখানেই 'কাহিরে উহার যাইবে দক্ষিণ' নীতিতে প্রতিনিয়ত প্রয়োগ ঘটাতে হয়। মুখোশের কারবারেই শুধু নয়, মারামারির ব্যবহারে দক্ষতাকেও ছাড়িয়ে যেতে হয়। নীতি-আদর্শ-মূল্যবোধের যে কুমীরের মুখ, জনগণের দুঃখ-দারিদ্র্য-যন্ত্রণার গভীর-কষ্ট এবং অনুগত হতে হবে, দেশপ্রেম-দেশের মহান-বেদিতলে সন্ন্যাসী-সাধক বলে নিজেকে এখানে-সেখানে-সর্বত্র তুলে ধরতে হবে, কাবেন-অনুগত-অনুচরগোষ্ঠীর সহায়তায় প্রচারের পত্র-পত্রিকায়, রেডিও-টিভিতে, মাঠে-ময়দানে, প্রাকারে-প্রাচীরে, দেওয়ালে-দেওয়ালে সেই কথাটা ঘন ঘন ঘোষণা করতে হবে। আর তলে তলে ইঁদুরের মতো প্রতিপক্ষের — বর্তমান ক্ষমতাধারীদের পায়ের তলার মাটি খসিয়ে দিতে হবে, দলের মধ্যে বিভেদ-বিশৃঙ্খলা ঘটাতে হবে, কোথাও কোথাও দাঙ্গা-লুট-আগুন লাগাতে হবে, অর্থ ও শক্তি সংগ্রহের জন্য অন্ধকার জগতের সাহায্য নিতে হবে — এসব কি একটুখানি কাজ? অথচ সকলেই জানবে এমন জঘন্য কাজ নেতা কখনই না ঘৃণা করে, শান্তিশিষ্টভাবে জানাতে হবে নেতা জনগণের সঙ্গে, জনগণের মধ্যেই আছে, বিভিন্ন বিক্ষোভ সময়ে হন্তদন্ত হয়ে ছুটোছুটি করে বোঝাতে হবে জনগণের জন্য দরদ কাকে বলে। এ সবই করতে হবে ভোটের সংখ্যা মাথায় রেখে। নেতার এই আহ্নিকগতির চরিত্র বৈশিষ্ট্যই নেতাকে আলোর জগতে নেতা করে রাখে, অন্ধকারের জগতেও। দিন আর রাত সূর্যের আর পৃথিবীর নিয়মে ঘটে। নেতা-জীবনে দিনের জনগণ আর রাতের অপরাধী-জন অবশ্যই ক্ষমতাকে কেন্দ্র করেই চক্রবৎ আবর্তন করতে থাকে।

একে বলতে পারি প্রোজেকশন — উপস্থাপন, ক্ষেপণ। নেতা নিজেকে প্রোজেক্ট করে। নিজেকেই? — না, নিজের মুখোশকে। তাই তো যে নেতা যত বড় তার মুখোশের সংখ্যা তত বেশি। পেঁয়াজের খোসা। দর্শকরা দেখে, অভিভূত হয়। জনগণ হাততালি দেয়, ঘরে গিয়ে চালের কাঁকর বাছতে বসে, অথবা কেরোসিনের দোকানে সরীসৃপ শৃঙ্খলের পিছনে দাঁড়িয়ে হাঁটু-ভাঙা-কোমরে হাত বুলোয়। পাবলিকেরাও উল্লসিত হয়। মুখোশের আড়ালে মুখোশ দেখে দেখে তারা অভ্যস্ত প্রায়। নিজেরাও শত মুখোশের আড়াল খুঁজে, সংগ্রহ করে। দিন ও রাতের জন্য তৈরি হয়। নেতাকে উপজীবিকা করে: তাদের হাততালি, সমর্থককে ভোট দিচ্ছে। আর নিজেদের জন্যে জমা করে চলে নিরাপত্তার জমিন-আসন মজুদভাণ্ডার। এরাও নেতাদের মতোই নিবেদিত প্রাণ।

নেতা জীবনের দুঃসময়ের কথা না বললে কথাটা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। ক্ষমতার চূড়া থেকে পতন, অথবা জোটবদ্ধ বন্দী-বন্দিনদের নিবেদনের আসন থেকে উৎপাটিত হওয়া এবং লোকসভা-

রাজসভা-বিধানসভার ধবধবে আলো আর পটাপট ক্যামেরা-দৃষ্টি থেকে হারিয়ে যাওয়া জীবন যে কী ভয়ানক তা একমাত্র নেতারাই জানে। জনসাগরের ঢেউয়ের মাথায় মাথায় ভেসে চলা থেকে যখন সেই জনসমুদ্রের গভীর অন্তরালে ডুব সাঁতারে বেঁচে থাকতে হয় তখন নেতা জীবন বড্ডই ভারি বলে মনে হতে পারে। তবে ভেসে ওঠার আশা নিয়েই তারা ডুবসাঁতার অভ্যাস করে। ডেমক্রেসির এই এক মহা সুবিধা। জনগণ বোকাও বটে, ভুলো-মনও বটে! দুইয়ে মিলে এখন সোনা-সোহাগা হয়েছে — নেতা যেমন মুখোশ-পোঁয়াজের আড়ালে পোঁয়াজটি হয়ে, সকল কাজে 'ফড়েদের গুঁড়ো' হয়ে, সকল যজ্ঞেই হবিরা-প্রাপক দেবতাটি বনে গেছে, তেমনি গণতন্ত্রের মন্ত্রতন্ত্রও এক বিশাল বিপুল জনমন-মুখোশ, ছাল, হয়ে অনড় জেপে বসেছে।

পণ্ডিতজনেরা বলে গেছেন বোবাকে বোবা অন্ধকে অন্ধ আর খোঁড়াকে খোঁড়া বলিও না। কাদের প্রতি এই উপদেশ পরিষ্কার নয়। পণ্ডিত ব্যক্তিদের প্রতি অবশ্যই — স্বজাতির ভাল সকলেই আকাঙ্ক্ষা করে। আমি পণ্ডিত নই তাই এই উপদেশ আমার জন্য নীতিবাক্য নাও হতে পারে। আবার আমার লেখা কোনও পণ্ডিত ব্যক্তি উল্টে পাল্টে দেখবেন তেমন ভরসাও যখন নেই তখন বিশ্বাস করে আপনাদের কাছে কোদালকে কোদাল বলার চেষ্টা করতে দোষ কি?

আপনাদের নিশ্চয়ই মনে আছে কোনও এক মহিলা পণ্ডিত, পণ্ডিত হওয়া সত্ত্বেও, এই নীতিলঙ্ঘনকারী কাজটি করে বসেছিলেন : পিতৃ-তুল্য বাপু-যোষিত সেই সর্বজনমান্য নেতাকে দরিদ্র রাখতে এই দেশের দেশজ দরিদ্রদের কতো শত জনের দারিদ্র্যতর হতে হত। সেই নেতাকে দরিদ্র দেখাতে, দরিদ্রের যোগ্য হাঁটু-ধুতি আদুল-গা পোশাকে — মুখোশে? — উপস্থাপিত করতে দেশের লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ হত। [এখনও পিতাদের নয় 'স্বামী'দের অনেককেই এক-কাপড়ে নিরবোদী শুদ্ধজীবন যাপনে স্থিত থাকতে প্রচুর অর্থব্যয়ের ব্যবস্থা আছে, যদিও ব্যাপারটা রাজনীতির এলাকায় না ধর্মের এলাকায় পড়ে বা ঘটে!] সেই পণ্ডিত নেই, সেই পিতা ধর্ম পিতা স্বর্গ পিতেহি কেবলম আর নেই। ইতিহাস। ইতিহাস থেকে বর্তমানে আসুন।

বর্তমান সময়ে উচ্চস্তরের দৃষ্টান্তের অভাব নেই। সম্বৎসর কয়েকটি ফিতে কাটার জন্য আর দু'চার খাদ্য বিলে স্বাক্ষরের জন্য যে পরিমাণ — লক্ষ লক্ষ পরিমাণ টাকার যোড়ষোপচার বৃহৎ যত্নের আয়োজন-অনুষ্ঠান স্থায়ী বাসা বেঁধে আছে তা সাধারণ জনের কল্পনার অতীত। রাষ্ট্রপতি-রাজ্যপালরা ফিতে কাটার যোগ্য থাকতে — বলা উচিত তাদের যোগ্য রাখতে — গণতন্ত্রের যে পরিমাণ অর্থব্যয় ঘটে তাকে শীর্ণদেহ রোগীর দেহ থেকে রক্তক্ষরণের তুল্য বলে মনে হতে পারে। তাছাড়া আছে বড় ছোট মন্ত্রী, উচ্চনীচ সচিব এবং ইত্যাদি মহা-জন গুরু-জনেরা — শত শত সহস্র সহস্র। তারা অবশ্যই মহা-মহা কাজ করে, গুরু-গুরু ভার বহন করে, দশের প্রয়োজনে করে। বরং বলা উচিত অপরের প্রতি, জনগণের প্রতি সেবা-ধর্ম থেকেই করে থাকে। সেই জনগণের কি কোন দায় নেই? অবশ্যই আছে। আর আছে বলেই তাদের, সেই সব নেতাদের জন্য গড়ে ওঠে কাসমুকু-বোলা বাসস্থান, রাজ-যোগ্য বাথরুম, বাবা-যোগ্য কটেজ। দেশের জন্য চিন্তা করতে হলে যে কোনও অবস্থানেই কি তা সম্ভব? শীতাতপনিয়ন্ত্রিত না হলে মাথা হবে উষ্ণ, চিন্তা হবে বাম্হট, জনগণের হিত-সিদ্ধান্তসমূহ হবে বিপথগামী। তখন?

শুধু বাসস্থান নয়, অনুষ্ঠান-প্রতিষ্ঠান-সম্মেলন, অফিস-দপ্তর-যানবাহন, আরক্ষা-সুরক্ষা-প্রতিরক্ষা, চলন-বলন-ভোজন — সবই রাজসিক হওয়া দরকার। রাজা আমাদের দেশে নেই কিন্তু

বিলাসব্যসনের সংস্কার তো রেখে গেছে, জমিদারী প্রথা উঠে গেছে কিন্তু মনের মধ্যে সেই ঠেক সেই জোলবাগানের সেই প্রজা-দৃষ্টি তো উবে যায়নি, বৃটিশরা কবেই ঘাড় থেকে নেমে গেছে কিন্তু তাদের রেখে যাওয়া হরেকরকম-কালচার, নিশ-যাপ আর আলো ঝলমল ভোগের জীবন তো আর মুছে দিয়ে যায়নি। আমাদের নেতাজাতভাইয়েরা তাই ঘাঁটিয়েই সেই সব মুখোশগুলোকে নির্বাসনে না পাঠিয়ে নিজ-নিজ মুখে পরে নিল। অভাব-অনশন রাজতন্ত্রের আর গণতন্ত্রের ফারাকটুকু অনুভব করার অবকাশই পেল না। বাবা চলে গেলেন কিন্তু কাকাবাবুর মুখখানা হারিয়ে গেল বিলেতী মুখোশের আড়ালে, জেঠামশাই তার চির পরিচিত মুখখানা ঢেকে দিলেন ভাইসরয়ের ফেলে যাওয়া ভাইসের অন্তরালে। অবশিষ্ট স্বজন-পরিজনেরা রোমানদের মতো হয়ে গেল। জনগণ জয়ধ্বনি দিল। দেশ স্বদেশ হয়ে গেল।

প্রথম রাতে বিড়ালটা মারা হল না বলে বিড়ালদের পপুলেশন এক্সপ্লোশন ঘটে গেল। নেতারা অফিসের মেজো সেজো-ভিজে হয়ে গেল। বড়োকে দেখে বড়ো শিখলো। বড়োকে দেখে মেজো, এবং মেজোর দেখাদেখি ছোটো শীঘ্র অনুশীলনে অফিসের কর্তা হয়ে একই শ্রেণীর বিশ্বাসে-সংস্কারে গা-ভাসিয়ে দিল। ফলে চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ বছরের মধ্যে আমাদের দেশের সকল নাগরিকরাই হয় 'নাগরিক' হয়ে উঠলেন অথবা মনে মনে গ্রাম-ত্যাগ করে নাগরিক-মনা হয়ে গেলেন। সকলেই সমান, সকলেই নাগরিক। কিছু কিছু একটু বেশি বেশি — এই যা তফাত!

আর মাত্র একটি ধাপ বাকি রইল। সে কি তাই দূরে থাকতে পারে? বিশ্বনাগরিকত্ব? মানে, পশ্চিমের কাঠামোয় পুবের মুখ। আমাদের আর তাই সিভিল হওয়ার সময় হল না, নাগরিক হয়ে ফ্রিজ থেকে ঠাণ্ডা পানীয় নিয়ে কেবল টিভির সামনে বসে বিশ্বকে এক নীড়ে দেখতে বসে গেলাম বুঁদ হয়ে। নিজ নিজ মুখ হারিয়ে প্রত্যেকেই, অনেকেই, শুধুমাত্র মুখোশ, হয়ে গেলাম। পেঁয়াজ, সবই খোসা।

জনচিত্তের এই দুর্বলতাকে যারা সহজেই বোঝে, চট করে কাজে লাগাতে পারে তারাই তো জননেতা। স্বাধীনতাবোধের বাতাস যখন আলুথালু বইছে তখনই তাই নেতারা একটা করে ভোটপত্র হাতে ধরিয়ে দিয়ে ঘোষণা করল, "এই নাও তোমাদের গণতন্ত্রের প্রাপ্তি। তোমরাই স্বাধীন শক্তির উৎস, নির্ণায়ক, নির্বাচক। সাংবিধানিক অধিকার। যাকে খুশি তাকেই নেতা করে দাও। তোমরা আসল, তোমরা প্রধান নিখিল ভারত তীর্থমন্দিরে।" উল্লসিত জনগণ ভাবলো — এই তো ঠিক। আর নেতারা ভাবলো — বেশ উত্তম ব্যবস্থা! স্বাধীনতার ভোট-পত্রখানা পাঁচ বছরে একবার বাক্সের গহ্বরে ঢুকিয়ে দিয়ে তোমরা শূন্যহাতে আঙুল চোষ, আমরা পূর্ণ কুক্ষিতে চর্ব্য-চূষ্য-লেহ্য-পেয়তে মশগুল হই। দ্বিতীয়বার ভোটের পয়গাম হতে হতে নেতাদের হাতে অঢেল সময়।

এখান থেকেই শুরু ষষ্ঠ পাঠের। ভোটপত্রখানা হাইজ্যাক করতে হলে ত্রিবিধ শক্তি থাকা চাই — অর্থ শক্তি যা সব কিছুকেই কিনে নিতে পারে, পেশী শক্তি যার বলে সংখ্যক দখলে থাকলে বহুসংখ্যক নতুনের পত্রালিকা ব্যবহার করতে বাধা আর জনবল বা সমাজ ও সভ্যতার দিনের উপর প্রভাব ফেলতে পারে। এই শক্তিত্রয়ের মধ্যে পেশী শক্তির কথা আপনাদের বলেছি। জনবল বা জনশক্তি নানা নামে প্রাপ্য — কর্মী, ক্যাডার, রিক্রুট। এরা সহজ ও সাধারণ পথ ছেড়ে কিছু পেতে চায়, হতে চায়। তাই গণতন্ত্রে নেতা ছাড়া এদের গতি নেই। এরা জনগণ থেকেই আসে বলে এরা লোকাল এবং মুখে-মন ও নেতার কাছে হাঁজি-চামচে। অর্থশক্তির কথা কিছু বলা হয়নি। অর্থ শুধু

অনর্থের মূল নয়, অর্থ গণতন্ত্রেরও মূল। বিশেষ করে বৃহৎ গণতন্ত্রের। এই অর্থশক্তি সংগ্রহ করা এবং অর্থশক্তির কেন্দ্রবিন্দুর কাছাকাছি থাকাটা নেতার পক্ষে আবশ্যিক জানবেন।

অর্থ 'উপার্জনের' একটিই পথ আছে — আপনার যে কোনও গুণ ক্ষমতা এবং যোগ্যতাকে কাজে লাগানো, নিজেই খাটানো বা অন্য কাউকে বিক্রি করানো। মূল্য বা মজুরীই উপার্জনের পাথেয়। কিন্তু সেই অর্থে পেট চলে, নেতৃত্ব সেচন পায় না, শক্তির উৎসে প্রাণের যোগান ঘটে না। সেজন্যে চাই অর্থ 'সংগ্রহ'। সংগ্রহের অনেক উপায় আছে। সে সব উপায়ের কোনটিই নেতার কাছে অস্পৃশ্য অযোগ্য অকাম্য নয়। জাত আছে মানুষের, অর্থের জাত বিচার নেই। অর্থকে ঈশ্বর মনে করে সে যে সর্বত্রই বিরাজমান তা প্রথমেই বুঝে নিতে হবে নেতাকে। তা হলেই সংগ্রহের সহস্র পথ খুলে যাবে। যেখানে দেখিবে ছাই উড়াইয়া দেখিবে তাই।

প্রচলিত রীতি অনুযায়ী সদস্যভুক্তি, চাঁদা আদায়, কৌটো-নাড়ানো, কুপন বিক্রি ইত্যাদি গণমাধ্যমে সংগ্রহ আসলে ফ্রন্ট-কেস, মুখোশ। এই সব নিরামিষ প্রক্রিয়া ধারেও কাটে ভারেও কাটে — একদিকে এ্যাকাউন্টের এ্যাকাউন্টেবিলিটি স্বতঃসিদ্ধ চেহারা পেয়ে যায় অন্যদিকে জনচিত্তে মানসিক সমীকরণটি সহজপ্রাপ্য হয়ে ওঠে। প্রথমটির আড়ালে রাঘব-বোয়াল সংগ্রহগুলো এবং সেই সংগ্রহসমূহের অনিবার্য কনট্রাবাইন্ডগুলো সাধারণে ধরা পড়ে না। অর্থের থোক আসে নেতার হাতে, পার্টির তহবিলে আর নীতি-নিয়মের মাথা মুড়িয়ে যায় ঠেকের কাছে — সেই ঠেক বা উৎস কোনো ইনডাস্ট্রিয়ালিস্টই হোক অথবা শহরের দুইভাগের কালুয়া-ধলুয়া, হাসেন-কাসেন টাইগার-ডান্-ই হোক। রাজনীতি রাষ্ট্রনীতির সূতোর প্রান্তগুলি চলে যায় পর্দার আড়ালে সেই সব ঠেকাদের তর্জনী-গর্জনীতে। ডুবে ডুবে জল পান করলে নাকি একাদশীর বাবাও টের পায় না — প্রবাদে বলে। নেতারা বিধবা নয়, একাদশী করার প্রশ্নই নেই। তাই বাবারা দূরের কথা পুত্রকন্যা অভ্যাগত-পরিজন সকলেরই মুখে লেগে থাকা গুড়ের-মধুর-চিনির ছোপছাপে জেনে যায় কে খেয়েছে এবং কতখানি খেয়েছে। তাছাড়া শরীরস্বাস্থ্য কি লুকোবার জিনিস? চকচকানো বাড়ি, চার চাকা গাড়ি, এয়ার-কুলার ফিট করা অফিস, টাইলস বসানো বাথ, এ-সব আধুনিক চাকচিক্য দেখে জনগণ ধোঁকা খায় না। উচ্চতম নেতাদের দৃষ্টান্তে অনুপ্রাণিত হয়ে ধাপে ধাপে নিম্নতম ছাত্র-নেতা-কর্মী পর্যন্ত এই সংগ্রহ প্রক্রিয়া সচল হয়ে ওঠে। নেতারা নৈতিক ক্ষমতা হারায়, অধস্তনরা প্রথা-সিদ্ধ বলে অবশিষ্ট বিবেককে বাক্স-প্যাঁটরায় বন্ধ করে ফেলে। ভাইরাস-জনিত রোগ যত দ্রুত ছড়াক, আগুন যত গতিবানই হোক, এরা কেউই মনের সামাজিক দূষণের তুলনায় বড়ো নয়, দ্রুততর নয়। লুট করা কোনও সমাজের স্বাভাবিক ক্রিয়া নয়। কিন্তু কোথাও লুট-পাট চলছে এমন হলে প্রায় সকলেই লুটেরা হয়ে যায়। ব্যক্তি মানসিকতা সাময়িকভাবে গোষ্ঠী-গ্রুপ-মানসিকতার আড়ালে হারিয়ে যায়, বিবেকের — ব্যক্তি বিবেকের — দংশন বিঁধতে পারে না। 'লুঠ চলেছে, লুঠের বাহার, লুঠে নে রে তোরা'! এটাই তাৎক্ষণিক।

মাঝে মাঝেই দেখবেন নেতারা সঙ্গীসাথী সমভিব্যাহারে দুপদাপে দোকানে বাজারে 'ঠক' বাছতে বেরিয়ে পড়েছে। চাল-তেল-নুনের ওজন এবং দাম তখন নেতাদের পীড়ন করছে। জনগণকে ঠকানো নৈতিক অপরাধ। আবার মাঝে মাঝেই শুনবেন কম্বু-কণ্ঠ ঘোষণা — বাজারে-হাটে, রাস্তা-ঘাটে, কাগজে-পত্রে — সমাজবিরোধীদের শায়েস্তা করতেই হবে, অপরাধীদের ক্ষমা নেই, মুনাফাবাজি বন্ধ করতে হবে, ঘুষ নেওয়া চলবে না। প্রথম প্রথম জনমন জনগণ উদ্দীপ্ত হয়ে উঠতো, বিশ্বাস করে ফেলতো। বহুবার দেখে দেখে আর শুনে শুনে তাদের ভুয়োদর্শন ঘটেছে, সত্যদৃষ্টি লাভ হয়েছে। জনগণ এখন আর তেমন কান দেয় না। মনে মনে জানে এসবই মুখোশ, এসবই নেতৃত্বের ফ্রন্ট-কেস। এসবের আড়ালে অন্যতর কোনও উদ্দেশ্য আছে। সেই উদ্দেশ্যটি কি

তা নিয়ে মাথা ঘামায় না জনগণ। মাথা ঘামিয়ে লাভ নেই বলেই মাথা ঘামায় না। এমন হতে পারে যে জনমনে কোনো কারণে নতুন করে সততার ছাপ ফেলা দরকার হয়ে পড়েছে — সামনে ইলেকশন। হতে পারে বাজার দরের উর্ধ্বগতিতে বিব্রত হয়ে নেতারা তোষণ-তোলনকে আলগাকে বাঁকিয়ে নিতে চায়। তাই চাপ সৃষ্টি করা, আঙুলকে বাঁকা করে কাজ হাসিলের মহড়া। অথবা অন্য কিছু। সেই অন্য কিছুটি অবশ্যই নেতার বা দলের স্বার্থে, কিন্তু জনস্বার্থে ঘোষিত।

ফেলোদের কাজ সহজতর হয় যখন জল ঘোলা থাকে। সাঁটা-লিখো জানি না। তবে সঠিক জানিবেন যে ঘোলা-জলে মৎস্যশিকারী প্রবচনটি সমাজজীবনে প্রয়োগ করিলে নেতা প্রকৃতির কোট-শিকার পর্বটি সর্বাধিক লোভনীয় হইবেক। উহার কারণ দুইটি : প্রথম কারণ ভোটারগণ মৎস্যজনদের মতোই নির্বোধ, ঝাঁকে-ঝাঁকে চলে অভ্যস্ত। এবং দ্বিতীয় কারণ 'চার' ফেললেই আশপাশের বোধ হারিয়ে ফেলে। তাই কাজের সময় ভোটাররূপ কাতলাদের সামনে নানা প্রকারের খাদ্য ফেলা হয়, ছড়ান হয় — আন্দোলন, পরিকল্পনা, দল-তন্ত্র, রাস্তানির্মাণ, ভূমিসংস্কার, কলকারখানা স্থাপন, দারিদ্র্য-বেকারী দূরীকরণ এবং ইত্যাদি। ভোটের কাজ শেষ হলে, ফুরোলে, সব ভোটারদেরই প্রধানের শেষ অংশের ভাগীদার হয়ে পড়ে। ভোটারদের এবং জনগণের এই পাতকী-স্বভাব জানা থাকে বলেই নেতারা বছর বছর পাঁচবছর মধ্যবিত্ত জীবন ছেড়ে উচ্চবিত্ত জীবন যাপন করতে পারে। [এখন অবশ্য ব্যাপার অন্যরকম হয়ে গেছে, ফেলোদের সময় আগের মতো ভাল যাচ্ছে না! মধ্যে-মধ্যেই পাতকীদের কাছে হাতজোড় করে কাণ্ডী বলে দক্ষিণা দিতে হয়। মুখ ঢেকে ছাপ গোপন করেই মিষ্টি কথা ছুঁড়ে দিতে হয়। বড়জোর উত্তম হবার আগেই আবার ঘরছাড়া হবার ডাক পড়ে। মধ্যবর্তী নির্বাচন এখন প্রায় নিয়মেই দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। খবরে খবরে এবং গোয়েন্দা খাবার খেতে খেতে নিজেদের মধ্যেই, নেতাদের মধ্যেই, অনেকখানি ওক হয়ে যায়। তাই দোষ পাতকীদের নয়, ফেলোদের।]

ফেলোরাই শিল্পী — জনগণের শিল্পী, দক্ষ কারিগর। ঐন্দ্রজালিক। কিন্তু শিল্পপতি ছাড়া দেশের এই জনপতি হওয়া সম্ভব নয়। মধ্যবিত্তের বিপুল উপার্জনে জোটখাটো নেতা হওয়া যায়, সামাজিক নেতা, জাতীয় নেতা, ধর্মীয় নেতা, রাজনীতির উচ্চস্তরের নেতা, রাষ্ট্রনেতা হওয়া সম্ভব নয়। তারাও তো আর গ্রীক সিটি স্টেটের মতো ভোটের সংখ্যা নয়, জনসংখ্যাও নয়। তাই টাকা চাই জল ঘোলা করতে, টাকা লাগে ভোটারদের কাছে পৌঁছাতে, খই-এর মতো টাকা ছড়াতে ছড়াতে তবেই [illegible] উচ্চতম পাহাড়ের সর্বশীর্ষে পৌঁছানো যায়। এই টাকা সংগ্রহই নেতাদের প্রধান কাজ। কে দেবে টাকা? কোথা পাব টাকে?

ট্যাক্সেও এবং ট্যাক্সেই পথই শ্রেষ্ঠ পথ। দেশের নব্বইভাগ জনগণই দরিদ্র। তারা টাকা [illegible] — প্রশাসনের দাঁড়া চিৎকার করে ঘোষণা করবে ; নব্বই ভাগ নয়, ঐ দশ ভাগ দেবে। পুলিশের এবরবা কিসে? ঐ দশভাগে নয়? চিচিং ফাঁক। পুলিশ তো শুধু অপরাধীর কাছ থেকে অন্যায় মজুতের দাইস [illegible] কেটে খায়। তারা স্বেচ্ছায়ই শুধু নয় [illegible] থাকে। ভোগ ছড়ায়। দেবতা জানে পুজো দেয়। দিন মাস বছরের হিসেবে কারবার চলে। দিন মাস বছর ভাল যায়। এই গিভ এণ্ড টেক অর্থনৈতিক সমতাইজমের মূল সূত্র। সুতরাং? সুতরাং ইউরেকা! জনপতি হতে গেলে শিল্পপতিকে লক্ষপতি-কোটিপতি হবার পথ প্রশস্ত করে দাও। দিবে আর নিবে-র — গিভ এণ্ড টেকের — মহান পুঁজিশী সূত্রানুসারে দলে সংগ্রহ কর। যদি প্রয়োজন এতে না মেটে তাহলে এই কালোটাকার সঙ্গে অবৈধ আন্তর্জাতিক কারবারীদের, স্মাগলারদের সঙ্গে হাত মেলাও, তাতেও যদি টান পড়ে তাহলে অবৈধ দেশজ কারবারের দরবারে কড়া নাড়, যারা কালোটাকার কারবারী তাদের

ফাঁকির পথ প্রশস্ত করে দাও এবং সংগ্রহের ঝোলা ভরে নাও। পথের হদিশ একবার পেয়ে গেলে নতুন নতুন পথ আপনিই খুলে যায়।

খুলে যায়, প্রশস্ত হয় ঠিকই কিন্তু একটা প্রধান বাধা এসে যায়, পথকে দুর্গম করে তোলে। পরাধীন থাকার কালে রাজা ছিল, গণতন্ত্র ছিল না। সুতরাং ভোটপর্ব ছিল না। মধ্যবিত্ত নেতারা মধ্যবিত্ত জীবন যাপন করতেন, দেশের মঙ্গলের কথা ভাবতেন এবং প্রয়োজন হলে নিজের চিত্তকে বঞ্চিত করতে উচ্চবিত্ত উপার্জনের নিশ্চিত ভোগ উপভোগের জীবনত্যাগ করে দাসবৎ জীবন যাপনে সানন্দে চলে আসতেন। কিন্তু জনগণতান্ত্রিক ভারতে নেতার দরকার পড়ল। নেতাদের নেতা হয়ে উঠতে হল জনগণের ভোটে। অন্যদিকে দুশো বছরের গোলামী চরিত্র ইতিহাসের কোন পরিবর্তনেই স্বভাব পাল্টালো না। তারা যথাপূর্বং পেয়ে এবং খেয়ে, বেঁধে এবং সংগ্রহ করে যেমন ছিল তেমনই রয়ে গেল। সমাজের নব্বই-দশ শতাংশ অন্ধকারের সঙ্গে তারা মানিয়ে চলছিল, মানিয়েই চলল। প্রধান বাধাটা এলো এই এখান থেকেই। ওই দশ শতাংশের অপরাধ জগতে দুদিক থেকে ডান-বাঁ-টানাটানির — পিঠ এবং ঠেকের — চাপ পড়তে লাগল। তারা শুনবে কেন? অপরাধ জগতেরও তো নীতি নিয়ম আছে, হিসেব-নিকেশ আছে, উচিত-অনুচিত আছে। অন্ধকার জগৎ তার অধিকার ছাড়বে না, পুলিশ তার সুযোগ—প্রশাসনিক, কনডেমনেশন সুযোগ ছাড়বে না, কিন্তু গণতন্ত্রের নেতাদেরও সেই একই এলাকায় সিঙ্কিং-প্ল্যানিং না করলে নেতৃত্বের পেট্রল-টাকা সংগ্রহ হবে না। শুরু হবে সুযোগের খেলা। পুলিশের মুখোশ কর্মচারী, দলকা। অপরাধজগতের কালুয়া-ধলুয়াদের মুখোশের বালাই নেই, শিল্পপতিদের মুখও যা মুখোশও তাই — দুটোই প্রতিকৃতি বা মাড়ের ছবি হয়ে দাগিকার আঁকা। একমাত্র বর্ণচোর জনগ্রাহ্য মুখোশের অধিকারী রাজনীতির নেতারা। আইন প্রণয়নের ক্ষমতা তাদের হাতে, দেশের মঙ্গলচিন্তা তাদের অন্তরের নাগিকাঠোরা, বিশাল জনগোষ্ঠীর তারাই প্রতিনিধি। সুতরাং? সব ছক নতুন করে সাজাতে হল, বহমান অর্থের প্রবাহে খাল কেটে সেই নবতম এলাকায় সেচের পাকাপাকি ব্যবস্থা হয়ে গেল, নতুন নতুন প্রবাহের সন্ধান করা হল পারমিট-লাইসেন্স-টেন্ডার-রাজ কায়েম হল। কিক-ব্যাক প্রথা চালু হল। এক কথায় প্রয়োজনই আবিষ্কারের জননী হয়ে দাঁড়াল। নব নব প্রয়োজন, তো নব নব আবিষ্কার।

পাঁচন নয়, নেতৃত্বই আজি খুলে দিল দ্বার। সেই দ্বার পথে নেতা-ভ্রাতা—বিবিদের টাকার কথা ভাবুন — মন্ত্রী-সচিব, বড়বাবু-ছোটবাবু হয়ে ধাপে ধাপে টাকার পেট্রল প্রবাহ পেতে দেরি করলো না। ধাপে হতে সময় নিল ঠিকই, বুঝে নিতে মাথা ঘামাতে হল নিশ্চয়ই, কিন্তু আবিষ্কারের জননী সর্বস্তরেই মাথা চাড়া দিয়ে দেখা দিল। মুখোশে মুখোশে ছেয়ে গেল সব মুখগুলো। সকলেই চেঁচাচ্ছে—করাপশনে দেশ বয়ে গেল; যারা করাপ্ট তারাও বলছে আর যারা সুযোগ না পেয়ে নন-করাপ্ট তারাও বলছে। প্রথম দল 'উত্তীরকে' খুঁজছে, অনির্দেশ্য হুজুগী আন্দোলনকে ভুল দিকে দিকনির্দেশ করছে। দ্বিতীয় দল যন্ত্রনায় ছটফট করে অথবা ঈর্ষার জ্বলে জ্বলে মানসিক ডিপ্রেশন মেকানিজমে আড়াল খুঁজছে।

এটাই নেতার সপ্তম পাঠ — করাপশনের দায় যে জনগণের, জনগণের সহযোগিতাতেই যে করাপশন উদ্ভব সম্ভব তা সঠিক ভাবে বুঝিয়ে দেওয়া। দুর্নীতির অভিযোগের পিছনে উত্তীরই যে দায়ী তা উত্তীরদের বুঝিয়ে দেওয়া। এটা বুঝিয়ে দিতে পারলেই নির্বিবাদে শতকরা দশ অংশের পারিবারিক ভাগ অবিকৃত নিশ্চিত থাকতে পারে। শক্তির উৎস যখন জনগণ তখন করাপশনের উৎস কি অন্য কোথাও হতে পারে? একটা বালক যা জ্ঞানবোধে তাকেই গুলিয়ে দিতে

পাল্লাধার-টেক-আর-ডোবাবার-পাল্লা করে তোলা চাক্তিখানি কাজ নয়, নেতাসুলভ কাজ বটে!

প্রশ্ন করতে পারেন : ব্যাপারস্যাপার যখন এমন সর্বজনবিদিত, দিবালোকের মতো স্বচ্ছ, তখন এই নবাইতোস জনগণ এই দলতন্ত্র অন্ধকারকে তাড়িয়ে দিচ্ছে না কেন? উপড়িয়ে ফেলছে না কেন? কারণ দ্বিবিধ, ঘটনাগত এবং পরিকল্পনাগত। ঘটনাগতভাবে সুবিধাভোগীরা ইতিহাস- সংকেত সমর্থিত, তারা এনটাইনসড — নোটের আড়ালতলে — এবং সংবিধানসম্মত মুখোশের আড়ালে সুরক্ষিত— আইন আপনার হাতপা বেঁধে রাখবে, আর সেই আইন ওরাই তৈরি করবে। জনগণের মঙ্গলের জন্য, সেবার প্রয়োজনে প্রশাসনিক ব্যবস্থা থাকবে, কিন্তু সেই ব্যবস্থায় ব্যুরোক্র্যাটরা রক্ত আঁখি নেত্রপাত ঘটাবে, পুলিশ লাঠিবন্দুক নিয়ে একদম তৈরোজিন থাকবে যাতে কারফু-কবলিত করে আপনাদেরই পঙ্গু করে রাখবে। বিচারব্যবস্থা? কারে কয়? বিলম্বিত বিচার নাকি অবিচার ঘোষণা। তাহলে আমাদের দেশে প্রার্থী অবিচার পায়, অপরাধী বিচার পায় — বিচার পায় কারণ ঠাকুমা নালিশ দায়ের করলে নাতি অপেক্ষা করে থাকে বিচারের রায়ের বা সর্বাঙ্গের। এই দ্বিবিধ ব্যবস্থাতেই শতসহস্র চালচাষ অর্থাধিক পথ পার হতে হয় — দিওন থেকে শুরু। কোনও কোনও স্থানে এলাকার বাইরে পালানোরও চালচাষ বাহিনীর যন্ত্র বলে স্বীকৃত। রানা কৈবর্ত-হাসিন শেখের কথা ছেড়ে দিন, নিম্নবিত্ত মধ্যবিত্ত উচ্চবিত্ত জনেদের কতোজন হাত পায়ের আইনের বেড়ি খুলে লাঠি বন্দুকের প্রশাসন তৎপরতা এড়িয়ে কালো কোটের পকেটমারা থেকে বেঁচে আর বার সংসার জীবনে ফিরে আসতে পারে? তাই দেখতে পাবেন অপরাধী ঘুরে বেড়ায় সমাজের অঙ্গনে প্রাঙ্গণে অবলীলায়, আর বিচারপ্রার্থী নেতার দরবারে, থানার লকআপে, কোর্টের চত্বরে আর কালো কোটের পিছনে চটির তলা খুইয়ে ফেলছে। বিচারের কুর্সিখানা লাল সালুর আড়ালে বকের নিশ্চেষ্টতায় ধ্যানমগ্ন। একটু এদিক ওদিক করলেই জেলখানা — ইদানিং আবার স্টেডিয়ামের গেট বন্ধ করে জেলখানা বানানোর প্রথা চালু হয়েছে আমাদের দেশে। দূরেই ডিকেনাননেনের পদধ্বনি শোনা যাচ্ছে।

এবারে পরিকল্পনাগত কারণের কথা বলি। মনোবিজ্ঞানে যাকে বলে ক্যাথারসিস, রাজনীতিতে তাকেই বলে জনরোষ নির্বাপণ। সূক্ষ্ম পরিকল্পনার দরকার। এখানে স্বপক্ষ বিপক্ষ নেই — সরকার পক্ষ-বিপক্ষের কথা বলছি। সকলেই একই প্রবাহে ঢালিয়া দিনু মনপ্রাণ—নৌকোগুলোই যা আলাদা আলাদা নামে চেহারায় পতাকায় সজ্জিত। সকলেই জানে কেউ কাউকে বিশ্বাস করে না। নেতা অন্য নেতাকে নয়, জনগণকেও নয়। জনগণ বিতৃষ্ণ ধিক্কারে সম্বোধন করে, বিশ্বাস তো দূরের কথা। আইন আর প্রশাসন বিভাগ যে রক্তপুত্রের পতিপথ তা অনেকদিনই জনগণের জানা, বিচার বিভাগ — একই জমিতে, একই জল হাওয়ায় জন্মমৃত্যু বলে — অকৃতজ্ঞ সন্তানের ইতিহাসের সন্ধান পাবেও পদাঘূর্ণিত ক্রন্দনের পথে। মাঝে মাঝেই তাই শুনতে পাবেন বিশ্বাসী স্বার্থবোধের পদচুম্বিতে বসে যাওয়া পাত্রের সজিল সমাধি — অবসরগ্রহণের পূর্বরাত্রে বিচারক 'রায়' ঘোষণা করে পরবর্তী কালে 'রায় বাহাদুর' হতে চাইছে — রাজপাল না হলেও নিদেন পক্ষে বিদেশ বিভুঁই-এ বাকি জীবনটা মৌতাদায় ধুঁকে নিতে। [—এই এলাকায় সন্তর্পণে চলনই প্রথাসিদ্ধ বিধি, তাই থেমে যাওয়াই, পলায়ন করাই বুদ্ধিমানের কাজ, বাঁচার উপায়। এমনকি মার্জার পদক্ষেপেও রক্তকরণের — কনটেম্পটের — সম্ভাবনা আছে। বুদ্ধিমানের জন্য এবং সকলের জন্যই, ইশারাই যথেষ্ট।]

ভূমিকা রেখে মূল কথাটায় ফিরে আসি, ক্যাথারসিসের কথায়। জনগণের রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধির জন্যে শতসহস্র প্রক্রিয়া পদ্ধতি আছে — মিটিং-মিছিল, ধ্বনি-ঘোষণা-স্লোগান, সম্মেলন মহাসম্মেলন, বাস-রোধ-ট্রেন-রোধ-পথ-অবরোধ, গেটবন্ধ-বাংলাবন্ধ-ভারত-বন্ধ, সভা-সমিতি-প্রতিবাদ, গণস্বাক্ষর-মেমোরেন্ডাম-অনশনধর্মঘট, গণবিচার-গণধোলাই ইত্যাদি। এসবের মধ্যে অন্তত দুটি উদ্দেশ্য অবশ্যই কাজ করে। একটি প্রকাশিত বা ম্যানিফেস্ট উদ্দেশ্য অন্যটি গুপ্তসুপ্ত অপ্রকাশ-ফল্গুবেণী গূঢ়-গভীর। জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা উষ্মা-দ্বেষ ক্রোধ-বিরক্তি প্রতিবাদ-বিরুদ্ধতাকে প্রকাশ করা অবশ্যই এসবের প্রকাশিত উদ্দেশ্য। নেতা হিসেবে নেতার আবশ্যিক কাজ। অ-ন্যায় আইনের বিরুদ্ধে, অ-যোগ্য প্রশাসনের বিরুদ্ধে এবং অ-বিচার ব্যবস্থার বিরুদ্ধে জনচেতনা সংগঠিত করা এবং প্রকাশ করা রাজনৈতিক ম্যানিফেস্ট উদ্দেশ্য। কাম্যও বটে। কিন্তু অন্যায়ের মাত্রা, অযোগ্যতার তীব্রতা এবং অবিচারের পরিমাণ জনমনে যে পরিমাণ বারুদের — এক্সপ্লোসিভের — সন্নিবেশ ঘটায় তার প্রকৃতি ও মাত্রা অনুমান-নিরূপণ করে নেতাকে রোষ-নির্বাপণে ব্রতী হতে হয় — ক্যাথারসিস ঘটাতে হয়, ডিফিউজ করে বিস্ফোরণ থেকে বাঁচতে হয়। নিজেদের বাঁচাতে হয়, পার্টিকে বাঁচাতে হয়, এবং যা চলছে তাকে চলতে দিতে গেলে জনচিত্তের রোষাগ্নিকে স্তিমিত করার, নির্বাপিত করার পথ খুঁজে নিতে হয়। ফোড়াকে অপারেশন করে জমে ওঠা পুঁজকে বাইরে বার করে দিতে হয়। এটাই মানসিক প্রেক্ষিতে, সামাজিক-রাজনৈতিক বাতাবরণে ক্যাথারসিস।

এই কাজে ক্লিনিক্যাল প্রিসিশন লাগে — বৈদ্যসুলভ নৈপুণ্য লাগে। এই লাগে বলেই তত্ত্বজ্ঞানীর সঙ্গে প্রযুক্তিগত কলাকৌশলের মেলবন্ধন অনিবার্য হয়। ইডিওলজির অস্পষ্ট কচকচির প্রেক্ষাপটে স্লোগানের ধ্বনি-ঘোষণার যোগ হলে তবেই অপারেশন সফল হতে পারে। তাদেরকে তাই তীব্র তীক্ষ্ণ হতে হয়, 'কাটিং' হতে হয়, অগ্নিস্রাবী হতে হয়। মেটেরিয়াল-মেটাফোরিক্যাল, ইন্টারেস্ট-ভোলাটাইল ডিসপ্লাস-ভলক্যানিক, ক্যারিশমা-মেটাল এবং ইমোটিভ-ডিক্টেটিং হতে হয়। কালো হাত ভেঙে দাও গুঁড়িয়ে দাও, ধ্বংস কর ধ্বংস কর, নিপাত যাক নিপাত যাক, এবং আরও। 'রক্ত' শব্দটা কতভাবে ব্যবহার হয় তা একবার ভেবে দেখতে পারেন। উত্তেজনা প্রশমনের এ-সবই অ্যালোপ্যাথিক নিদান। প্রত্যক্ষ, রূঢ়, নির্মম তাণ্ডব এবং আবেগসর্বস্ব। কেন? তাই বলি।

গণতন্ত্রে জনগণ বলতে বোঝায় নাগরিক এবং অনাগরিক। প্রথম দল রাষ্ট্র সংগঠনের সদস্য, নির্বাচনের অধিকারী, সংবিধানের এবং রাষ্ট্রের ক্ষমতার উৎস। কিন্তু নামেই তারা সর্বেসর্বা, যেমন রাষ্ট্রপতি, প্রথম নাগরিক! জনগণ 'মহান' রাষ্ট্রপতি নামে 'প্রধান'। ক্ষমতার সুখে তাই তাদের সমান অধিকার — কোন অধিকারই নেই। ভোটের পর্ব এবং সেবন প্রক্রিয়ায় নির্বাচিত নেতারা একচ্ছত্র। অর্থকষ্টে সাংসদের অভাব না হলে পাঁচ বছর অবাধ এবং নির্বাধ, নিঃশঙ্ক এবং স্বচ্ছন্দ। কিন্তু ঐ জনগণ? ওদের যে পেট আছে এবং তাতে ক্ষুধা জন্ম নেয়, ওদের চেতনা আছে এবং সেখানে জ্বালা ধরে, ওদের মন আছে যাতে বঞ্চনাবোধ দানা বেঁধে রোষের ঊর্ধ্বচাপ তৈরি হয়? তাই নেতারা নিশ্চিন্ত-নিশ্চিত হতে, ভোগ-উপভোগের সাম্রাজ্যে স্থিত-স্থির থাকতে একদিকে ভোগায়তনের ইন্দ্রিয়তর্পণকে সুরক্ষিত করতে থাকে, অন্যদিকে জনগণের পেট-চেতনা-মনের অভ্যন্তরে জমে ওঠা ক্ষুধা-জ্বালা-বঞ্চনাকে গণতন্ত্রই ক্যাথারটিক প্রক্রিয়ায় নির্বাপিত করার নিত্যনতুন পথ খোঁজে।

নাগরিক মানে তো মিছিল? সত্যাগ্রহ কেন প্রতিবাদ সম্ভব নয়? জনগণের সব নাগরিক অনুরোধ অভিযোগের প্রতি মনোযোগ থাকলেই সহজ-স্বাভাবিক সমাধান পাওয়া যায়। কিন্তু মনোযোগ যদি অন্য কোন দিকে, অন্য কোন ভোগের প্রতি নিবিষ্ট থাকে তাহলে? দৈনন্দিন জীবন থেকে একটা উদাহরণ নেওয়া যাক। মাতা এবং সন্তান। মায়ের মন পড়ে আছে পাড়ের টানে পড়শীর দিকে, অথবা টিভির রন্ধন-ব্যঞ্জন-উৎসবের দিকে, অথবা অন্য কোনও ক্ষেত্রে। সন্তান মায়ের মনোযোগ চাইছে। কণ্ঠের সম্বোধনে, হাতের আকর্ষণে অথবা ছোট ছোট হাতের মৃদু-মিঠি স্পর্শে। কিন্তু মায়ের মন উপভোগের বৃত্ত থেকে সন্তানের কোনদিক সরে আসতে পারছে না। এবারে? সন্তান ধাপে ধাপে উচ্চগ্রামে চড়াবে তার দাবিকে, এবং শেষ পর্যন্ত হিস্টিরিয়া পর্যায়ে পৌঁছে যাবে না? মাতা-সন্তানের ব্যক্তি-সম্পর্কে যা ক্ষুদ্র ও পরিমাণে সবিশেষ, নেতাগণ-জনগণ সম্পর্কের বেলায় সেই প্রতিক্রিয়াই অন্যতর চেহারা নেবে, নির্বিশেষ হয়ে উঠবে, গ্রুপ-মনোস্তত্ত্বের টানাপোড়েনে সেই গুণ পরিমাণে ঘটে যাবে আমূল পরিবর্তন। সন্তানের বেলায় যা পা-দাপান, জনগণের বেলায় তাই হবে পাড়া কাঁপান প্রতিক্রিয়া। ভাঙচুর, লুটতরাজ, আগুন-লাগা এবং ইত্যাদি। এতো আমাদের জানা-চেনা এবং খবরে দেখা নিত্য-নৈমিত্তিক। নয় কি?

নেতা হবার সময় নেতাদের দৃষ্টি থাকে জনগণের দিকে, মন থাকে নাগরিকদের ভোটের দিকে। নেতা হবার পরে সেই দৃষ্টি সরে যায় ভোগের দিকে, আরামের দিকে আর মন ছোটে শহরের দিকে। কলকাতা-দিল্লি-ইউরোপ-আমেরিকার সম্পন্ন জীবনযাপনের হাতছানিতে ভরপুর উজ্জ্বলতার দিকে। মধ্যবর্তী নেতাদের ঘাড়ে চাপে জনগণকে সামলানোর দায়। তারা ভবিষ্যতের ছবি এঁকে বর্তমানের কষ্ট, কল্পনার ফেস্টুন সাজানো স্লোগানের পরিবেশে, নেতৃত্বের আসন পাতে উত্তেজনার তরঙ্গ-তুঙ্গ উচ্ছ্বাস মনের অনুভবে। জনসমুদ্রের ঢেউ শান্ত হয়, ক্ষোভ-দ্বেষ-বিরক্তির পুঞ্জ বেরিয়ে গিয়ে জনচিত্তে স্বস্তি ফিরে আসে। তাদের পাওনার ঘরে শূন্য বোধ হয়। নেতার-হবু-নেতার পূর্ণ-অর্ধপূর্ণ ঘরে প্রতিশ্রুত পূর্বাশ্রুত সংখ্যার পাশে আরও সংখ্যার সংখ্যা বসে। চলছে, চলবে।

ক্যাথারসিস যেমন জনগণের উদ্দীপনাক্ষোভ নিবিয়ে আনার প্রক্রিয়া তেমনি আছে ডাইভারশন। ডাইভারশন জনচিত্তকে বিপথগামী করার পদ্ধতি। উড়িয়াকে ধরে আনা, দুখনলালকে হাজতে পোরা (যেখানে মদনলালকে বেঁধে আনার কথা) অথবা এনকোয়ারি কমিটি-কমিশন বসিয়ে দেওয়া (কারণ বালকেও যা জানে সেই সত্যকে ধামাচাপা দেবার জন্যে যে সময় এবং আবরণ দরকার তা এই পথেই সহজলভ্য হয়ে ওঠে)। ট্রেন লেটের জন্যে স্টেশন মাস্টারকে পীড়ন করা, লাইন উপড়ে ফেলা, ট্রেন চলাচল বন্ধ করে দেওয়া (যাকে পীড়ন করলে সম্ভাব্য সুরাহার পথ খুলে যায়, তাকে পীড়াতপনির্যাতিত করে মুক্তির শ্বাস নিতে সাহায্য করা)। উদাহরণ বিশ্বকোষের আকার নেবে — সকলেরই জানা। জনগণ আবেগ প্রবণ তাৎক্ষণিক [illegible]কতার কারণে রক্তচাপের ঊর্ধ্বগতিতে তীব্র তীক্ষ্ণ। তাই তাকে ডাইরেক্ট করা যেমন সহজ, ডাইভার্ট করাও তেমনি সোজা। যারা ডাইরেক্ট করতে চেষ্টা করেন তাঁরা জননেতা, জনগণের মনের প্রিয়নায়ক হতে পারেন, হয়েও যান। যারা সেই যোগ্যতার অধিকারী নয়, দলের নেতা, নেতাদের নেতা তারা ডাইরেক্ট করে বিপদ ডেকে আনতে চায় না, ডাইভার্ট করে এক ঢিলে দুই বা আরও অধিক পাখি মারে: নিজের আসন পাকা-পোক্ত করা, সম্ভাব্য প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করা, বশংবদদের মাসোহারা, সন্দেহ জোতদারকে সুযোগ দেওয়া, গোপন হিংসা-প্রতিহিংসাকে চরিতার্থ করা, ঊর্ধ্বতন নেতাকে তুষ্ট করা, এবং আরও।

(৬) গণ মাধ্যমের নন্দনকাননে :

সব থেকে সম্ভাবনাময়ী ডাইভারশন কোনটি তা বলা মুশকিল — মোটা-মিছিল না ধর্মীয় জিগির না সিনেমা-ঝিলমিল-ঝিলিক তা স্থান কাল ও প্রয়োজনের বিচার্য বিষয়। সত্যংসবের ধীর-স্থির — স্লো বাট সিওর — পদ্ধতি হিসেবে সিনেমার তুলনা নেই। অন্য কারণেও সিনেমা মাধ্যমটি অতুলনীয়। কাঁচকাঁচা অবস্থায় কিশোর তরুণদের জালে আটকানো যায়, পপুলেশন একসপ্লোশনের কারণে উঠতি বয়সের একটা বিরাট অংশকে চারদেয়ালের মধ্যে পেয়ে ক্যাথারটিক অপারেশন সহজ হয়ে যায়। প্রতিনিয়তের লেখা-শোনা জানা-চেনা জগতের বিরুদ্ধে ওদের ক্রমশ জমে ওঠা ধিক্কারকে সুড়সুড়ি দিয়ে জাগ্রত চেতনার ডাইভার্ট করা যায়। যৌন চেতনার এনেস্থেটিকস দিয়ে, নেশাগ্রস্ত চোখ ফেলে এই কাজে দেন ইয়াং দের মনের রাগ-ক্ষোভ-ক্ষোভকে — ফোঁড়া থেকে পুঁজ বার করে নেবার মতো — বার করে দেওয়া যায়। জীর্ণ-শীর্ণ পারিবারিক জীবন, দীর্ণ-কাতর সমাজজীবন, বিষণ্ণ-অবসন্ন ভবিষ্যৎ জীবন — কিশোর তরুণ যুবসমাজের একটা বিরাট অংশ তাই ছুটে যায় নিজ নিজ যৌন-সুন্দর দেব-দেবীর কাছে, অবগাহন করে ভিসেরাস-মেকানিজম সঞ্জাত আইডোলাইজেশন, আইডেন্টিফিকেশনে। তখন এইসব স্বপ্নে ছুটে আসা ড্রাগ-এডিক্টদের মনের গভীরে অপারেশন চলতে থাকে। পুঁজ নিষ্কাশনের অপারেশন, জমে-থাকা জমে ওঠা প্রতিবাদ-প্রতিরোধের উৎপাটন অপারেশন।

সিনেমা জগৎ দেয় আনন্দ, পায় অঢেল টাকা। সুনাম-দুর্নাম সম্পদহেতু নিঃস্বতা ভেসে ওঠা ডুবে যাওয়া যে কোনও ব্যবসায়েরই অঙ্গ। সামগ্রিক ভাবে কিন্তু সিনেমা জগৎ নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। রাজনীতির নেতারা যে এই শিল্পমাধ্যমকে কতোখানি আপন বলে ভাবে তার নমুনা এখন লোকসভা-বিধানসভার দিকে তাকালেই পাওয়া যাবে। একাধারে ক্যাথারসিস, ডাইভারশন এবং ক্যারিসম্যাটিক নেতা-সংগ্রহে যে একক ক্ষেত্র দিতে পারে তার দাম অসীম।

ধর্মের কথা আগেই বলেছি। ব্যক্তিগত বিশ্বাসকে জনগোষ্ঠীর জিগির করে তুললে জনক্ষোভের প্রশমন যেমন ঘটে তেমনি রাজনীতির সমস্যাকে ডাইভার্ট করে অন্যত্র নিয়ে যাওয়া যায় — উপসর্গের মতো কাজ দেয়। যেমন ঘটে 'ধাতু' বা ক্রিয়া পদের পূর্বে উপসর্গ যোগ হলে, তেমনি রাজনীতির ক্ষেত্রেও ধর্ম উপসর্গের ভূমিকা বহুপ্রমাণিত পদ্ধতি। ধর্মের জিগির জনগণকে গোষ্ঠীতে গোষ্ঠীতে সংঘবদ্ধ করে তোলে, গাঢ়-গভীর তাৎক্ষণিক উদ্দীপনায় রাসায়নিক শক্তিকে অকুতোভয় এবং অসীম বলশালী করে তোলে, জ্ঞানবন্ধ বোধের বিচারবিবেচনায় অক্ষম-জাড্ব করে ফেলে। তাই নেতার কাজ সহজ হয়, অপরাধপ্রবণ মনগুলো নির্বাধ-নিশ্চিন্ত কাজ করার সুযোগ পায়। রাজনীতির নেতাদের উদ্দেশ্য চরিতার্থ হয়, এবং একটি দাঙ্গা বিধ্বস্ত জনগোষ্ঠীর নানা প্রয়োজনে 'নেতৃত্ব' দেবার 'মহান' সুযোগ হাতে আসে। একি কম কথা! নিঃস্ব রিক্ত জনসাধারণ তখন এইসব নেতাদের দেবদূত বলে মনে করে, মান্য করে। কারণ পর্দার আড়ালে ওদের আঙুলগুলো চোখে পড়ে নি তখন, ওদের সুনিপুণ পরিকল্পনার বিষবিসর্গও এই নির্বোধ জনগণের মনে ছাপ ফেলে নি। শতকরা দশ শতাংশের কিছু নেতা, কিছু মন্ত্রীতন্ত্রী — ইনস্ট্রুমেন্টস — অপরাধপ্রবণ বা বর্ন-ক্রিমিনাল। এরা সকলে মিলে নব্বই শতাংশের দফা রফা করে চলেছে।

যে মলাট থাকার আড়ালে এই 'সুমহান' কাজটি সম্ভব হচ্ছে সেটির নাম গণতন্ত্র। যে মন্ত্রে এই কাজটি সম্পন্ন হচ্ছে তার নাম ত্রি-মন্ত্র — আইন শাসন আর বিচার বিভাগের ত্রি-মন্ত্র। এই মন্ত্রের উৎস সংবিধান।

মনে হতে পারে আমার প্রতিবাদ গণতন্ত্রের বিরুদ্ধে, সংবিধানের বিরুদ্ধে অথবা রাষ্ট্রকর্মের ত্রিতন্ত্র বিভাগের বিরুদ্ধে। তা নয়। নীতির বিরুদ্ধে নয়। এরা স্বীকৃত শ্রেষ্ঠ-সম্ভব নীতি। প্রতিবাদ প্রথাপ্রকরণ — রুলস অব এপ্লিকেশনের বিরুদ্ধে। এবং অবশ্যই প্রয়োগকারীদের বিরুদ্ধে। নীতিকে যতো সরল করেই প্রকাশ করা হোক, প্রথা প্রকরণসমূহকে — রুলস অব দি গেমস কে — যতো আঁটোসাঁটো নিশ্ছিদ্র করা হোক না কেন সেই নীতি যারা অনুসরণ করবে, সেই আইন যারা প্রয়োগ করবে তারা যদি স্বার্থান্বেষী হয়, অনাচার-মতলবী হয় তাহলে সেই নীতির মাহাত্ম নষ্ট হতে বাধ্য, সেই নিয়মের ফুকোফাঁক গলতে বাধ্য। তাই হয়েছে, হচ্ছে এবং যতদূর দেখা যায় হতেই থাকবে। এটাই বলতে চাই।

মুখোশের কথা থেকে কথায় কথায় কাওয়ার্ডিসম আর ডাইভারশনের কথা এসেছিল। আবার ডাইভারশনের কথায় রাজনীতির মোটা মিছিল, ধর্মের জিগির, সিনেমার ঝিলমিল-ঝিলমিল এসে পড়েছিল। খবরের কাগজ, রিপোর্টার, এডিটরদের কথা না বললে ওদের মধ্যে যারা দম আটকে মারা যাচ্ছে এবং নানাপন্থা সেই মৃতপ্রায় জীবনটি যাপন করে চলেছে তারা অনুযোগ করতে পারে। খবরের মাধ্যম বলতে অবশ্য শুধুই পত্র-পত্রিকা বোঝায় না, রেডিও টেলিভিশন অসীম ক্ষমতাধর বলে প্রমাণিত প্রতিষ্ঠিত — না হলে সরকার অর্থাৎ নেতাদের নেতারা কেন তা হাতছাড়া করতে চায় না?

খবরের মাধ্যমগুলোই মুখোশধারী। গুপ্তমুখগুলো কর্তৃপক্ষের জানা, প্রকাশিত মুখগুলো সকলের সামনে মেলে ধরা। ঢাকের বাদ্যির মতো একটা সপ্ত প্রকাশিত মুখটির সঙ্গে সঙ্গে বেজে চলেছে — ব্যবসায়িক স্বার্থ, অন্য একটা ধ্বনি তবলার চাটির মতো ঝংকার তুলে চলেছে — জনস্বার্থ। নেতারা অন্তরমহলে এই মাধ্যমের গুপ্ত উদ্দেশ্যের আঘাতে বিদ্ধ হয়ে চলেছে — আমায় ভাসাইলিরে আমায় ডুবাইলিরে — আর বাহির মহলে তীব্র প্রতিবাদে মাধ্যমের মুণ্ডপাত করে চলেছে। নেতাদের পিয়ারের কাগজ আছে, কাগজের আছে পিয়ারের নেতা। সোনায় সোহাগা, ধুম পরিত্রাণ। কিন্তু অন্যে পরে লাঠি খাচ্ছে! হুড়োহুড়ি, হানাহানি মুক্ত-সংঘর্ষ-সংগ্রাম। উলুখাগড়ার প্রাণ যায়, নাভিশ্বাস ওঠে। আর জনগণ খড়ের গাদায় খবরের সত্য খুঁজে মরে।

সত্য খবর? খবরের সত্যাসত্য আছে নাকি? খবর প্রাসঙ্গিক হয়, অপ্রাসঙ্গিক হয় — সত্য হয় কি? সত্য বলে আসলে কোন এ্যাবসলিউট সত্য যখন নেই, ত্রিকাল সত্য বলে যখন কোন কথা হতে পারে না, তখন সত্য আমরা খবরের মাধ্যমে জানতে চাই! ভূতনাথ দারোগার কথা না হয় বাদই দিলাম, দর্শনে বিজ্ঞানে যে সত্যের অন্বেষণ অনুসন্ধান চলে সেখানেও তো কোনো চিরসত্যের — এ্যাবসলিউট ট্রুথের দেখা মেলে না (দর্শন) কথা ওঠে না (বিজ্ঞান)। ট্রুথ একমাত্র রেলিভ্যান্ট, প্রাসঙ্গিক। [এখানে তর্ক উঠবে জানি, প্রতিবাদে কণ্ঠ-গভীরতা ধ্বনিত হবে তাও জানি। মীমাংসা হবে না, তর্ক চলতেই থাকবে। কারণ তর্কটাই প্রাসঙ্গিক, রিলেটিভ বা আপেক্ষিক — তর্ক মানে যুক্তি বা রিজনিং। প্রমাণ হয়ে যাবে যে যুক্তিও এ্যাবসলিউট নয়।]

খবর প্রাসঙ্গিক। সেই খবরেই ফিরে আসা যাক। খবর কার জন্যে প্রাসঙ্গিক হবার কথা? পাঠকের জন্যে তো? কিন্তু কে ঠিক করে দিচ্ছে কোন খবর প্রাসঙ্গিক আর কোন খবর অপ্রাসঙ্গিক? এডিটর। কোন নীতিতে সে এই কাজটা করে? মালিকের ঘোষিত এবং অঘোষিত নীতিতে। তাহলে? কাগজের থালায় থরে বিথরে সাজানো খবরের খাবার যারা পরিবেশন করে তারা আমাদের মতো গরিবগুর্বো পাঠককে গিলিয়ে দেয় তাদেরই পছন্দের খবর।

খবরের যে কোন মাধ্যমই এবং সকল মাধ্যমই খবর গোপন করার হাতিয়ার, প্রয়োজন অনুযায়ী 'সত্য' পরিবেশনের মাধ্যম, বা যা নেতার স্বার্থে প্রয়োজন, মালিকের স্বার্থে প্রয়োজন এবং প্রতিপক্ষকে বিব্রত শায়েস্তা করার জন্য প্রয়োজন তাকেই 'প্রয়োজন' বলা হবে। সব বিবরণই প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ। প্রত্যক্ষ সত্য দেয় সুতরাং সব প্রত্যক্ষই সত্যের বিবরণ। এবারে দেখুন প্রত্যক্ষ কি অসীম বৈচিত্র্যে আপনাকে — এবং অবশ্যই রিপোর্টারকে এবং কাগজের সম্পাদককে সাহায্য করতে পারে। সত্য বা ঘটনার সর্বাঙ্গে বিচিত্র মুখোশ আঁটা আছে। আপনি যা দেখবেন, আপনাকে যা দেখান হবে তাই সত্য, তাই ঘটনা বলে প্রতিভাত হবে। কেমন করে? প্রথম কারণ সব প্রত্যক্ষই আংশিক, সুতরাং অসম্পূর্ণ। তাকে সম্পূর্ণ করতে আপনার কল্পনাকে অথবা অনুমানকে কাজে লাগাতে হবে। প্রত্যক্ষে বস্তুর-দৃশ্যের শব্দের স্পর্শের ইত্যাদির একদিক, এক অংশ চোখে-কানে-ছোঁয়ায় পাওয়া যায় অন্য অংশ নয়। দ্বিতীয় কারণ পারস্পরিকতা, তৃতীয় কারণ প্রত্যক্ষকারীর মানসিকতা প্রবণতা ইত্যাদি। চতুর্থ কারণ পরিস্থিতি-পরিবেশ আলো-আঁধার নৈকট্য দূরত্ব ইত্যাদি। আরও আছে। জটিলতা এড়াতে চাই। প্রত্যক্ষের এই বিচিত্র প্রকৃতিকে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে কাজে লাগানোর মাধ্যমই 'প্রত্যক্ষদর্শীর বিবরণ' এবং 'সত্য' উদ্‌ঘাটন।

প্রত্যেকদিন সকালে বিকেলে, সন্ধ্যায় রাতে খবরের মাধ্যমগুলো তাই খবরকে নিয়ে ছিনিমিনি খেলতে পারে, উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার কাজে লাগাতে পারে, জনগণকে যথেচ্ছ পরিচালিত করতে পারে। করেও তাই। প্রত্যাশিত খবরকে অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া — ব্ল্যাক আউট করা, ডিস-ইনফরমেশন, মিস-ইনফরমেশন, নন-ইনফরমেশন — যেমন খুশি তেমন সাজান যায়। সরকারি দপ্তরের লাল ফিতে যেমন সত্যকে জড়ায়, খবরের বেলাতেও তেমনি প্রত্যক্ষ সত্যের উদ্‌ঘাটনই আদর্শ। সেখানেও যেমন সত্যের জন্য, চিরায়ত হয়ে ঝুলে আছে দেয়ালে দেয়ালে, সব মাথাগুলোর পিছনে পিছনে, কিন্তু দেয়াল থেকে মুক্তি পেয়ে সরকারের কাজেকর্মে, জনগণের জীবনে-প্রয়োজনে প্রবাহ পাচ্ছে না, এখানেও তেমনি সিলকটিত সেনসরের বৌদ্ধিক দংশনে-পেষণে শ্রোতা-পাঠক-দর্শকের মনে পৌঁছচ্ছে না। দেয়ালে ঝুলমান আপ্তবাক্য আর খবর-মাধ্যমগুলোর লাল ফিতে মুখোশ হয়ে পূজা স্বীকৃতিতে দৈনন্দিন ধূপ ধুনো পেয়ে চলেছে — অনেকটাই অসাধু ব্যবসায়ীর প্রাতঃকালীন জবা-ফুল প্রণামটির মতো এককালীন, তাৎক্ষণিক বিবেক-প্রক্ষালক এবং দিনান্ত বিস্মরণযোগ্য প্রথাসিদ্ধ অনুষ্ঠানের মতো।

খবর মাধ্যমগুলোর ঘোষিত উদ্দেশ্য জনগণকে সচেতন করে তোলা, শিক্ষিত করে তোলা এবং ঘটমান বর্তমানের সঙ্গে প্রতিনিয়ত যোগাযোগ ঘটিয়ে দেওয়া। অঘোষিত গুপ্ত উদ্দেশ্য বহুবিধ। অধিকন্তু যেটা সেটা ব্যবসায়িক — লাভের অংশ বাড়িয়ে তোলা। বাকি সবই রাজনীতির নেতাদের বেলায় যেমন এখানেও তেমন। এখানেও তাই নেতার পিছনে মই ধরা, প্রতিপক্ষকে — স্বজাতীয় বিজাতীয় বাদবিচারহীন প্রতিপক্ষকে বিব্রত করা, শায়েস্তা করা, ইত্যাদি আছে। আছে

কাজকারবারপ্রক্রিয়া, হাইজ্যাকিং পদ্ধতি। খবরের মাধ্যমে সুড়সুড়ি দেওয়া, ইকনমিক্যাল খবরের চাটনি অক্ষরে পরিবেশন এবং অবশ্যই হিন্দু-জোটা যৌনতা, কমার্শিয়াল ফ্যাশন ইন্টারভিউ 'আরবানিশড' উপস্থাপনা। পাঠকগোষ্ঠীকে তৈরি করা, নেশাগ্রস্ত করা এবং সমান্তরালে তাদের মনে বিশ্বাসের বীজ বপন করা। এই বিশ্বাস অবশ্যই কোনো বিশেষ নীতির প্রতি, নেতার প্রতি, দলের প্রতি, এমন কি ধর্মনিরপেক্ষ ধর্মের প্রতি। প্রসেস এক, কিন্তু অনিবার্য; সৌটি এক দিওর।

অর্থ অনর্থের মূল। রাজনীতিরও মূল। তাই বলে রাজনীতিকে যেন অনর্থ বলে ভুল করবেন না। বিশেষ করে অক্টোবরের দিনে যখন তা স্কুলের নিচুস ক্লাস পর্যন্ত প্রসার লাভ করে কিণ্ডারগার্টেন স্তর পর্যন্ত পৌঁছাবার জন্য উদগ্রীব।

এই অর্থের মজাটা একবার দেখুন। অর্থ তৈরি হয় সরকারী নির্দেশে, উৎপাদিত হয় ক্ষেতে খামারে মাঠে, কলকারখানার শ্রমে, আর কুক্ষিগত হয় সিন্দুক-বাক্স-ব্যাঙ্কে। অর্থ তৈরির প্রক্রিয়ায় যারা নিযুক্ত আর উৎপাদনে যারা ব্রতী তারা রোটি-কাপড়-মকানের যোগান-অর্থ সীমার নিচে জীবন কাটায়। 'চক্রবৃদ্ধি' নিয়ম প্রধান — সুদ, মুনাফা, ক্যাপিটাল অ্যাপ্রিসিয়েশন-রূপ মাধ্যম প্রধান — উদ্ভব হওয়া সভ্যতার ঊষাকাল থেকেই পুঁজিপতিদের হাতে পুঁজি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে চলেছে। জল নিম্নগামী, কিন্তু অর্থ ঊর্ধ্বগামী। অর্থবিজ্ঞানে যেন নিয়ম হ্যাভ নট, আর নিয়ম হ্যাভ। যাদের কম আছে তাদের কমতেই থাকে, অথচ যাদের আছে বৃদ্ধি বৃদ্ধি তাদেরই বাড়ে দ্বিগুণ। সিন্দুক সিন্দুকের জন্ম দেয়। সুতরাং ক্যাপিটালাইজেশন ইনভেস্টমেন্টকেই গড়িয়ে তোলে, লাভের পরিমাণ বাড়ে, মুনাফা অধিক মুনাফার পথ প্রশস্ত করে আর হাইপারসেন্ট্রালাইজেশন এবং আরও হাইপারসেন্ট্রালাইজেশন।

জলের নিম্নগতিকে রোধ করে, বাঁধের পর বাঁধ দিয়ে সেই জলসম্পদকে শহরের কাছে আনা হয়। অর্থের ঊর্ধ্বগতিকে বাঁধ দেওয়া গেলেও তা শিল্পপতি এবং দল-পতিদের স্বার্থের অনুকূল নয় — শিল্পপতিদের নয় কারণ তাতে তাদের ইনভেস্টমেন্ট-গ্রোথ কমে যাবে, দল-পতিদের নয়, কারণ বৃহৎ গণতন্ত্রে নির্বাচন প্রক্রিয়ায় একাধিক সিন্দুকের প্রয়োজন পড়ে যে! তাই প্রথম পতিদের মাধ্যমে সিন্দুক-সংগ্রহের সুযোগ দিলেই প্রয়োজনমতো তার থেকে দু'চারটি দ্বিতীয় পতির মাধ্যমে ব্যবহার করতে পারে। সেই দিক এক টাকার—পিঠ আর পিঠ দিয়ে মিলাবে মিলিবের — রাজনীতির ক্ষেত্রে প্রয়োগ। এই দ্বিত-পতি-ব্যবস্থায় ভারতের জনসংখ্যার প্রেক্ষিতে, সিন্দুকের রঙও দ্বিবিধ সাদা আর কালো। (অবশ্য এই কালো আর সাদা বাইরের কেবল ভিতরে সবই — সব অর্থই সমান রক্তপ্রবাহ সঞ্চারকারী!) এই দ্বিপতি ব্যবস্থায় নেতা দেবে জনসমর্থন আর শিল্পপতি দেবে নেতাকে সেই জনসমর্থন ক্রয় করার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের যোগান। একটা সারকুলার সাইক্লোন সিস্টেম যেখানে অর্থের ট্রিউবটি এই দ্বিপতিকেই বৃত্তাকারে ঘূর্ণপাক খাবে।

মাঝে মাঝে যে কাজিয়া-কাণ্ডাল খবরের কাগজে দেখতে পাবেন তা নিয়ে মাথা ঘামানোর কোনও কারণ আমাদের নেই। সেই দুই শতাংশ দশ শতাংশের 'উচ্চবৃত্ত' জীবনে আমাদের মতো — মধ্যবিত্তদের মতো — কামড়াকামড়ি না থাকলেও আত্মীয়-শালা-আপনজনের মতো উত্থান-পতন আছে, এখনো দেখুন আছে যমর-অনাচার আছে। তাই কখনও অর্থশক্তির সঙ্গে অর্থশক্তির দ্বন্দ্ব সংঘর্ষ লেগে যায়; ব্যবসা দখলের লড়াই। কখনও নেতাশক্তির সঙ্গে নেতাশক্তির টাগ-অব-ওয়ার চলে — ক্ষমতার দ্বন্দ্ব লেগে যায়। সেই সব সময়ে জনগণকে প্রত্যেকেই 'সত্য' বিবরণ দিতে থাকে,

'প্রত্যক্ষ' ঘটনার উদ্ঘাটন ঘটাতে থাকে। মরণশীল জনগণ হুমড়ি খেয়ে খবর খোঁজে। ওদের মিটে গেলে আমাদেরও আর প্রয়োজন থাকে না। ওদের যুদ্ধে আমরা উলুখাগড়া, ওরা নেতা হন, নেতা থাকে, আমরা নীচু হই, বিনীত-বশংবদ থাকাই আমাদের নাগরিক কর্তব্য।

আর জনগণ হিসেবে গণতন্ত্রে আমাদের কাজ? মাঝে মাঝে ওদের দেওয়া সময়ে স্থানে এবং নামে একবার একবার ছাপ মেরে নেতা বানিয়ে দেওয়া। সেই ছাপটা যে আমাদের হাতেই মারা হবে তার কোনও স্থিরতা নেই — জনগণকে সবসময়ে বিশ্বাস করা যায় কি? — তাই আমাদের নাম করে সেই ছাপটাও ওরা নিয়ে নেবার ব্যবস্থা করে ফেলবে (সৌজন্যে, নন্দিনী সিং)।

(৭) মুখোশের আমি ও আমার মুখোশ ঃ

নিজেকে জানতে বেরিয়েছিলাম। নো দাইসেলফ্। কিন্তু কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়াল। নিজের নিজটাকে খুঁজতে খুঁজতে কোথা থেকে কোথায় এসে গেলাম। শৈশব থেকে শুরু করে সন্ধ্যা ছেড়ে কাজ ছেড়ে নিজেকে খুঁজলাম। সংসার পরিবারে দেখতে চাইলাম। শিক্ষা-সমাজ-সভ্যতার আলো জেলে দেখতে চেষ্টা করলাম। কিন্তু পেলাম কি? আমাদের প্রত্যেকের নিজটা — নিজগুলোই তো নানাভাবে চারদিকে, কাজে কর্মে অনুষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে ছড়িয়ে আছে। এই বিন্দুর মধ্যেই, এই বিচিত্র-বিচ্ছিন্ন প্রকাশের মধ্যেই কি আমি বা আমাদের নিজ নিজ নিজগুলো ধরা আছে, ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে? তাহলে জানব কাকে, কোন প্রকাশটাকে কোন আবরণ খোসাটাকে? অন্তর্নিহিত একক কোন স্থির শাশ্বত আমি কি আছে? থাকতে পারে? সবই যদি পরিবর্তনশীল, জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত পল বিপল অনুপল জীবন যদি কোথাও দৃঢ় স্থির-অবিচল-অপরিবর্তনীয় না থাকে তাহলে তো অন্বেষণটাই অকারণ হয়ে যায় — যা নেই তার অন্বেষণ হয়ে দাঁড়ায়। অথবা বলতে হয় যে ঐ দীপ শিখাটিই তুমি — পরিবর্তনশীল কিন্তু ক্ষণিক নয়, অনিত্য কিন্তু নিত্য নব প্রবহমান। যেমন নদী। প্রবাহটাই নদী, যদিও একই জলে দু'বার হাত দেওয়া যায় না, কোনো জলই স্থির দাঁড়িয়ে নেই কিন্তু সব মিলে নদী বয়ে চলেছে।

আমরা কেউই নিজের নিজের মুখ দেখতে পাই না। মুখোশটাই আয়নায় ধরা পড়ে — দেয়ালের আয়নায়, মনের আয়নায়। অপরের মনের দর্পণে, নিজের মনের দর্পণে। তার মধ্যেই আমরা প্রত্যেকেই এক এক জন আমি হয়ে ধরা পড়ি, তুমি হয়ে প্রকাশ পাই। নদীর মতো বয়ে চলি, প্রদীপের মতো জ্বলে জ্বলে একদিন নিবে যাই। কিন্তু সংখ্যাকটি নদী হয়ে বয়ে চলি, অধিকাংশই নিবে যাই। খুঁজব কাকে? মন কই, মুখ কোথায়? মুখোশটাকেই তো বয়ে চলি।

অথবা এমন কি হতে পারে না যে প্রশ্নটাই এমন যে দেখে মনে হয় সঠিক আসলে বেঠিক, ভুল? একটা ভুল প্রশ্নের ভুলভুলাইয়াতে ঘুরপাক খেয়ে চলেছি সভ্যতার উষালগ্ন থেকেই। যেমন সত্য, যেমন ঈশ্বর, ঠিক তেমনি আত্মা-আমি-নিজ, নো দাইসেলফ্?

দার্শনিক দৃষ্টিতে প্রশ্নটির স্বরূপ দার্শনিকদের বিচার্য থাক, আমরা দৈনন্দিন-সামাজিক নিত্য-সাংসারিক এবং নৈর্ব্যক্তিক-রাজনৈতিক বাতাবরণে সুপ্ত আমি প্রকাশিত আমি, অভিপ্রায়ের আমি আর উদ্দেশ্যের আমির মধ্যে অত্যন্ত বাস্তব প্রভেদ বিভেদ দেখে দেখে জেনে গেছি যে প্রশ্নটা ভুল নয় অনিবার্য খাঁটি। পেঁয়াজের খোসা, মুখোশের রূপ-রূপান্তর প্রকাশ। ভেদ ক'রে, মুখোশের পিছনের

ব্যক্তিকে খুঁজতে গিয়ে আর একটি মুখোশের সামনেই থমকে দাঁড়াতে হয়। খোঁজাটা মিথ্যে নয়, প্রাপ্তিটা সব সময়েই একটা ধাঁধা, একটা আড়াল, একটা — আর একটা মুখোশ।

অনুসিদ্ধান্ত

দীর্ঘ-আলোচনার শেষে আমরা কোনও গ্রাহ্য সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারলাম কি? মুখোশ অনিবার্য দেখা গেল, আবশ্যিক বলে দাবি জানাল। প্রাণিজগতের পটভূমি ছেড়ে, শৈশবের প্রকৃতি নির্ধারিত জীবনটুকু পার হতেই মুখোশের দেখা পাওয়া গেল — মুখোশ ব্যবহারের। আবার প্রকৃতির অস্বীকারেই যদি সভ্যতা হয়, সভ্য হতে গেলেই যদি ক্ষুৎতৃষ্ণা আর যৌন আক্রমণ থেকে মানুষকে প্রথাসিদ্ধ আহার আর সমাজ সিদ্ধ বিহারে সামিল হতে হয়, তাহলেও মুখোশকে আবশ্যিক হতে হয়। এরকম একটা সিদ্ধান্তে মন সায় দিতে চায় না। মনে হয় কোথায় যেন একটা ভুল হয়ে যাচ্ছে। মুখোশ মানেই তো ধোঁকা দেওয়া। মানুষ সম্পর্কে এমন একটা কথা সঠিক হতে পারে না, সত্য হতে পারে না। তাহলে?

এই তাহলের উত্তর খুঁজতেই আবরণ-আভরণ ভূষণ-আচ্ছাদন মুখোশ [মুখ-কোশ] ছদ্মবেশ শব্দগুলো ভাড়া করে এনো। এসবই তো বাইরে থেকে আরোপ, প্রাণিশোভাকে মানবিক আড়াল, প্রকৃতির সুন্দর-অসুন্দরকে সভ্যতার সুন্দরে-অসুন্দরে প্রকাশ করা। শিল্প চেতনার ক্রম পরিশীলনে, সংস্কৃতিচেতনার ক্রমপ্রকাশে এই সব আবরণ আভরণ তৈরি হয়েছে, চলেও আসছে। এসব অনিবার্যও বটে আবশ্যিকও বটে। কিন্তু মুখোশ? ছদ্মবেশ? সেখানেও তো দেখি মানুষ তার শিল্প সংস্কৃতির প্রকাশ-উপস্থাপনায় মুখোশকে ব্যবহার করছে — ছোটোটা ছদ্মবেশকে মনোরঞ্জক করে তুলছে — বহুরূপী উপস্থাপনায়।

এখানে এসেই মনে হল, উত্তরটা পেয়ে গেলাম। উদ্দেশ্যটাই আসল, মাধ্যমটা নয়। মানুষ মানুষকে ধোঁকা দেয়, বোকা বানায়, শোষণ করে, মূক বানায়, স্বার্থসিদ্ধির কারণে প্রতারণা করে, ক্ষমতার অধিকার চিরস্থায়ী করতে অপরকে চির-অক্ষম করে রাখতে চায়। নিজেরা আলো ঝলমলে জীবন ভোগ করতে অনেককেই অজ্ঞতার-নিরক্ষরতার অন্ধকারে ঠেলে দিতে চায়, শাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত থাকতে আইনের ধারাভাষ্যে ফাঁকফোকর রেখে দেয়, প্রশাসনে অপশাসনের বীজ প্রবেশ করে, বিচারের নামে প্রার্থী নীরবে নিভৃতে কাঁদে। এইসব কাজ করতে, এই সব উদ্দেশ্য — ব্যক্তি বা গোষ্ঠী স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে মুখোশের দরকার হয়। পরিচয়ের জন্যেই যে সব কিছু, জনগণের জন্যেই যে যাবতীয় সমাজ-সরকার-রাষ্ট্রের সর্বকিছু এটা বোঝানোর জন্যেই মুখোশ। বোকা বানানোর জন্যেই মুখোশ, সমস্যাকে ঠেকিয়ে রাখা অথবা অন্যদিকে চালিত করার জন্যেই, ডাকাতি করার জন্যই মুখোশ। তাই আইনের মুখোশ, ন্যায়ের মুখোশ, শোষণের মুখোশ এমন কি বিচারব্যবস্থারও মুখোশ আছে। গৃহে, সমাজে সরকারে রাষ্ট্রে। মুখোশের রঙ রূপ প্রকৃতি যুগে যুগে পাল্টায় এখনও পাল্টাচ্ছে। কারণ যাদের জন্যে মুখোশ তারা টের পেয়ে গেলে বিপদের সম্ভাবনা। উদ্ভাবনী মস্তিষ্কসকল নিয়োজিত আছে এই মুখোশ 'কারবারে'। কিন্তু মস্তিষ্কে যতো বুদ্ধিই থাকুক দরিদ্র পীড়িত শোষিত মানুষের বোধ শক্তির কিছু অভাব নেই — তারা প্রত্যক্ষ অনুভবে মুখোশকেও যেমন টের পায়, মুখোশের পিছনের মুখটাকেও তেমনি দেখতে পায়। দেখতে পায় কিন্তু করণীয়

খুঁজে পায় না, পথ দেখতে পায় না। যদি কোনদিন পথ দেখতে পায় তাহলে মুখোশধারীদের দুর্দিন দূরে থাকবে না।

এই দুর্দিনের খতিয়ান দেখে নেওয়া যাক। যৌথ পরিবার। মুখোশের প্রাধান্য নেতাকে — কর্তাকে — স্বার্থরক্ষায় আইন-প্রশাসন-বিচার ব্যবস্থার প্রয়োগে আগ্রহী করে তুলেছিল। করাপশন, নেপোটিজম এবং হাই হ্যান্ডেডনেস কর্তাকে বর্তমান আমলা-মন্ত্রীদের মতোই দুর্বিনীত করে তুলেছিল। কর্তাদের হাতে পুলিশ থানা ছিল না। পরিবার তাই ভেঙে ভেঙে ছড়িয়ে ছিটিয়ে গেল। স্নেহসূত্রহীন বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল। (কর্তা-পক্ষের উকিলরা অন্য কথা বলবে, অন্যতর কারণ দেখাবে। তখন আমাদের বিনীত প্রস্তাব থাকবে 'প্রজার' পক্ষের — ছেলেমেয়েদের এবং বৌদের পক্ষের উকিলের কথাগুলোও শোনা হোক। শুধু পশ্চিমকে দোষ দিয়ে লাভ কি? কেবল মাত্র আধুনিক শিক্ষাকে দায়ী করে লাভ কি? ক্ষমতার কেন্দ্রায়ণ যে ক্ষমতার কেন্দ্রকেই ভিতর থেকে নষ্ট করে দেয় — এ্যাবসলিউট পাওয়ার করাপ্টস এ্যাবসলিউটলি — তা তো আর অস্বীকার করা যায় না!)

তার পরে সমাজকে দেখুন। ব্রাহ্মণ পুরোহিত তর্কালঙ্কার তর্কচূড়ামণিরা মিলে সমাজের কি দুঃসহ হাল করেছিল সেও আমাদের অজানা নয়। তাদের হাতে যদি ধোপা-নাপিত ছাড়া পুলিশ-মিলিটারি থাকত তাহলে তারাই কি তাদের অধিকার-ক্ষমতা বিন্দুমাত্র হাতছাড়া হতে দিত? সামন্ততন্ত্র-জমিদারতন্ত্র মার খেল কেন? তাদের হাতে লাঠিয়াল ছিল, ভারতীয় দণ্ডবিধির যাবতীয় দণ্ডযোগ্য অপরাধই তারা নির্বাধে ঘটিয়ে যেতে পারত। কিন্তু টিকল না। কারণ বন্দুকের বারুদ, লাঠির আঘাতের চাইতে অধিক কার্যকর। অর্থাৎ ওদের হাতে পুলিশ ছিল না।

এবারে সরকার এবং রাষ্ট্রকে দেখুন। ক্ষমতার মুখোশের আড়ালে — পুলিশের বন্দুকের আড়ালে — স্বার্থসিদ্ধির মেলা বসে গেছে। শক্তির চাইতে শক্তিধর কি? অধিকতর শক্তি নয় কি? পুলিশের তুলনায় অধিকতর শক্তির কেউ এলে এই বর্তমানের মুখোশধারী স্বার্থমেলার অবসান নিশ্চিত। সেই শক্তিধর কি? কে?

ফ্রান্সিস ফুকুয়ামা বলেছিলেন, ইতিহাসের অবসান। কিন্তু মিথ্যা কি? বার্লিনের দেওয়াল? কমেকন? ইউ এস এস আর? পুলিশ-মিলিটারিতে কি হল সেখানে? বলতে পারেন ভবিষ্যৎ এখনও প্রতিষ্ঠিত নয়, কিন্তু বর্তমানটা? আর, কোন ভবিষ্যৎ কবে প্রতিষ্ঠিত বলে আগেই জানা যায়? ভবিষ্যৎ অপ্রতিষ্ঠিত বলেই তার নাম ভবিষ্যৎ, অ-দৃষ্ট, অ-দেখা। কেবলমাত্র কল্পিত। জীবনের নব নব অভ্যুদয়।

ছেলে-মেয়ে-বৌরা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে যৌথ পরিবার — কর্তার অ-ন্যায় অ-বিচার, প্রিয়তোষণ এবং ব্যক্তিস্বাধীনতা দলনের বিরুদ্ধে সেই পারিবারিক যুদ্ধে পরিবার ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। সমাজের নেতৃত্বে ধৃষ্ট নির্বুদ্ধিতা, মাথাভারি-টিকি-ধারীদের ক্ষমতা লোলুপতা যথেচ্ছ অবিচার-অনাচারের বিরুদ্ধে সমাজস্থ লোকেরা বিদ্রোহের মশাল জ্বেলে সেই ব্যবস্থাটাকেই পুড়িয়ে দিয়েছে। [ধর্মপ্রধান জনগোষ্ঠীর মধ্যে কোথাও কোথাও তা যে এখনও আছে, আবার কোথাও তাকে যে আরবার ফিরিয়ে আনার চেষ্টা চলছে তা মানুষের পক্ষে অশেষ দুর্দৈবের কারণ। সময় কোন মুখোশকেই ছাড়বেনা, ছিঁড়ে দেবে। দি মুখোশ ইজ ডেড, লঙ লিভ দি মুখোশ!]

আর্থসামাজিক ক্ষেত্রে সংগঠিত শ্রমিক শক্তি ক্রমে ফুঁসে উঠছে বারে বারেই। কিন্তু মুখোশধারী নেতারা এবং লাঠি বন্দুকধারী পুলিশরা উদ্বৃত্ত-মুনাফার কেন্দ্রীকরণে মদত দিচ্ছে। শ্রমিকরা জানে বোঝে। ওদের শক্তি এখনও সংহত, একাট্টা হতে পারে নি। বিধ্বংসী তাণ্ডবের অপেক্ষায়

মুখোশধারীরা আত্মতৃপ্তির পীঠে বসে আছে মাত্র। মুখোশের নিপুণ কুশল কারিগরীতে দীর্ঘদিন সেই সুপ্ত আগুন চুপ করে থাকবে কি?

আর কৃষি শ্রমিকরা? দেশের অধিকাংশ শ্রমিককে 'কৃষক' বলে বিচ্ছিন্ন করে রাখা আছে শিল্প শ্রমিকদের থেকে। (এমন কি নিম্নবর্গের পুলিশসহ অন্যান্য শ্রমজীবী জনতা থেকে। এটাই মুখোশের — নেতৃত্বের — কৌশল।) আইন-প্রশাসন আর বিচার ব্যবস্থার সুনিপুণ প্রয়োগে মুখোশধারীরা ছড়িয়ে আছে এই ত্রিবিধ শ্রমজীবী জনতার এলাকায় - নেতৃত্বের নির্বাচিতপ্রায় মুখোশগুলো এঁরাই। বিজেপি। শাসন। সবাই, সব নেতাই কালনেমী। নেতারা সকলেরই বন্ধু। সকলেই করজোড়ে বলছে — এ বোকা আমার মামাও বন্ধু মামাও। বন্ধুরা বোকা বানানোর ঐতিহাসিক দণ্ডস্পর্শে বোকাকে বাড়িয়েই চলেছে।

ক্ষমতাসন্ধানী মধ্যবিত্ত শ্রেণী। নির্বোধ বুদ্ধিজীবী শ্রেণী। বাংলার মানুষরা — নেতার বৈঠকখানায় বসার অধিকারী। উর্ধ্বমার্গে পৌঁছনোর অভিলাষী। তাই এদের হজমশক্তি অসীম। আপনজন বোধহীন সভ্যতার কাণ্ডারীরা আপনজনের ত্যাগ করে, সম্পর্ক ছিন্ন করে — তাই বলে তাকে যদি দয়া দেন প্রিয়ে — পরজনের প্রাঙ্গনে প্রসাদের আকাঙ্ক্ষায় আগন্তুকমান। ক্রমশই উৎস থেকে উৎপাটিত নাগরিক হবে নেতাদের জলসেচনে সজীব এই মধ্যবিত্ত কবে ঘরে ফিরবে? সেদিন?

ত্রিধারার মিলন হতে হবে অনিবার্য। কৃষিধারা শিল্পশ্রমিক ধারা এবং এই অন্যান্য জনমজুরের ধারা। পুলিশ কি রোবট? সংসার নেই? সন্তান-সন্ততি? ঘুষের পয়সায় জনতার নেশায় কতোজনকে কতোদিন ধরে রাখা যাবে?

তাছাড়া নেতাগোষ্ঠীর মধ্যে অন্তর্কলহ নেই? ক্ষমতার এবং সম্পদের ভাগ বাঁটোয়ারা নিয়ে কাক-চিল-শকুনের কামড়াকামড়ি?

সামনেই বিস্ফোরণ। অবধারিত। মুখোশ ছিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে নিজেদেরই হ্যাঁচড়া-হেঁচড়ি কামড়া-কামড়িতে। মধ্যবিত্ত, হতাশ, অবহেলিত, প্রতিবাদী, মধ্যবিত্ত ঘুরে দাঁড়াবে। ঘুরে দাঁড়াবে? তাহলেই ডিক্লেয়ারেশন, রেড-অ্যালার্ট, নর্মদা ড্যাম। জালিয়ানওয়ালাবাগ আর সম্ভব হবে কি? কালচারাল ডিগ্রাডেশন ঘটিয়ে কয়েক লক্ষ দেশবাসীকে ইতিহাস করে দেওয়া যাবে। হয়তো যাবে। কিন্তু শতাব্দীর শেষ দশকে সেই পদ্ধতি মুখোশকে কতোটা অটুট রাখতে পারবে? ব্যাড ইনভেস্টমেন্টই হবে না তো?

তাই সময় থাকতে মুখোশ খুলে মুখগুলো দেখে নিতে সকলেরই মঙ্গল। এক বীরাপ্পানকে বাঁচাতে শত শত নাগরিককে বলি দিতে হবে? লালা-রসিদ-হাইমারকে বাঁচাতে?

জমির ফসল যদি ক্ষুধা মেটাতে পারে তাহলে দেশের ফসল — জনগণ কি সমাজ-সভ্যতার, সরকার রাষ্ট্রের প্রয়োজন মেটাতে সক্ষম নয়? কতোটা জমি চাই মৃত্যুর পর? কতো মন কাঠ?

সুতরাং শিক্ষাকে সকলের জন্যেই প্রাপ্য করা হোক, আর সমাজের সব কাজে জনগণকে অংশীদার করে নিতে ডিসেন্ট্রালাইজ করে সকলকেই ইনভলভ করে দেওয়া হোক। এটাই বাঁচার পথ। শতকরা দুইভাগ পেশী শক্তি অপরাধী মানসিকতার ভিতে নেতৃত্বের পিরামিডকে দাঁড় করিয়ে আছে তাদের রক্ষণাবেক্ষণে না নির্ভর করে শতকরা নব্বই ভাগের পিরামিড ভিতে চিরস্থায়ী করার ব্যবস্থা হোক। প্রশাসন ও শিক্ষার বিকেন্দ্রীকরণ এটা করতে পারে। জনগণের যোগে, ইনভলভমেন্টে গণতন্ত্র সঠিক পথ ধরুক, জনতার ঘাড়ে চেপে নয়।